নিহত সম্রাট

শ্রীসাধনা বিশ্বাস

সূচিপত্র

নিহত সম্রাট

ধুত্তরি!

সে বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় ঘরের মেঝেতে। সেই সঙ্গে বিরক্তি আর ক্লান্তিতে তার মুখ কুঁচকে ওঠে। রাতেও তার শান্তি নেই। শোয়া তো প্রতিদিনই বারোটার পরে, তার ওপর মাঝরাতে আমিনার ফরমাস! 'আমার বমি আসছে, মগটা কোথায় রাখলে খুঁজে পাচ্ছিনে!' আমিনা তার দেহে ঝাঁকানি দিয়ে বলতে থাকে। এ সময় ঘুম ভাঙালে কার না বিরক্তি লাগে, সে তো আর পরম পুরুষ নয়। তবুও স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মায়া লাগল। মগ না পেলে তার দেহের ওপরই ভক ভক করে বমি করে দেবে। সে আরও অশান্তি। বিশ্রী, একটা তীব্র গন্ধ বেরুবে বমি থেকে। তারপব গেঞ্জি আর বিছানা পরিষ্কার করতে হবে তাকেই, আমিনাকে নয়। তার চেয়ে মগ খোঁজা বরং অনেক সহজ। লতিফ সুইচ অন করে মগ এনে ধরল আমিনার সামনে।

'নাও, এবার মনের আরামে বমি কর।'

আমিনা কোন কথা বলল না। গলার কাছে হাত দিয়ে কয়েকবার বমি করল, কাশল প্রচণ্ডভাবে। ওর মুখটা লাল হয়ে উঠল। নিশ্বাসের গতিবেগও বোধহয় দ্রুততর হল। বালিশে মাথা রেখে খানিকক্ষণ নিঃশব্দের মত পড়ে রইল চোখ বুঁজে।

'আমি কি ইচ্ছে করে বমি করি এই মাঝরাতে? জান না তুমি?'

লতিফ মগ নিয়ে ততক্ষণ কলের কাছে গেছে। মগটা ধুয়ে আমিনার মাথার কাছে রেখে দিল।

আমি জানি তুমি ইচ্ছে করে এসব কর না। কিন্তু এই মাঝরাতে ঘুমও কি ভাঙতে চায়?'

'তা কি আমি জানিনে বলতে চাও? তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনি, মগটা পেলাম না বলেই ত...

'হয়েছে, হয়েছে। এবার ঘুমোতে চেষ্টা কর।'

লতিফ একটা বিড়ি ধরায়।

'আবার বিড়ি ধরালে?'

'কি বিপদ! ঘুম ভাঙালে অসময়ে, সহজে কি আর ঘুমোতে পারব?'

'আজ অনেক বেশি বিড়ি খেয়েছ তুমি। আমি লক্ষ করেছি।'

'সারাদিন কাজ করলে বিড়ি একটু বেশি খরচ হবেই।'

'ওদিকে তো বল, বিড়ি খাওয়া কমাবে। তার লক্ষণ তো দেখতে পাচ্ছিনে।'

'কমাব, কমাব নিজেই কমাব। সংসারের খরচ বাড়লে এমনিতেই কমে আসবে।'

'কবে থেকেই তো ওকথা বলে আসছো।'

ধুত্তরি!

বিড়িটা ফেলে দিল মেঝেতে লতিফ। বিড়ি খাওয়া নিয়েও এতো কচকচানি ভালো লাগেনা আর। বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

আমিনা ঘুমোতে পারে না। হাই তোলে কয়েকবার। নিজের বাঁ হাত লতিফের বুকের ওপর রেখে বলে, 'ঘুমোলে নাকি?'

'না। চেষ্টা করছি ঘুমোতে।'

'তুমি নিজের এতো কাজ করেও আমার জন্যে দিনরাত খাট তা বুঝি আমি। কী করব বল, নড়তে চড়তে যে বড় কষ্ট হয়। নয়ত নিজের কাজ নিজেই করতাম।'

'তা জানি।' আমিনার কপালে হাত বুলোতে বুলোতে লতিফ বলে। 'এই তো ক'মাস, তারপর আর কোন ভাবনা থাকবে না।'

'আমার যে ভাবনার শেষ নেই। তিনমাস হয়ে গেল, কিছুতো বুঝতে পারছিনে এখনো।'

'না-বুঝার কি আছে? ক'দিন পরই তো তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাব। ডাক্তার সব বলে দেবেন।'

'তবুও আমার ভয় লাগে, যদি কিছু না হয়।'

'কি যে বল তুমি; কিছু হবেনা মানে!'

লতিফের কথায় আমিনা আশ্বাস পায় বোধহয়, কোন কথা বলে না।

একটা ছেলে বা মেয়ে হলে বোধহয় খারাপ হত না! সে তো সারাদিন প্রেসেই থাকে। আমিনাকে একা থাকতে হয় সারাক্ষণ। একটা ছেলে বা মেয়ে হলেও নিজেকে এতো নিঃসঙ্গ মনে করত না। ছোট একটা পুতুল নিয়ে ব্যস্ত থাকত সারাদিন। প্রেস থেকে ফিরে সে-ও বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে আদর করত। বিছানায় শুয়ে বুকের ওপর রেখে খেলা করত, কিংবা ঘুমন্ত শিশুকে চুমু খেত। কিন্তু, এ-সব ছাড়াও জ্বালা আছে। রাতে কেঁদে উঠবে হঠাৎ করে। ঘুম যাবে ভেঙে। তারপর কোলে নেয়ার সময় হাতে প্রস্রাব করে দেবে, পায়খানাও করতে পারে। এসব বড় বিশ্রী লাগে তার। যতসব ইয়ে–। সেও আজকাল আমিনার মত কল্পনা

শুরু করেছে। বুকের ওপর থেকে আমিনার হাতটা সরিয়ে বালিশে মাথা গুঁজে দেয় সে। তার ঘুমের দরকার, ভীষণ দরকার। সকালেই তো আবার ছুটতে হবে প্রেসে।

প্রুফ দেখতে দেখতে কয়েকবার বিড়ি ধরাল লতিফ। আজ যেন অন্যদিকে খেয়াল নেই তার। একমনে ভুল সংশোধনের নেশা তাকে পেয়ে বসেছে। করিম চেয়ে দেখল কয়েকবার। সেদিকেও খেয়াল করল না লতিফ।

'কি হে আজ বড় ব্যস্ত মনে হচ্ছে, তোমাকে।'

'ব্যস্ত! বলতে পার। এখানকার কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে অন্য একজায়গায় যেতে হবে। তাই, তাড়া আছে একটু।'

'বাড়ির খবর কি তোমার?'

'আগের মতই। বমি, মাথাঘোরা, ক্ষিদে নেই, এমনি আরো অনেক।'

করিম হাসল।

'প্রথমবার বলে এমন মনে হচ্ছে, পরে গা সওয়া হয়ে যাবে।'

'বল কি হে তুমি? তুমি কি গণ্ডায় গণ্ডায় বাচ্চা চাও নাকি?'

'আমি চাইনে, বউ বিয়োয় বলতে পার। আসলে কেউ চায় না। এমনিতেই হয়ে যায়।'

'ও তাই বল!'

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেয় লতিফ। চোখ দুটো বন্ধ করে বিড়ি টানে। মুখে শান্তির একটা আমেজ এনে বলে, 'শালার প্রুফরিডারের জীবনে চা আর বিড়ি ছাড়া আর কিছু নেই।'

'কেন হে, মাঝে মাঝে...'

'থাম, থাম, ওটা তুমি পার। সবার পক্ষে সম্ভব নয়।' করিম হাসতে থাকে।

'আসবে নাকি আজ রাতে?

'না আজ সময় হবে না।'

রাস্তায় পা দিয়েই সূর্যের তাপে লতিফের মুখ ভ্যাপসা গরমে সিদ্ধ হয়ে উঠল। ভিতরে থাকতে গরমের তীব্রতা বুঝতে পারেনি। রিকশার কথা একবার ভাবল। না, কাল বউকে নিয়ে হাসপাতালে যেতে হবে। খরচ আছে। বরং পদব্রজেই যাত্রা ভাল। রাস্তার একপাশ দিয়ে হাঁটতে থাকে লতিফ। রাবারের স্যান্ডেলের পেরেক ঘষা খাচ্ছে পায়ে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটা পাথর নিয়ে পেরেক ঠোকে কয়েকবার। মুচির কাছে গেলে তো নির্ঘাত আট আনা নেবে। পাথরটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে আবার হাঁটতে থাকে সে। পেরেকটা অনবরত পায়ে লাগছেই। পায়ের এক অংশ চিনচিন করছে। ভয়ানক বিরক্তি লাগে তার। এই বিশ্রী গরমকাল না হলে কি চলত না!

একটা গাড়ি প্রায় তার ওপরে এসে পড়েছিল। লতিফের স্যান্ডেলটা একদিকে ছিটকে পড়ল।

'শালা! গাড়ি আছে বলে মানুষের ওপর পড়বে। এতবড় রাস্তা দেখতে পাওনা?'

মুখে যা এল তাই বলে সে চীৎকার করতে লাগল। ড্রেনের পাশ থেকে স্যান্ডেলটা কুড়িয়ে আনতেই তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। স্যান্ডেলের ফিতেটা ছিঁড়ে গেছে। রাস্তার পাশে কল থেকে পানি নিয়ে মুখে ছিটাল অনেকক্ষণ। চায়ের দোকানের পাশ থেকে একটা কাগজ কুড়িয়ে স্যান্ডেল দুটো জড়িয়ে নিল।

হাঁটতে তার অসুবিধে হচ্ছে ভয়ানক। পিচের রাস্তা তেতে উঠেছে। পায়ের নিচে যেন আগুন। সে আগুনকে বশীভূতের মন্ত্র জানে না। বিড়ি ধরাতে গিয়ে মনে হল, দিয়াশলাই-এর কাঠির আগুনের চেয়ে রাস্তার পিচ অনেক গরম, অনেক অসহ্য! একটা জ্বলন্ত বিড়ি তার দেহে যে পরিমাণে নিকোটিন ছড়ায়; রাস্তার গরম পিচ তার তুলনায় যে দাহ সৃষ্টি করে তা অনেক বেশি।

কাগজের মোড়ক খুলে লতিফ স্যান্ডেল বের করে একটা পাথর দিয়ে আবার পেরেকটা ঠুকল। তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাঁটতে লাগল।

একটা চায়ের দোকানের পাশে এসে হাঁপাতে লাগল লতিফ। মিষ্টির ছোট আলমারির একটা কাচ খোলা। সেখান দিয়ে কতগুলো মাছি ঢুকে মিষ্টির ওপর ভনভন করছে। ছোট ছেলেটা চেয়ারের হাতলে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে। মুখ থেকে লালা গড়িয়ে পড়ছে হাতের ওপর।

'শালা, ঐ হাতেই আবার চা খাওয়াবে কাস্টমারদের।' তার ইচ্ছে হল, ছেলেটাকে ঘুম থেকে তুলে দু' ঘা বসিয়ে দেয়। অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করল। এসব চিন্তা করলে তার পক্ষে বিকেলে প্রুফটা শেষ করা সম্ভব হবে না। তাড়াতাড়ি পা চালাতে লাগল এবার।

গলিটা প্রেতের মত অন্ধকারে দাঁড়িয়ে। অবশ্য আজকাল চলতে কষ্ট হয় না তার। প্রথম যখন এ পাড়ায় ঘর ভাড়া নিয়েছিল তখন প্রায়ই হেঁটে যেত। একটা বিড়ি ধরাল লতিফ। সামনে একজন নারীমূর্তি ক্লান্তভাবে হেঁটে যাচ্ছিল। লতিফ সামনে গিয়ে তার গায়ের ওপর গিয়ে পড়ল।

'আমি দেখতে পাইনি, যা অন্ধকার গলিটা!'

'আপনার দোষ কি?'

'লাইলী নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'দেখ তো, দূর থেকে চিনতে পারিনি তোমাকে। এসময় আসছ কোথা থেকে? চাকরি বাকরি হল?'

'না।' অন্ধকারের বুক থেকে একটা শ্রান্ত কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এল। 'কই আর হোল চাকরি। চেষ্টা তো আর কম করছিনা।'

দুঃখ হল মেয়েটার জন্যে তার। চাকরির জন্যে অনেকদিন থেকে ঘুরছে। ঘরে অসুস্থ পঙ্গু বাবা। তাকে ঘর থেকে বাইরে টেনে এনেছে। মেয়েটি দেখতে শুনতে খারাপ নয়। লতিফের তাই মনে হয়। আমিনার চেয়ে অনেক ভাল দেখতে। বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলে মেয়ে বলে টের পাওয়া যায় না। লতিফের ভিতরটা অন্যরকম হয়ে যায় এক মুহূর্তে।

'কী চাকরি চাও তুমি?'

'যেকোন চাকরি। আমার কি বাছ-বিছার আছে এসবের? দিন না একটা চাকরির খোঁজ?'

লাইলী লতিফের হাত দুটো চেপে ধরে অনুনয় করে। তার দেহটা কেঁপে উঠল উত্তেজনায়। সে আরো জোরে লাইলীর হাত চেপে ধরে বলে, 'আমি চেষ্টা করব তোমার জন্যে লাইলী। কাল সকালে বাড়ি থেকো।' লাইলী তার মুখের দিকে তাকাল। অন্ধকারে তার মুখের চেহারা স্পষ্ট করে বুঝতে পারে না। তার হাত ধরেই সে লাইলীদের বাড়ি পর্যন্ত হেঁটে গেল।

পা দুটো উঁচু করে ভাবছিল লতিফ। আমিনা বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে তাকিয়ে থাকে তার দিকে।

'কাল সকালে হাসপাতালে যেতে হবে, মনে আছে তো তোমার?'

'আছে।'

আবার চুপচাপ খানিকক্ষণ।

'তোমার শরীর কেমন আজ?'

'আগের মতোই। বমি হয়েছিল দু'বার।'

'ডাক্তারকে বলো বমির কথা।'

'খালা বলছিল, বমি বন্ধের কি ওষুধ আছে।'

'আছে। ডাক্তারকে জিজ্ঞেস না করে ওষুধ খাওয়া ভাল নয়। আর, একটা রাত মাত্র। তারপরই তো হাসপাতাল। তুমি সব মনে করে রেখো, ডাক্তারকে কি কি বলতে হবে।'

লতিফ বিছানায় উঠে এল স্ত্রীর কাছে। শুয়ে পড়ল অন্তরঙ্গ হয়ে।

'পেটটা বেশ বড় দেখাচ্ছে তোমার?'

'কি যে বল, এত তাড়াতাড়ি পেট বোঝা যায় নাকি? খালা বলল, ছ'সাত মাসের আগে অনেকের নাকি বোঝাই যায় না।'

'তোমার কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছে। জান আজ অফিস থেকে আসার সময় বাচ্চাদের একটা রঙিন মশারি দেখলাম। আমার খুব পছন্দ হয়ে গেছে ওটা।'

'কত কি কিনতে হবে, তার ঠিক আছে নাকি? তুমি কিন্তু বিড়ি না কমালে আর সংসারের খরচ চালাতে পারব না তখন।'

'তোমাকে তো বলেছি, একটা বাচ্চা টাচ্চা হলে ওসব কমিয়ে দেব।'

'মনে থাকে যেন কথাটা।'

'থাকবে।'

লতিফ আবেগভরে আমিনাকে বুকের কাছে টেনে নেয়। আমিনার অস্তিত্ব আজকাল বেশি করেই বোঝা যায়, বিশেষ করে এভাবে টেনে নিলে। মেয়ে মানুষের দেহটাই যেন কেমন!

সকালে বেশ উৎফুল্ল দেখা যায় আমিনাকে। আয় নাটা টেনে নিয়ে সে চুল বাঁধতে বসে। একটা ধোয়া শাড়িও বের করেছে। লতিফ তাকিয়ে তাকে পর্যবেক্ষণ করে।

'তুমি ঠিক হয়ে নাও, আমি এখুনি আসছি।'

'সাত সকালে আবার কোথায় চললে?'

'বেশি দূরে যাব না, এখুনি এসে পড়ব।'

লতিফ দ্রুত পায়েই হাঁটতে থাকে। লাইলীদের বাড়ির দরজা খোলাই। লতিফ হাঁটতে হাঁটতে ঢুকে গেল ভিতরে। সংকীর্ণ উঠোনে ভিজে কাপড় মেলছিল সে। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে থাকে লতিফ। নোংরা কাপড়ের মধ্যে দিয়ে তার দেহের রেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। লতিফ সেদিকে এগিয়ে গিয়ে তার একটা হাত চেপে ধরল।

'শোন।'

ঘরের পাশে লাইলীকে নিয়ে গিয়ে লতিফ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল এক মুহূর্ত।

'শোন, তোমার চাকরির একটা ব্যবস্থা আমি করব।'

'সত্যি বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

লাইলী যেন তার কথা বিশ্বাস করতে পারছে না।

'সত্যি বলছেন চাকরি হবে!'

'হবে, ঠিক হবে।'

লতিফ আকস্মিকভাবে ওকে কাছে টেনে আনার চেষ্টা করতেই লাইলী হেসে সরে দাঁড়াল।

'তুমি একটা কাগজে নাম, ঠিকানা সব লিখে নিয়ে এস।' লাইলী আস্তে আস্তে সেখান থেকে চলে গেল। লতিফ ওর হাঁটার ভঙ্গি লক্ষ করতে লাগল। একটু পরে লাইলী ছোট এক টুকরো কাগজ ওর দিকে বাড়িয়ে দিল। লতিফ ওর হাত চেপে ধরতেই লাইলী নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'মা দেখে ফেলবে।'

ওর কাঁধে একটা চাপড় মেরে লতিফ বেরিয়ে গেল।

আমিনা বসেছিল বিছানার ওপর। প্রস্তুত হতে সে বেশি সময় নেয়নি। একটা রিকশা ডেকে দু'জনে চেপে বসল। অনেকদিন পর পথে বেরিয়েছে আমিনা। পুরনো জিনিসগুলো তার কাছে নতুন বলে মনে হতে লাগল। সবকিছু তার খুব ভাল লাগল। রাস্তার দু'পাশের দোকান আর লোকজন দেখতে লাগল কৌতূহল নিয়ে।

আচ্ছা, আগে তো এখানে কোন পানের দোকান ছিল না। এটা হল কবে?'

'এই তো মাস ছয়েক।'

'ও, তাই আগে দেখিনি। রাস্তাঘাটগুলো পরিষ্কার মনে হচ্ছে না?'

'পরিষ্কার? পরিষ্কার কোথায় দেখলে? সবই তো আগের মত। ওটা তোমাব চোখের ভুল।'

সারা রাস্তা প্রশ্ন করতে লাগল আমিনা। হাসপাতালের কাছাকাছি আসতেই সে একেবারে চুপ করে গেল।

ডাক্তার আমিনাকে পরীক্ষা করলেন। তার পেটে হাত দিতেই ফাল্গুনের প্রথম বাতাসের মত দেহের মধ্যে শিহরণ খেলে গেল। ডাক্তারের দিকে জিজ্ঞাসার বিছানা বিছিয়ে তাকিয়ে রইল সে।

'আপনি অন্তঃসত্ত্বা। কবে থেকে ঋতু বন্ধ হয়েছে?'

'ডিসেম্বর থেকে।'

ডাক্তার হিসেব করলেন।

'অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে বাচ্চা আশা করতে পারেন।'

ডাক্তারের প্রেসক্রিপসন এক হাতে, আমিনার হাত ধরে অন্য হাতে রিকশায় উঠল লতিফ। রিকশায় চড়েই আমিনা তার একটা হাত লতিফের ঘাড়ে রেখে আদর করতে লাগল।

'কি হল, রাস্তায় এত আদর কেন?'

আমিনার শ্যামলা মুখ পিঙ্গল হয়ে উঠল রক্তচ্ছটায়। আনন্দে, নতুন চেতনায় আর উত্তেজনার সংমিশ্রণে তার হৃদয় তখন তরঙ্গায়িত।

'আমার বড় আনন্দ লাগছে আজ জান। এতদিন সন্দেহের মধ্যে ছিলাম। বড় বুবুর একবার ঋতু বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কয়েক মাস। আমরা মনে করেছিলাম বাচ্চা হবে। শেষে যখন ঋতু শুরু হল, বড় বুবুর সে কি কান্না! আমার এখনো মনে পড়ে।'

আমিনা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তা ঝেড়ে ফেলল সম্পূর্ণভাবে। মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল তার।

'ওই পুতুলটার দাম কত?'

ফুটপাথে সাজানো একটা পুতুলের দিকে দেখিয়ে দিল আমিনা।

'পুতুলের কি দরকার তোমার?'

'আমার না। এমনিতে জিজ্ঞেস করছি, লাগবে না একদিন?'

'কি যে বল তুমি, এখন থেকেই পুতুলের ভাবনা।'

আমিনা চুপ করে গেল।

হকার্স মার্কেটের পাশ দিয়ে যেতে যেতে আমিনা লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেদিকে। কী সুন্দর সুন্দর জামা, ফ্রক আর প্যান্ট। তার চোখের সামনে ওগুলো দুলতে লাগল বৈশাখের বাতাসের মত। সে চোখ বুঁজল খানিকক্ষণের জন্যে।

বাড়িতে নেমে আমিনা লতিফের একটা হাত চেপে ধরল পরম আবেগে।

'আজকে অফিসে যেওনা তুমি?'

'না গেলে চাকরি থাকবে না যে! পুতুল কিনবে কি দিয়ে?'

'তাহলে দাঁড়াও, এক কাপ চা করে দিই তোমাকে।'

বিছানায় বসে লতিফ স্যান্ডেলটা একদিকে ছুঁড়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

সন্ধ্যের অন্ধকার লতিফের প্রুফ-শিটের কাগজের কালির মত ছোট বাড়িটার ওপর ছড়িয়ে পড়েছিল। সেদিকে একবার সে চেয়ে দেখল। তারপর গলির মোড়ে আরো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে বিড়িটা স্যান্ডেলের নিচে চেপে নিভিয়ে দিল। শার্টের নিচের অংশটা কয়েকবার টেনে বাড়ির ভিতরে গিয়ে গলা খাঁখরি দিল। লাইলী ঘরে বিছানার চাদর ঠিক করছিল। জানালার দিকে একবার তাকিয়ে দরজার পাশে এসে দাঁড়াল।

'আসুন না লতিফ ভাই।'

'তোমাকে যে খুব খুশী খুশী মনে হচ্ছে!'

'কেন. আনন্দিত হতে বারণ নাকি আমার?'

'না, তা নয়, মানে—'

'মানে আজ আমি একটা চাকরি পেয়েছি।'

'চাকরি পেয়েছ? কোথায়?'

'তেমন বলবার মত চাকরি নয়, তবুও সেটা চাকরি বলেই আমার ভাল লাগছে।'

লতিফ একটা বিড়ি ধরাল মুখ নিচু করে।

'কিন্তু আমিও যে তোমার জন্যে একটা চাকরি ঠিক করে ফেলেছি আজ। সে খবর জানানোর জন্যেই তো সাত তাড়াতাড়ি করে এখানে এলাম।'

সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ লতিফ ভাই। কিন্তু তার তো এখন আর দরকার নেই। দুটো চাকরি তো আর একসঙ্গে করতে পারিনে। ভাল কথা, ভাবী কেমন আছেন?'

লতিফ তার কথার কোন উত্তর দিল না। টেবিলের ওপর রাখা লাইলীর হাতের দিকে একবার চেয়ে নিজের হাত তার পাশে রাখতেই লাইলী হেসে বলল, 'এক কাপ চা আনি, কেমন?'

লতিফ তার কথার উত্তর দিল না।

আমিনা বিছানায় ঝুঁকে বসে কাঁথা সেলাই করছিল। লতিফ ছোট একটা প্যাকেট হাতে করে ঘরে ঢুকে আমিনাকে দু;হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল।

'কী হল? প্যাকেট কিসের?'

'খুলেই দেখ না।'

কথাটা পাশে সরিয়ে রেখে আমিনা প্যাকেট খুলতেই সকালে ফুটপাথে দেখা পুতুলটা বেরিয়ে পড়ল। তার চোখ দুটো বিস্ময়ে বিস্ফোরিত হয়ে উঠল।

'সে কি? এটা যে সেই পুতুলটা!'

'হ্যাঁ। তোমার জন্যে কিনে আনলাম। সকালে তোমার ভাল লেগেছিল কিনা?'

'এত তাড়াতাড়ি না কিনলেও চলত!'

কিনতাম না। হঠাৎ করে কিছু উপরিকাজের টাকা পেয়ে গেলাম। তাই ওটা কিনে আনলাম।'

আমিনা পুতুলটা জানালার একপাশে রেখে দিল যত্ন করে।

আমিনা ঘুমিয়ে পড়েছিল। দেহটা কেঁপে কেঁপে উঠছে বাতাসে আন্দোলিত জানালার পাশের কুমড়ো গাছের মত। সেদিকে তাকিয়ে একটা বিড়ি ধরাল লতিফ। দিয়াশলাই-এর কাঠিটা নিচে ফেলতে গিয়ে ওর চোখ পড়ল পুতুলটার ওপর। কাছে গিয়ে পুতুলটা তুলে সে শক্ত মুঠোয় চেপে ধরল। ইচ্ছে হল পুতুলটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় ম্যাচের কাঠির মতই। পুতুলটা ক্যাঁচ করে উঠতেই ওর দৃষ্টি গেল পুতুলের চোখের দিকে। আশ্চর্য প্রসন্ন দৃষ্টি মেলে তার প্রতি চেয়ে আছে পুতুলটা। অনেকটা আমিনার মত; না না লাইলীর মত...■

স্বদেশ ফেরা

ট্রেনে চড়ে জানালার পাশে এসে বসে মাসুদ। চারপাশের মানুষ আর পরিবেশ নতুন বলে মনে হয় তার। নিজেকে কেমন যেন বিচ্ছিন্ন লাগে। অন্য সবাই আলাপ করছে, সিগারেট খাচ্ছে। স্টেশনে ট্রেন দাঁড়ানোর পর মাটির কাপে চা খাচ্ছে। গলা ছেড়ে হাসছে প্রাণভরে। স্টেশনে ফেরিওয়ালাদের অনেকেই অবাঙালী। তাদের কণ্ঠস্বর ও বিক্রির ভঙ্গি নতুন বলে মনে হয়। তবু ভাল লাগে নতুন পরিবেশকে। চারদিকে তাকিয়ে সে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করে।

ট্রেনের কামরায় একপাশে চুপচাপ বসে চিন্তা করে মাসুদ। এই লোকগুলোকে তার নতুন বলে মনে হয়। অথচ একদিন এমন ছিল না। কাউকেই তখন অপরিচিত বলে মনে হত না। দেশবিভাগের কত দিন পর সে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে যাচ্ছে। এখন দু অঞ্চলের দুটো নাম। আগে কেউ এসব ভাবতেই পারত না। রোহিণীর মুখটা ভাবতে চেষ্টা করে সে। কত বছর তাকে দেখেনি। কুড়ি বছরে নিশ্চয়ই অনেক বদলে গেছে। আগের রোহিণীকে চিনতে পারবে কিনা কে জানে? ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায় তার।

একই স্কুলে দুজনে পড়ত, একই ক্লাশে। হিন্দু মুসলমান বলে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। মাসুদের আব্বা স্কুলের অঙ্কের টিচার ছিলেন। মাসুদ অঙ্কে সব সময়েই ভাল ছিল। রোহিণী অঙ্ক বোঝার জন্যে তাদের বাড়িতে প্রায়ই আসত। আব্বা তাকে পাশে বসিয়ে অঙ্ক বুঝিয়ে দিতেন। দুজন একসঙ্গে স্কুলে যেত। ফুটবল খেলত এক সঙ্গে। মাসুদ সব সময়েই রোহিণীর তুলনায় ভাল ছাত্র ছিল। প্রথম স্থানটা যেন তার জন্যেই বাঁধা থাকত। ফার্স্ট হতে পারত না বলে রোহিণী কোনদিন দুঃখ করেনি। তাদের বন্ধুত্বেও কোন ফাটল ধরেনি।

'তোকে কিছুতেই হারাতে পারছিনে মাসুদ।' একদিন রোহিণী হেসে বলেছিল।

'চেষ্টা কর না তুই। আমি তো তোর কাছে হারতেই চাই।'

'কেন বল ত? সবাই জিততে চায় আর তুই হারতে চাস। এ কথা ভাবতে আমার খুব অবাক লাগছে।'

'তোকে ভালবাসি বলে তোর কাছে হারতে আমার কোন দুঃখ নেই।'

রোহিণীর হাত নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে মাসুদ বলেছিল।

'সে জন্যেই তোর কাছে হারতে আমার কোন দুঃখ নেই।'

মাসুদের আম্মা ঘরে এসে মুড়ি খেতে দিতেন। তেল আর পেঁয়াজ মাখা মুড়ি ছিল রোহিণীর সবচেয়ে প্রিয়। মুড়ি না খেয়ে সে বাড়ি ফিরত না।

একদিন চলার ব্যতিক্রম হল। মাসুদ বাড়িতে অপেক্ষা করছে রোহিণীর জন্যে। সে আসবে অঙ্ক শিখতে। অনেকক্ষণ পর রোহিণী এল। অন্য দিনের মত মুখে হাসি নেই।

'কিরে, কি ব্যাপার? এত দেরি হল যে? তোর হাতে বই খাতা নেই কেন'?

রোহিণী বেঞ্চিতে বসল গম্ভীর হয়ে।

'কি হল, কথা বলছিসনে যে? অঙ্ক করবি না?'

'না। আর অঙ্ক করব না। কাল আমরা গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছি।'

'গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছিস? কোথায়?'

'কলকাতায়।'

'কেন?'

'জানিসনে আমাদের দেশ দুভাগ হয়ে গেছে। পাকিস্তান আর ভারত।'

'হ্যাঁ জানি। তাতে কি হয়েছে?'

'আমরা এখানে থাকব না। হিন্দুদের জন্যে ভারত আছে, সেখানেই চলে যাব। এখানে মুসলমানরা থাকবে।'

মাসুদ কোন কথা বলে না এই প্রথম সে রোহিণীর মুখে হিন্দু মুসলমান যে পৃথক একথা শুনল।

'কবে যাবি?'

'কাল'

'এত তাড়াতাড়ি?'

'হ্যাঁ। বাবা সব ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। তোর সঙ্গে আর দেখা হবে না। তাই বিদায় নিতে এসেছি।'

রোহিণীর চোখ ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

'কিরে কাঁদছিস?'

রোহিণী কান্নায় ভেঙে পড়ে।

'তোকে ছেড়ে কেমন করে থাকব?'

মাসুদ সান্ত্বনা দেয়।

'ওখানে আমার মত নতুন বন্ধু হবে তোর। দুঃখ করিসনে।'

অনেকক্ষণ দুজনে গল্প করে। রোহিণী উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'চল, তোদের বাড়ির উঠোনে যাই।'

'কি ব্যাপার, উঠোনে কেন?'

'দরকার আছে।

উঠোনে দাঁড়িয়ে রোহিণী শার্টের পকেট থেকে ছোট একটা গাছের চারা বের করে সেখানে পুঁতে দিয়ে মাসুদের দিকে ফিরে দাঁড়ায়।

'তোদের উঠোনে এই বকুল গাছটা লাগিয়ে গেলাম। রোজ জল দিয়ে বড় করে আমার কথা মনে রাখিস।'

রোহিণী আর দাঁড়ায় না, দ্রুত চলে যায় সেখান থেকে। মাসুদ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে সেখানে। তার চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে উঠেছে।

বকুল গাছের কথা ভোলেনি মাসুদ। স্কুলে যাওয়ার আগে সেখানে গিয়ে একবার দাঁড়াত। আম্মা সকালে উঠেই গাছে পানি দিতেন। আস্তে আস্তে ছোট গাছটা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে সারা বাড়ির ওপর ডাল-পালা বিছিয়ে দিয়েছে। ঘরে বসে পড়ার সময় জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকত বকুল গাছের দিকে। মনে পড়ত রোহিণীর কথা। কি করছে এখন? পড়তে বসেছে বোধহয় বই-খাতা খুলে। বইয়ের দিকে তাকালেই মাসুদের চোখের সামনে ভেসে উঠত রোহিণীর সজল চোখের দৃষ্টি। এখনো কি ও অঙ্কে কাঁচা আছে? চিঠিতে রোহিণী এসব লিখত না। তার স্কুল জীবনের কত কথাই সে জানাত চিঠিতে। আস্তে আস্তে চিঠি কমে আসতে থাকে। মাসুদ রোহিণীর চিঠিগুলো সযত্নে গুছিয়ে রাখত। আম্মা হেসে বলতেন, ওগুলো তোর গুপ্তধন নাকি? মাসুদ হাসত কোন কথা না বলে। আম্মা পাশে দাঁড়িয়ে মাসুদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলতেন, 'রোহিণীর কথা খুব মনে পড়ে তাই না?'

'হ্যাঁ মা। শুধু আমারই বা বলি কেন। তোমারও যে মনে পড়ে তার বড় প্রমাণ প্রত্যেক দিন সকালে উঠেই ওর লাগান গাছে পানি দাও।'

'ছেলেটা বড় ভাল ছিল। মাঝে মাঝে ওর কথা মনে হলে বুকের মাঝখানটায় টনটন করে ওঠে। দেশ শুধু ভাগই হয়নি, আমাদের মধ্যেকার সম্পর্কটাও ভাগ করে ফেলেছে।'

মাসুদ আম্মার কথা মন দিয়ে শোনে, কোন কথা বলে না। রোহিণীর কথা মনে হলেই ওর মন বিমর্ষ হয়ে যায়। কোন কিছু করতে ভাল লাগে না।

আব্বার আকস্মিক মৃত্যুতে সংসারের সব কিছু ওলোট-পালোট হয়ে যায়। ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসের ছাত্র মাসুদের আর পড়া হয় না, বাবার স্থলেই চাকরি নেয়। বাবার মত সেও ছাত্রদের অঙ্ক শেখায়। ক্লাসে প্রথম হত বলে সারা স্কুলেই তার

সুনাম ছিল বলে চাকরি পেতে অসুবিধে হয় না। চাকরির দিন হেডমাস্টার মাসুদের দিকে তাকিয়ে দুঃখ করে বলেছিলেন, 'তোমার জন্যে আমার কষ্ট হচ্ছে মাসুদ। ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র অথচ পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে স্কুলে মাস্টারি নিলে। তোমার মত ছেলেরাই তো দেশের ভবিষ্যৎ। কত ওপরে উঠতে পারতে তুমি। তাই তোমার প্রতি আমার একটা ছোট অনুরোধ, পড়াশুনা চালিয়ে যেও।'

মাথা নীচু করে মাসুদ বলেছিল, 'চেষ্টা করব স্যার।'

মাসুদ চেষ্টা করেছিল, শেষ পর্যন্ত কৃতকার্য হতে পারেনি। বি এস সি পাশ করার পর হাল ছেড়ে দিয়েছিল। আম্মার অনুরোধে বিয়ে করতে হয়েছে। সংসারের সদস্য বেড়েছে। পড়ার খরচ চালাতে পারেনি। স্কুলের মাস্টার হয়ে সে আর ওপরে উঠতে পারেনি। অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা তাকে প্রতি ক্ষেত্রে বাধা দিয়েছে। টেবিলের ওপর পড়তে বসার সময় চিন্তা করত মাসুদ। তার ইচ্ছা ছিল এম এস সি শেষ করে গবেষণা করে ডক্টরেট ডিগ্রী নেবে, আরো উপরে উঠবে সিঁড়ি বেয়ে। তার প্রতিভা টিনের ঘরের চারপাশে মারা গেছে সংসারের অভাব মেটাতে।

'এম এস সিটা পড়লিনে মাসুদ। তোর আব্বার ইচ্ছে ছিল তোকে অনেক বড় করবেন।'

'না' মা। আর পারলাম কোথায়? এত অল্প মাইনেতে সংসারই চলতে চায় না, পড়াটা বিলাসিতা ছাড়া আর কিছু নয়। আমি এর জন্যে কিছু মনে করিনে। সবাই সব কিছু পারে না, সব জিনিসও সবার জন্যে নয়।'

আম্মা আর কিছু বলেননি। মাসুদের চোখ দুটো টনটন করে ওঠে। অন্ধকার ভেদ করে তার দৃষ্টি সামনে যায়। বকুল গাছটা অনেক বড় হয়ে উঠেছে। মৃদু বাতাসে কি চমৎকারভাবে ডালগুলো দুলছে। একটা সৌরভ আছে বাতাসের মধ্যে। কি ভেবে চিঠি লিখতে বসে মাসুদ। এ মাসে রোহিণীকে চিঠি লেখা হয়নি কাজের ব্যস্ততায়। সাদা কাগজের ওপর সে লিখতে থাকে : তোর চিঠির উত্তর দিতে এবার বেশ দেরী হয়ে গেল। আমার সম্পর্কে জানতে চেয়েছিস কয়েকটা চিঠিতেই। জানানোর নতুন কিছু নেই। স্কুলেই মাস্টারি করছি আব্বার মত। এম এস সি শেষ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। তার জন্যে আমার বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই। ভাবছি, ছেলেটাকে মনের মত মানুষ করব। আমার স্ত্রী আবার অন্তঃসত্ত্বা। জানিনে, ছেলে হবে, না মেয়ে হবে। তবে, এবার মেয়ে হলেই খুশী হব। তুই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের উচ্চপদ পেয়েছিস, একথা শুনে আমি গর্বিত। বেশ, এবার যাব তোদের দেখতে। আসছে শীতেই যাব ঠিক করেছি। তোর লাগান বকুল গাছটা অনেক বড় হয়েছে, তোর মতই। প্রতিদিন রাতে তার স্নিগ্ধ বাতাস উপভোগ করি।

শীতকালে মাসুদ বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় রোহিণীকে দেখার জন্যে। রোহিণী এখন দিল্লীতে থাকে। ঠিকানা নোট বইয়ের দু'তিন জায়গায় লিখে রেখেছে।

হারিয়ে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। ট্রেনে এর মধ্যে কয়েকবার পকেট দেখে নিয়েছে। যথাস্থানেই নোট বইটা আছে। দিল্লী স্টেশনে পৌছতে পৌছতে বিকেল হয়ে যায়। রোহিণী বলেছিল সে নিজে আসবে গাড়ি নিয়ে, অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করল রোহিণীকে, আসেনি। মাসুদ ভাবে, কোন মিটিংএ আটকে পড়ারই সম্ভাবনা। এক ঘন্টা অপেক্ষা করে সে নিজেই রোহিণীর ঠিকানা খুঁজতে বের হয়ে পড়ে।

চমৎকার দোতলা বাড়ি। গেটের সামনে দারোয়ান। মাসুদ খোঁজ নিয়ে জানে রোহিণী বাড়ি নেই। অফিসে মিটিং আছে, সেখানে গেছে। বেয়ারা তাকে ড্রইংরুমে নিয়ে যায়। বাড়ির মতই ড্রইংরুমও পরিপাটি। মাসুদের খানিকটা সঙ্কোচ লাগে। তাদের টিনের বাড়িতে এসবের কল্পনা করা যায় না। সোফায় হেলান দিয়ে খানিকটা সঙ্কুচিত হয়ে সে বসে।

রোহিণী বাড়ি আসে রাত আটটার সময়। ড্রইংরুমে ঢুকে মাসুদের দিকে এগিয়ে যায়।

'আপনি'?

'আপনি কিরে? আমি মাসুদ।'

'মাসুদ! তোকে যে চেনাই যায় না। চেহারার মধ্যে থেকে স্কুল মাস্টারের গন্ধটা কিন্তু মুছতে পারিসনি?'

'কেমন করে মুছব বল্, ওটা শুধু গায়ে নয়, প্রাণের ভেতরেও যে প্রবেশ করেছে।'

মাসুদ জড়িয়ে ধরে রোহিণীকে।

'বস্, বস্। কখন এসেছিস? কিছু খেয়েছিস? এখানে এলি কেমন করে?

'এতগুলো প্রশ্নের উত্তর দিতে বেশ সময় লাগবে। তাই আস্তে আস্তে বলছি। এসেছি বিকেলে। তোর ঠিকানা দেখে নিজেই বাড়ি বের করেছি।'

রোহিণী অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে।

'তুই যে আসবি একথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। আমার ত গাড়ি পাঠানোর কথা ছিল।'

'তাতে কোন ক্ষতি হয়নি। তোর পক্ষে এত সাধারণ ঘটনা মনে থাকার কথা নয়।'

রোহিণীর সারা মুখে লজ্জা ছড়িয়ে পড়ে।

আমার খুব ভুল হয়েছে। আসলে সরকারী কাজ করতে করতে আজকাল সব কথা মনে থাকেনা। তোর চিঠির উত্তর পর্যন্ত ঠিক সময়, লিখতে পারিনে।'

'আমি তাতে কিছু মনে করিনে।'

'বস, আমি আসছি।'

একটু পরে রোহিণী স্ত্রীকে সঙ্গে করে ড্রইংরুমে ঢোকে।

'বুঝতেই পারছিস, ইনি আমার স্ত্রী। আর উনি আমার ছোটবেলার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ক্লাসে সব সময় ফার্স্ট হত। কোনদিন কেউ ওকে হারাতে পারেনি।'

'আপনার কথা শুনেছি ওঁর মুখে।'

'শুধু শুধু লজ্জা দিচ্ছিস রোহিণী। ফার্স্ট হওয়াটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল জীবনে কে কি করতে পেরেছে। ফার্স্ট হয়ে আমি স্কুল মাস্টার হয়েছি। এর সার্থকতা কোথায় বলতে পারিস?'

'আপনারা বসুন, আমি জলখাবার পাঠিয়ে দিই।'

'জলখাবার পাঠিও না রত্না। বরং রাতের খাবারের ব্যবস্থা কর।'

রত্না চলে যাওয়ার পর মাসুদ হেসে বলে, 'তুই শুধু বড় চাকরিই পাসনি, সুন্দরী স্ত্রীও পেয়েছিস।'

রোহিণী কোন কথা বলে না। হাসতে থাকে।

মাসুদ তন্দ্রাবিষ্টের মত বসে থাকে। রত্নার মুখ চোখের সামনে ভাসতে থাকে বার বার। কি চমৎকার মহিলা। সিল্কের শাড়িতে অপূর্ব লাগছে।

পারফিউমের গন্ধ সারা ঘরে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

রোহিণী ছোটবেলার গল্প করতে থাকে।

'বকুল গাছটা কত বড় হয়েছে রে?'

'অনেক বড়। তোর মতই।'

'তার মানে?'

'অনেক লম্বা।'

রোহিণী মাসুদকে গেস্টরুমে পৌঁছিয়ে দিয়ে বলে, 'তুই পোশাক বদলে নে, তারপর দুজন খেতে যাব।'

'তোর বাবা কেমন আছেন? কাকিমা?'

'ভালই। কলকাতায় বাবা থাকেন মাকে নিয়ে। অন্য ভাইরা নিজেদের বাড়িতে থাকেন। খাওয়ার পর গল্প করব তোর সঙ্গে।'

মাসুদ কাপড় বদলে নেয়। বাথরুমে গিয়ে মুখ ধোয়ার পর চেয়ারে বসে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে। রোহিণীর বাইরে পরিবর্তন হলেও তার ভেতরটা আছে আগের মতই।

মাসুদের চোখের সামনে তাহমিনার মুখ ভেসে ওঠে। রত্নার মতই গায়ের রং। আম্মা বেছে বেছে তার জন্যে সুন্দরী মেয়েই নির্বাচন করেছিলেন। বিয়ের

রাতে বাসরঘরে তাহমিনাকে দেখে চোখ ফেরাতে পারেনি সে। গায়ের রং দুধে-আলতায় মেশান। অপূর্ব সুশ্রী মুখের গড়ন। রত্নার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী। কিন্তু কোনদিন একশ কুড়ি টাকার বেশি দামের শাড়ি কিনে দিতে পারেনি। সারাদিন কাজকর্মের পর সারা দেহে পরিশ্রমের ক্লান্তি তার ঘরে এসে তাহমিনা রত্না হতে পারেনি। ভাত খাওয়ার জন্যে ডাইনিং রুমে ঢোকার সময় দাঁড়িয়ে পড়ে মাসুদ। খানিকটা অপ্রস্তুতই হয়ে যায় রত্না আর রোহিণীর কথা শুনে।

'এই লোকটাই তোমার ছেলেবেলার বন্ধু।'

'লোকটা বলছ কেন'?' ও-ত আমার মত ভদ্রঘরের সন্তান। ওর মত ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র আমাদের অঞ্চলে আর কেউ ছিল না।'

'এত ব্রিলিয়ান্ট হয়ে শেষ পর্যন্ত স্কুলের মাস্টারী।'

'ওর বাবার অসময়ে মৃত্যুর পর সংসারের সব দায়িত্ব ওর ঘাড়ে এসে পড়ে। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে স্কুলে মাস্টারী নিতে বাধ্য হয়।'

'কিন্তু ও আমাদের সমাজে একেবারে বেমানান। পোশাকের দিকে একেবারেই তাকান যায় না। সারা চেহারার মধ্যে একটা গ্রাম্যতা স্পষ্ট ফুটে আছে।'

'আস্তে, এসব শুনতে পেলে ও দুঃখ পাবে। মানুষের দারিদ্র্য নিয়ে অপমান করা চলেনা।'

মাসুদ তাড়াতাড়ি করে নিজের ঘরে ফিরে আসে। ওর পরনে লুঙ্গি ছিল, সেটা খুলে পাজামা পরে নেয়। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে নজর পড়তেই ও চমকে ওঠে। সারা মুখের ওপর একটা বিষণ্ন কালো ছায়া পড়ে ম্লান হয়ে আছে। বাথরুমে গিয়ে সে মুখে পানি ছিটিয়ে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে।

মাসুদ বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে।

'হঠাৎ করে এসে তোদের খুব অসুবিধের মধ্যে ফেলেছি বলে খারাপ লাগছে।'

'হঠাৎ করে হবে কেন, তুই তা আগেই জানিয়েছিলি আসবি বলে। ওসব ভাবিসনে। চল।'

খেয়ে-দেয়ে বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করে ঘুমোনোর চেষ্টা করে মাসুদ। চোখ দুটোয় কেমন যেন যন্ত্রণা করে। সহজে ঘুম আসতে চায় না। বার বার মনে পড়ে আম্মা আর তাহমিনার কথা।

রোহিণীর কাছে আসবে বলে গত সাত বছর ধরে তাকে প্রস্তুতি নিতে হয়েছে। প্রাইভেট পড়িয়েছে তিন জাগায়। তাহমিনা সংসার খরচ থেকে টাকা বাঁচিয়েছে অল্প অল্প করে। আম্মাও নিজের কানের দুল বিক্রি করে টাকা দিয়েছেন তার হাতে।

রোহিণীকে দেখার কেন এমন অদম্য ইচ্ছা তার মধ্যে জেগেছিল তা জানে না। দেখে ভালই হল। সে একটা কথা স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছে সময় ও পরিবেশের ব্যবধানে মানুষের অনেক পরিবর্তন হয়। মানুষের মধ্যেকার সম্পর্ক আসলে রাস্তায় পড়ে থাকা একটা পাথরের মত মূল্যহীন। প্রতিষ্ঠা মানুষকে বড় করে, আর অন্য কিছু নয়। মাসুদ গতবার ঈদে তাহমিনাকে রাজশাহী সিল্কের শাড়ি কিনে দিতে চেয়েছিল।

'ওটা পরলে তোমাকে রাজরানীর মত লাগবে।'

তাহমিনা হেসেছিল ওর মুখের দিকে তাকিয়ে।

'তুমিও রাজা নও, আর আমিও রানী নই। কি দরকার অত দামী শাড়ি কিনে। তার চেয়ে সাধারণ শাড়ি কিনলে কিছু টাকা জমাতে পারবে ভবিষ্যতের জন্যে।'

'রাগ করে বলছ নিশ্চয়ই।'

'মোটেই নয়। তোমার ওপর যে রাগ করব সে সুযোগও ত কোনদিন দিলে না।'

'তুমি–'

মাসুদ দু'হাত বাড়িয়ে তাহমিনাকে নিজের পাশে টেনে এনেছিল।

'আস্তে, পাশের ঘরে মা এখনো জেগে আছেন।'

'সব সময় তুমি বাধা দিতে চাও অন্য প্রসঙ্গ তুলে।'

'বাধা কখনো মেনেছো?'

তাহমিনার সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ে।

মাসুদ তাহমিনাকে একান্তে নিয়ে অনুচ্চস্বরে কথা বলে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিল।

নিজের ঘরে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে চারপাশ পর্যবেক্ষণ করে মাসুদ। দূরে ছোট একটা বাগান। রত্না মালিদের নির্দেশ দেয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। বাগানের কাজ শেষ হলে গাড়ি নিয়ে বাইরে যায়। বাড়িতে দুটো গাড়ি। একটা গাড়ি নিয়ে রোহিণী অফিসে চলে যায়। বাড়তি একটা গাড়ি থাকে বাড়িতে রত্নার জন্যে। সেদিন স্টেশন থেকে বাড়িতে আসার কথা মনে পড়ায় তার বুকের ভেতর চিনচিন করে ওঠে। বাড়িতে ত একটা গাড়ি অলসের মতই বসে ছিল। এত কষ্ট করে তাকে এখানে আসতে হত না।

সারাদিন বাড়িতে একাই থাকে মাসুদ। সকালে রোহিণীর সঙ্গে নাশতা খায়। সারাদিন আর তাকে পাওয়া যায় না। রাতে বাড়ি ফেরার সময় ঠিক নেই। মাসুদ মাঝে মাঝে একা একা বাইরে গিয়ে ঘুরে আসে। জিনিসপত্র দেখে। ঘরে ফিরে খবরের কাগজ নিয়ে বসে। বই পড়ে। দুপুরে একা একা খায়। বাবুর্চি দাঁড়িয়ে

পরিবেশন করে। কোথাও কোন অসঙ্গতি নেই, শুধু আছে একটা শূন্যতা। এই শূন্যতা প্রচণ্ড বেগে তাড়া করে মাসুদকে। সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মাসুদ বিকেলে চা খাচ্ছিল খবরের কাগজের ওপর চোখ রেখে। রোহিণী ঘরে ঢুকতেই সে অবাক হয়ে যায়।

'কিরে, অসময়ে যে।'

'তাড়াতাড়িই কাজ শেষ হয়ে গেল। ভাবলাম তোকে বাইরে ঘুরিয়ে আনব। অন্যদিন ত সময় পাওয়া যায় না। তুই রেডি হয়ে নে।'

মাসুদ কাপড় পরে। রোহিণী চা খেয়ে তাকে নিয়ে গাড়িতে ওঠে। অনেক জায়গা দেখিয়ে বেড়ায়।

'বইতে তাজমহলের কথা পড়েছিলাম। দেখেছিস?"

'হ্যাঁ দেখেছি। তবে বইয়ের তাজমহলের সঙ্গে এ তাজমহলের তেমন মিল নেই।'

মাসুদ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রোহিণীর দিকে তাকায়।

'এখন পরিবেশ তাজমহলের সৌন্দর্য নষ্ট করে ফেলেছে। সে তাজমহল আর নেই।'

তাজমহল দেখার একটা গোপন ইচ্ছা জেগেছিল মাসুদের মনে, মুহূর্তে নিজেকে দমন করে নেয়।

'সম্রাট শাহজাহানের প্রেম তাজমহলকে আজো উজ্জ্বল করে রেখেছে। রত্না বৌদি আর তোকে দেখে সম্রাট শাহজাহানের কথাই মনে করিয়ে দেয়। বেশ আছিস তোরা।'

রোহিণী চুপ করে থাকে অনেকক্ষণ। তারপর বলে, 'ওসব সম্রাট টম্রাটদের ভালোবাসা অন্য ব্যাপার। আচ্ছা, বৌদি দেখতে কেমন? তাঁর একটা ছবি আনতে পারতিস। তাহলে চেহারাটা দেখতে পারতাম।'

'স্কুল মাস্টারের স্ত্রীকে অন্তত মমতাজমহলের সঙ্গে কল্পনা করা যায় না।'

রোহিণী কথা বলে না। নীরবে বসে থাকে। এক সময় মাসুদের হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে ধরে বলে, 'তোর জন্যে আমার কষ্ট হয় মাসুদ। আমি যেখানে আছি, সেখানে তোর থাকার কথা। অথচ...'

মাসুদ হেসে ওঠে।

'ছোটবেলায় এমন আজেবাজে কথা বলি মনে– এখন কিন্তু তোর কথা বলার ভঙ্গি অনেক বদলে গেছে।'

'তুই কথাটা এড়িয়ে যেতে চাচ্ছিস। আমি সত্যকে তুলে ধরতে চেয়েছিলাম।'

'সত্য বলে আজ কিছু নেই রোহিণী। যা আছে তা বাস্তব।'

দুজনে কোন কথা না বলে নীরবে বসে থাকে। কিসের একটা ব্যবধান মাথা তুলে দুজনের মাঝখানে অপ্রতিরোধ্য পাঁচিলের মত দাঁড়ায়। কেউই সে ব্যবধান ভাঙতে পারে না। শৈশবের সেই সহজতা দুজনের মধ্যে এখন আর ক্রিয়া করে না দীর্ঘ সময়ের পরিধির জন্যে। রোহিণী মার্কেটে গাড়ি থামিয়ে দুটো শাড়ি কেনে। মাসুদের হাতে দিয়ে বলে, একটা বৌদির জন্যে আর একটা কাকীমাকে দিস।

'এগুলো দেয়ার কি খুব দরকার ছিল?'

'তুই আপত্তি করিসনে।'

মাসুদ নিজের জিনিস গুছিয়ে নেয়। বেশ কদিন কেটে গেছে রোহিণীদের বাড়িতে। এবার দেশে ফেরা দরকার। তাহমিনাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। ছোট ছেলেটা তাকে দেখতে না পেয়ে অস্থির হয়ে উঠেছে এ ক'দিন। রোহিণী রাতে ফিরে তার ঘরে এসে ঢোকে।

'তোকে আর তাজমহল দেখান হল না। গাড়ির ব্যবস্থা করতে পারলাম না শেষ পর্যন্ত।'

'তাতে কি হয়েছে? আমি ত কিছু বলিনি তোকে। তোর যে নানা রকমের অসুবিধে আর ব্যস্ততা তা এখানে এসেই বুঝতে পেরেছি।'

'সত্যি আমি খুব লজ্জিত।'

মাসুদ বিব্রত বোধ করে রোহিণীর কথায়।

'লজ্জা পাওয়ার মত তো কোন কাজ করিসনি।'

রোহিণী চেয়ারে বসে সিগারেট ধরায়।

'এটা অভ্যাস করিসনি বোধ হয়।'

'না। অভ্যাস করলে বিপদে পড়তাম। নিজের আয়ে আর কুলোনোর ক্ষমতা থাকত না।'

নৈঃশব্দে সারা ঘর ভরে যায়।

'আমি কাল দুপুরের ট্রেনে যেতে চাই।'

'তোর বোধহয় আর ভাল লাগছে না এখানে।'

'ভাল লাগবে না কেন? পাঁচদিন ত কেটে গেল। তোকে দেখতে এসেছিলাম, দেখা হল। আর বেশি থাকার দরকার নেই।'

মাসুদের কথার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা রোহিণীকে কথা বলতে দিল না। সে সিগারেট শেষ করে এ্যাস্ট্রেতে ফেলে দিয়ে বলল, 'তুই রেডি থাকিস। আমি দুপুরে এসে তোকে স্টেশনে নিয়ে যাব।'

সকাল থেকেই মাসুদের মন বিষাদে ভরে থাকে। আর কোনদিন রোহিণীর সঙ্গে দেখা হবে না, সে তা স্পষ্ট করেই জানে। সে না এলে হয়ত শৈশব-স্মৃতি চিরদিনের জন্যে মুছে যেত। আম্মাও চেয়েছিলেন ছোটবেলার রোহিণীর খবর জানতে। তার উন্নতির কথা শুনলে তিনি আনন্দিত হবেন, বকুলগাছের পরিচর্যা করবেন আরো ভালো করে।

সকালে অফিসে যাওয়ার আগে রোহিণী ঘরে ঢোকে। মাসুদ এমন তন্ময় হয়ে চিন্তা করছিল যে তার আগমন জানতে পারেনি। রোহিণী তার দিকে তাকিয়ে ডাকে, মাসুদ।

'তুই এসেছিস?''

'আর কদিন থেকে গেলে হত না?''

'না রে। বাড়িতে অনেক কাজ রেখে এসেছি।'

'তুই ত ভাল করেই জানিস আর হয়ত কখনো আমাদের দেখা হবে না। তাই বলছিলাম।'

'তুই একবার আয় না আমাদের ওখানে। তোর জন্মভূমির অবস্থা দেখে আসতে পারবি। তোর হাতে পোঁতা বকুলগাছের দিকে একবার তাকাবি। দেখবি গাছটা কত বড় হয়েছে।'

রোহিণী চেয়ারের ওপর বসে হাত দিয়ে মুখ ঢাকে।

'যেতে কি ইচ্ছে করে না? করে। পারিনে। ইচ্ছে করে তমাল বিলের শালুকের দিকে তাকিয়ে তোর সঙ্গে পাড়ে বসে গল্প করতে। ইচ্ছে হয় স্কুলে ঢুকে মাস্টার মশাইদের দু পায়ে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করতে। কিন্তু সব ইচ্ছেই থেকে যায়। সরকারী চাকরী করি, বেড়াতে যাওয়ার পারমিশন পাব না। তবুও তোকে বলছি, আমি একবার যাব। ওখানে গিয়ে প্রথমে তোদের বাড়িতে গিয়ে কাকীমাকে প্রণাম করে বলব, 'আমাকে চিনতে পারছেন?'

রোহিণীর চোখ ছলছল করে ওঠে। দাঁড়িয়ে তার একটা হাত মাসুদের কাঁধের ওপর রাখে।

'আমাকে ভুল বুঝিসনে তুই। আমার ক্ষমতার একটা সীমা আছে।'

'কি যে বলিস তুই, আমি কিছুই মনে করিনি।'

রোহিণী চলে যাওয়ার পর মাসুদ বসে থাকে চুপ করে। তার সমস্ত শরীর বোবার মত নিশ্চুপ হয়ে যায়।

দুপুরে বাড়ি আসতে পারে না রোহিণী। মাসুদের জন্যে গাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে। বাড়িটার দিকে একবার চেয়ে গাড়িতে ওঠে মাসুদ। গাড়ি

চলার সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে চোখের সামনে থেকে সব কিছু অদৃশ্য হয়ে যায়। মাসুদের মনে হল রোহিণীর স্মৃতিও তার চোখের সামনে থেকে ভেসে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

শেষবারের মত দিল্লী স্টেশনের দিকে তাকাল মাসুদ। অসংখ্য মানুষের ভিড়ে সে একজন মানুষকে খুঁজতে চাচ্ছে শেষবারের মত দেখার জন্যে। কোথাও তাকে দেখা যায় না। মাসুদ ট্রেনে চড়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। দৃশ্যের পর দৃশ্য বদলাতে থাকে। মাসুদ সব চেয়ে চেয়ে দেখে। এ দেশের সঙ্গে তার কোন নাড়ীর বন্ধন নেই, অথচ মনে হয় তার পরিচিত একটি দেশ–যেখানে সে রেখে যাচ্ছে তার শৈশব জীবনের সবচেয়ে মধুর স্মৃতি। রোহিণী কোনদিন জন্মভূমিতে ফিরে আসবে না, তা সে স্পষ্ট করেই জানে। যে দেশ সে ইচ্ছা করে ছেড়ে গেছে, সেখানে আসার জন্যে তার মনের মধ্যে কোন প্রেরণা থাকার কথা নয়। সে এত টাকা খরচ করে বাল্যবন্ধুকে দেখতে এসেছে, এটা তো ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু নয়। রোহিণীর মধ্যে কি এই ভালোবাসা নেই? দেশের জন্যে, মাতৃভূমির সেই ছোট শহরের জন্যে? এই ভালোবাসা কি কেউ হত্যা করেছে তার মধ্য থেকে? মাসুদ এ প্রশ্নের কোন উত্তর পায় না। একটা উত্তর তার মন থেকে বের হয়ে আসতে চায়। মাসুদ তা প্রকাশ করে না। চোখ দুটো এক দিকে সরিয়ে নেয় নিজেকে সবকিছু থেকে আড়াল করার জন্যে।■

পুষ্পকীট

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অনেকক্ষণ কাঁদে সাঈদা। সচেতন হয়েই কাঁদছিল সে। যাতে বাইরের কেউ শুনতে না পায়। কিন্তু এ বাড়ির মধ্যে তা কান্নার শব্দ বাইরে ভেসে এল। আম্মা বাইরে এসেছিলেন পানের পিক ফেলতে, তিনি তাড়াতাড়ি করে ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

'মেয়েটা আবার কাঁদছে।'

খাটের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন আম্মা। যাকে লক্ষ্য করে কথাটা বলা হল তিনি এ কথায় হঠাৎ যেন মুষড়ে গেলেন। কৈফিয়ৎ দেওয়ার কথা ভেবেই তিনি হয়ত খবরের কাগজটা আরও চোখের সামনে ধরলেন। কিন্তু আশ্চর্য লাগল তাঁর। একটা অক্ষরও পড়তে পারলেন না তিনি। সাঈদার কথাই বারে বারে মনে পড়তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে একটা বেদনা অনুভব করলেন। খবরের কাগজখানা চোখের সামনে নামিয়ে পাশ থেকে চাদরটা টেনে নিয়ে গায়ের ওপর বিছালেন। না। এখান থেকেও কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে। মুখের ওপর থেকে চাদরটা সরিয়ে বললেন, দক্ষিণ দিকের জানালাটা বন্ধ করে দাও না কেন। পরক্ষণেই গভীর লজ্জায় নিজে কেমন যেন চুপসে গেলেন। চাদরটা যে মুখের ওপর দিতে হবে একথা প্রায় ভুলেই গেলেন তিনি।

রীতার প্রশ্নে অপ্রস্তুত হয়ে গেল সাঈদা। তার প্রশ্ন শুনে সাঈদা এমনভাবে ডুক্‌রে কেঁদে উঠবে একথা ভাবা সম্ভব ছিল না রীতার। বিয়ের পর সাঈদার সঙ্গে তার এই প্রথম দেখা। রাজশাহীতে বসেই শুনেছিল, হঠাৎ সাঈদার বিয়ে হয়ে গিয়েছে সুপুরুষ একজন তরুণের সঙ্গে।

'কেমন আছ সাঈদা?'

সংক্ষিপ্ত,হ্রস্ব একটি প্রশ্ন। অথচ এটাই সে সহ্য করতে পারল না। বিস্মিতা হয়ে ভাবে রীতা। টেবিলের ওপর মাথা রেখে চেপে চেপে কাঁদছে সাঈদা। বড় খোঁপাটা ঝুলে পড়েছে টেবিলের এক পাশে তার ঘাড় ছুঁয়ে। রীতা নিজেকে সামলিয়ে নেওয়ার জন্যে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। চন্দ্রমল্লিকার ছোট গাছটাতে ফুল ফোটেছে একটা। অল্প অল্প বাতাসে ছোট ফুলটা মৃদু দুলছে। একটা মৌমাছি অনবরত দোলায়িত ফুলটাকে ঘিরে গুঞ্জন করছে। সাঈদার নিজের হাতের তৈরী এ বাগান। একপাশে তিনটে গোলাপ আর কতকগুলো বেলীফুলের গাছ।

ক্রিসেনথিমাম-এর গাছটা এখনো ছোট রয়েছে। এবারও ফুল ফোটেনি। এই গাছটার ওপরেই সবচেয়ে বেশি লোভ ছিল তার।

সাঈদা কান্না থামিয়ে হঠাৎ মাথা তুলে তাকাল রীতার দিকে।

আমি বড় সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়েছিলাম রীতা। আমাকে ভুল বুঝো না।

সাঈদার কণ্ঠস্বরে একটা যাতনার ইঙ্গিত। স্পষ্ট বোরুদ্যমান হয়ে উঠতে চাইছে। যেন চেপে চেপে রাখছে সে।

রীতা তার মুখের দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়েই মুখ নামিয়ে নিল। দু'গালে অশ্রু জমে গেছে মুহূর্তের কান্নায়।

'তোমার ক্রিসেনথিমামের গাছে এবারও ফুল ফোটেনি দেখছি।'

'হ্যাঁ। ওটা আমাকে অনুসরণ করছে।' বিবর্ণের হাসি হাসল সাঈদা। সাদা বিবর্ণ দেওয়ালের মধ্যে কোন কোন অংশে যেমন অল্প চুনকাম থাকে তার হাসিও তেমনি দেখাল। 'আমার দিকে তাকিয়েই হয়ত ওটা আর ফুটতে পারছে না। ভাবছে, ফোটার মধ্যে যখন এত যন্ত্রণা, তখন না ফোটেই বরং থাকা ভাল। শুধু শুধু একটা যন্ত্রণা পেয়ে লাভ কী? আর যাই থাক, তার মধ্যে সার্থকতা নেই।'

সাঈদার কথাগুলো অনেকটা হেঁয়ালীর মত শোনাল রীতার কাছে। দার্শনিকের মত তার প্রজ্ঞাকথন।

'তার মানে?"

সাঈদা রীতার পাশে এসে দাঁড়াল। নিজের একটা হাত তার কাঁধের ওপর স্থাপন করে বলল, 'তাকে ডাইভোর্স করেছি, রীতা।'

রীতা যেন বিশ্বাসই করতে পারল না সাঈদার অস্বাভাবিক কথাগুলো। কিন্তু সে যে ভঙ্গীতে দৃঢ়স্বরে বলল, তার মধ্যে মিথ্যার অনুকথন ছিল না। এবার সে কাঁদল না। মুখখানা আরও পিঙ্গল হয়ে গেল। তারপর রীতার অন্য কাঁধে মাথা রেখে তার একটি হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল।

'আমি জানতাম না সাঈদা। এ-কথা ভাবা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক কারুর পক্ষে। অন্য কোন কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইনে তোমাকে।'

সাঈদা রীতার কাঁধের ওপর থেকে আস্তে আস্তে নিজের মাথা তুলে জানালার মধ্যে দিয়ে বাগানের ক্রিসেনথিমামের গাছের দিকে তাকাল। ছোট গাছটা একদিকে মাথা নীচু করে রয়েছে অন্য সব গাছের স্পর্শ বাঁচিয়ে।

নিঃশব্দে ঘরের দরজা খুলে বের হয়ে গেল রীতা। মৃতের মত তারও কোন পদশব্দ শোনা গেল না।

সাঈদার পিঙ্গল মুখ আরও পিঙ্গল হয়ে ওঠে। পিঙ্গল হয়ে উঠছিল ক্রমশঃ দিনের পর দিন। দুর্ভাবনায় কৃশ ছাপ মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়েছিল,বিস্তৃত হয়ে উঠেছিল সারা দেহের মধ্যে। শীর্ণা আর বিবর্ণা সাঈদা বান্ধবী মহলে আলোচনার বস্তু ছিল। নিজেদের সৌভাগ্যের সময় তাকে স্মরণ করে কৃত্রিম দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলত। দিনের পর দিন তাদের সঞ্চিত নিশ্বাস তাকে বরফের মত জরীভূত করে ফেলেছিল। ক্রমশঃই সে হয়ে উঠেছিল রূপগন্ধহীন কঠিন একটি পুত্তলিকা।

'সাঈদার কথা মনে পড়লেই বড় খারাপ লাগে। কে যে বিয়ে করবে ওকে? রূপ না থাকুক, শরীরটাও যদি ভাল হত একটু।'

ইউনিভার্সিটিতে ক্লাশের অবসর সময়ে লাউঞ্জে বসে গল্প করতে করতে ডলি আড়চোখে দূরে উপবিষ্টা সাঈদার দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলত।

'আমিও তাই ভাবছি।'

সুলতানা বুকের ভেতর থেকে একজন তরুণের ফটো বের করে সেটা কোলের ওপর রেখে তার ওপর ঝুঁকে পড়ে বলে ঃ

'মেয়েটার দুর্ভাগ্য। প্রেমে পড়লে হয়ত একটা—' ডলি ওকে থামিয়ে দিত।

'আঃ! থাম। ও আসছে এদিকে।'

সাঈদা ওদের পাশে এসে বসত। সুলতানা ফটোখানা তাড়াতাড়ি খাতার মধ্যে লুকিয়ে রাখত।

রীতার সঙ্গে গল্প করার সময় একেবারে ছেলেমানুষ হয়ে যেত সাঈদা। অকপটে নিজেকে বিছিয়ে ধরত তার কাছে।

'ইউনিভার্সিটিতে কেন ভর্তি হয়েছি জান?'

হাঁটতে হাঁটতে এক সময় রীতার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করত সাঈদা।

রীতা আচমকা প্রশ্নে হঠাৎ থতমত খেয়ে যেত। কিন্তু কোন উত্তর দিতে পারত না। সাঈদার সব ইতিহাসই তার জানা। পিঙ্গল দেহের মধ্যে সবার অলক্ষ্যে যে মন সে লুকিয়ে রেখিছিল, ক্রিসেনথিমামের গোড়ার মত পানিসেচন করেছিল, তার কথা ভোলেনি সে। নিজের মনের নিভৃত কথা তার কাছে খুলে বলতে কোন সঙ্কোচই অনুভব করত না। রীতা জানত তার ইউনিভার্সিটিতে পড়ার নেপথ্য কারণ। পুরুষদের সঙ্গে টাউন টু-এ সার্ভিসে চড়ে আসার পেছনকার উদ্দেশ্য।

'আজকে চমৎকার পড়িয়েছেন সালাহউদ্দীন সাহেব।'

কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বলত রীতা।

'আমার প্রশ্ন তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ, রীতা।'

পিঙ্গল ঠোঁট বেঁকিয়ে বলত সাঈদা।

রীতা আর কোন কথা বলত না। দু'জনে নিঃশব্দে এগিয়ে যেত। ধূলো জমত সাঈদার স্যাণ্ডেলের ওপর।

'প্রেমে পড়লে মনের অনুভব কেমন হয় রীতা?' হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ আবার প্রশ্ন করত সাঈদা। রীতা একদিকে মুখ ফিরিয়ে হাঁটতে থাকত। ভান করত যেন তার প্রশ্ন শোনেনি। কিন্তু পরক্ষণেই মুখ ফিরিয়ে নিত সেদিক থেকে।'

'আর একদিন বলব, সাঈদা। আজ ভাল লাগছে না।'

আবার নৈশব্দ এসে বিরাজ করত দু'জনের মধ্যে। তারপর আর কোন কথা বলত না কেউ। অথচ দু'জনেই দু'জনের মনের ভাব অনুভব করত পাশাপাশি চলার সময়।

সাঈদার বিয়ে হয়ে গেল সম্পূর্ণ আশ্চর্যভাবে। সাঈদা নিজেও কম বিস্মিত হয়নি। কিন্তু তার কারণ অন্য। শুধু বিয়ের ব্যাপারে নয়। পড়ার ঘরে ছোট টেবিলের ওপর স্বল্পসংখ্যক বই বিছিয়ে পড়ছিল সে। অন্যান্য দিনের মত কেমন অন্যমনস্কের মত পড়ে অনেকটা তেমনি। বান্ধবীদের মুখগুলো ভাসতে থাকে তার চোখের সামনে। রীতার এড়িয়ে যাওয়া মনোভাবের কথা ভাবে গভীর হয়ে। সেই সঙ্গে অপরিচিত সুশ্রী একটা মুখ। যার সঙ্গে রীতাদের কোন সম্পর্ক নেই। কল্পনা করতে করতে ভাবাবিষ্ট হয়ে বইয়ের ওপর নিজের মুখখানা আরও নামায় সাঈদা।

আম্মা ঘরের দরজার একটা কপাট ঠেলে ভেতরে ঢোকেন। হাসিতে তাঁর সারা মুখ উদ্ভাসিত হয়ে পড়েছেন তিনি। তারই প্রতিভাস মুখের ভাঁজগুলোর ওপর ছড়ান।

'সাঈদা।'

আম্মা তার পাশে এসে নিজের একটা হাত সস্নেহে তার মাথার ওপর রাখেন।

'সাঈদা!'

সাঈদা তাড়াতাড়ি করে মাথা উঁচু করতেই আম্মার আনন্দিত মুখের ওপর দৃষ্টি পড়ে। কতকটা যেন সে বিস্মিতই হয়।

'তোমার নটু মামা এসেছেন। আর–'

কথা শেষ না করে তিনি মেয়ের দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

'আর ও একা আসেনি। সঙ্গে এসেছে সুন্দর একটা ছেলে। আমাদের সবারই পছন্দ হয়েছে। দেখলে হয়ত তুমিও অমত করবে না। অত্যন্ত সুন্দর ছেলেটি।' তাঁর কণ্ঠস্বরের মধ্যে থেকে দীর্ঘ দিনের অবরুদ্ধ শ্বাস লুপ্ত হয়ে মুক্ত আলোর মত উচ্ছ্বাস ঝরে পড়তে লাগল।

সুন্দর ছেলে!

সাঈদার কপালের ওপর দু' এক বিন্দু ঘাম জমে উঠল। হয়ত সেই দাগের ওপরেই। যেখানে সে টিপ দেয় গাঢ় করে লাল রঙের কালো দাগটা ঢাকতে। কিন্তু আজ তার সে সব কিছুই মনে পড়ল না। কেবল মনে পড়ল খানিকক্ষণ আগেকার চিন্তার অনুরণটুকু। সে কল্পনা করছিল একটা সুশ্রী মুখ। আম্মার প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজে পেল না সে।

নটু মামাও ঘরে এসে ঢুকলেন। তাঁর মুখে একটু যেন বেশীই হাসি।

'তোমাদের যা বলেছিলাম এবার ঠিক হল ত'! বলেছিলাম সাঈদার জন্যে সুন্দর একটা ছেলে পাবেই।'

নটু মামার কথায় সাঈদা তার মুখ তাড়াতাড়ি করে নীচে নামিয়ে নিল। সামনে কোন আয়না থাকলে সবাই দেখতে পেত তার মুখখানা পীতবর্ণ হয়ে গিয়েছে লজ্জায়। নটু মামা সাঈদার জন্যে অনেকদিন ধরেই চেষ্টা করছিলেন। তিনি ছিলেন আত্মবিশ্বাসী হাঁ-ধর্মী মানুষ। কোন ব্যাপারে নিরাশ হতেন না। আজ সঙ্গে একজন সুদর্শন ছেলেকে নিয়ে বাড়ী এসে সে কথাই দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করলেন।

'সাঈদার মতামত নেওয়া দরকার একবার। আপনি বরং জিজ্ঞেস করুন। আমি ওদিকের ব্যাপারগুলো ঠিক করে নিই।'

নটু মামা যেমন তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকেছিলেন তেমনি করেই বেরিয়ে গেলেন।

আম্মা সাঈদার আরও কাছে সরে এলেন। ছেলেটার কোন আত্মীয়-স্বজন নেই। ভাল চাকরি করে। বিত্তবানই। তোমার আব্বার ইচ্ছা আজকের মধ্যেই বিয়েটা হয়ে যাক।' আম্মার কথা নীরবে শুনল সে। আব্বা ছেলে দেখে কেন যে এখনই বিয়ে দিতে চান তা তার অজানা নয়। ভাল ছেলে পেয়েছেন বলেই তাঁর এত ভয়। লোকচরিত্র সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান কম নয়। অন্ততঃ এই পৌঢ় বয়সে তিনি কেন ভুল করতে চান না। তাঁর আত্যন্তিক ইচ্ছার মধ্যে দিয়েই এ কথার সমর্থন আত্মগোপন করে রয়েছে। সাঈদা জানে। সে বোঝে। সাঈদা জানে তার জন্যে তাঁর ভয় কোথায়! নিজের মুখ আরও নীচু করে ফেলে সে।

আম্মা তার দিকে তাকিয়ে সব বুঝলেন, তার হাত ধরে তুলতে তুলতে বললেন, 'তবুও তোমার একটা মতামত বা ইচ্ছা থাকা প্রয়োজন। তুমি তাকে একবার দেখবে।'

সাঈদা কোন কথা বলতে পারল না। আম্মার হাত ধরে জানালার দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মতই এগিয়ে যেতে লাগল। জানালার কাছে তাকে নিয়ে গিয়ে আম্মা ঘরের লাইটটা নিভিয়ে দিলেন।

এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বারান্দাটায় তিনজন বসে রয়েছেন সেখানে। আব্বা, নটু মামা আর একজন। সে। তার মুখ নামান। সাদা জামার চেয়ে তার

মুখটা আরও বেশী ফর্সা মনে হচ্ছে। কোঁকড়ান চুলের ওপর আলোর রশ্মি ঢেউ তুলেছে। মুখ তুলে সাঈদা সেদিকে তাকাল। আশ্চর্য! ওর দৃষ্টি যেন সমাহিত হয়ে আসতে চায়। ঘরের লাইট জালানোর শব্দে তাড়াতাড়ি সরে আসে জানালা থেকে। আম্মা আবার ওর পাশে এসে দাঁড়াল। সাঈদা কোন কথা না বলে তার মুখটা আস্তে আস্তে আম্মার কাঁধের ওপর স্থাপন করে।

একটা অপূর্ব বিস্ময়ের চেতনায় চোখ তুলে তাকায় সাঈদা। ঘটনাগুলো পর পর ছায়াছবির মত কেটে গেলেও সেগুলো যে রূপকথা নয়, বাস্তব পরিবেশে সত্যি, একথা এখন আর অস্বীকার করতে পারে না সে। বরং পারার ক্ষমতাটুকু সে হারিয়ে ফেলেছে। বিস্ময়ের মাত্রা কেটে যেতেই সে প্রথমে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করে সে ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছে। না। আজ তাকে শোওয়ার ঘরে খিল লাগাতে হয়নি। এই প্রথমবারের জন্যে ব্যতিক্রম ঘটল গতানুগতিক প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনার। ঘরের উজ্জল আলো ঠেলে সে তার পাশে এসে দাঁড়াল। হঠাৎ সাঈদার মনে হ'ল তার পাশেই এখন সেই লোকটা এসে দাঁড়িয়েছে। নিজের বাড়ীর পরিচিত কেউ নয়। কথাটা মনে হতেই সঙ্কোচে একপাশে সরে আসতে চাইল সে। কিন্তু তখন তার পা দুটো যেন মেঝের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছে। সাঈদা বুঝল সে তার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে একদৃষ্টিতে। কেমন একটা অস্বাভাবিকতা অনুভব করতে থাকে নিজের মধ্যে। সে তখন এগিয়ে এসে তার কাঁধের ওপর নিজের ফর্সা একটা হাত রাখল। সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ-স্পর্শে তার ভেতরটা কেঁপে উঠল।

'সাঈদা।'

মৃদু কণ্ঠে ডাকল লোকটি। তার স্বামী।

এতক্ষণ পর যেন সম্বিত ফিরে পায় সাঈদা। সিনেমার পর্দার মতই তার চোখের সামনে খানিক আগের ঘটনাগুলো পর পর রিলের ফিতের মত ভেসে যায়। নটু মামার সঙ্গে তাদের বাড়িতে সন্ধ্যের সময় তার আগমন। আব্বা আম্মার সঙ্গে সঙ্গেই পছন্দ। পড়ার ঘর থেকে তার দেখা। খানিক পরেই বিয়ে। তারপর নটু মামার সঙ্গে খাটের ওপর শুয়ে আম্মার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে একটানা কান্না। বিদায়ের আগে আম্মা তাঁর পিঙ্গল মেয়ের জন্যে কেঁদেছিলেন। ভুলে গিয়েছিলেন সে তার স্বামী। আর সে এসেছে বিয়ের প্রথম রাতের স্মৃতিকে ইতিহাসের পাতায় লিখে রাখতে।

এটা তার বাসরঘর!

সাঈদা লজ্জা পেল হঠাৎ। তার হাত তখনো সাঈদার কাঁধের ওপর রাখা। সাঈদার ইচ্ছা হল সেটা সরিয়ে দেয় আস্তে আস্তে। কিন্তু পারল না। সাহসের

অভাবে নয়–সঙ্কোচে, আর হয়ত সেই সঙ্গে প্রথম স্পর্শলোভের অবচেতন একটা ইচ্ছায়।

সে তার সামনে এসে দাঁড়াল এবার। একহাত দিয়ে সাঈদার ঘোমটা নামিয়ে দিল। প্রসাধনলিপ্ত মুখের ওপর তখন ঘামের বড় বড় ফোঁটা জমেছে। মুখের দিকে একবার চেয়ে তাকে অবাক করে দিয়ে সে নিজের পকেট থেকে রুমাল বের করে তার মুখের ওপরকার ঘাম মুছিয়ে দিল। তারপর দু' হাতে তার মুখ তুলে ধরে বললে, 'লজ্জা করছে তোমার?'

সাঈদা কোন কথা বলতে পারল না। ওর মাথাটা তখন কাঁপছে। ভয়ে প্রবল একটা উত্তেজনায়। 'তোমাকে আমার পরিচয় দেওয়া হয়নি। আমাকে হারুণ বলে ডেকো। নটুর কাছে কিছু শুনেছ কী?' সাঈদা মাথা নাড়ল মৃদুভাবে।

'যাক। তা'হলে সবই শোনা হয়ে গেছে তোমাব। আচ্ছা, কেমন লাগছে বলত? ভয় করছে?'

হারুণ মুখ মুচকে হেসে জিজ্ঞেস করল।

সাঈদা কোন উত্তর দিল না।

'তা' হলে চল, ওখানে গিয়ে বসি।'

হারুণ তাকে নিয়ে গেল বিছানার দিকে।

তারপর সুইচটা অফ করে দিল।

প্রথম থেকেই সাঈদার একটা সঙ্কোচ ছিল। ভোর রাতে ঘুম ভাঙ্গার পর সে অবাক হয়ে দেখল তার একটা হাত হারুণের গলার ওপর। তাড়াতাড়ি করে সেটা সরিয়ে নিল। হারুণ তখন একপাশে মুখ ফিরিয়ে ঘুমুচ্ছে। সাঈদা একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল তার দিকে। আশ্চর্য সুন্দর তার মুখ। কোথাও একটা দাগ পর্যন্ত নেই। একেবারে নিখুঁত। যেমন ফর্সা তেমনি সুডৌল। এর আগে কোন পুরুষের এত সুন্দর চেহারা দেখেনি সে।

সাঈদার মনে পড়ল তার বান্ধবীদের কথা। যারা তার দিকে চেয়ে করুণার হাসি হাসত, তাকে মনে করত নিজেদের সৌখিন আলোচনায় অনাহূত অতিথির মত। খানিকটা কৃপা করত সহানুভূতি দিয়ে। অদ্ভুত একটা ইচ্ছা হ'ল তার। তাদের সবাইকে আমন্ত্রণ করবে একদিন। তুলনা করে দেখাবে হারুণের সঙ্গে তাদের প্রেমিকের কোন তুলনাই হয় না। হারুণের পাশে দাঁড়ালে সবাই নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। তখন তার পিঙ্গল ঠোঁটে যে হাসি ফুটে উঠবে তা দেখে হিংসে করবে বান্ধবীর দল। একটা আনন্দের ঘন নিশ্বাসে তার বুক ওঠানামা করতে থাকে। নিজের অজান্তেই সে কখন যে তার একটা হাত হারুনের বুকের ওপর রেখেছিল তা খেয়ালই ছিল না তার।

ছোট বারান্দা ঘিরে গল্প করছিলেন তিনজন। নটু মামা, আব্বা আর আম্মা। অনিদ্রার ভয়ে আব্বা চা খেতেন না, কিন্তু আজ সে কথা মনে ছিল না তাঁর। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালেন নটু মামার দিকে। 'তোমার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তাতে শুধু ধন্যবাদ জানিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে সব ঋণ শোধ হয়না নটু। তোমার ঋণ অপরিশোধনীয়।'

'অযথা বিশেষণগুলো ব্যবহার করছেন আপনি। আসলে তেমন কিছুই করিনি আমি। আগে হারুণের সঙ্গে পরিচয় ছিল না। পরিচয়টাও আকস্মিক।'

'বড় চমৎকার ছেলে। এমন সৌভাগ্য হবে একথা কোনদিনই ভাবিনি।'

'আমি নিজেই প্রথমে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। রূপে গুণে হারুণ একেবারে অতুলনীয়।'

সেই সময় বাড়ীর দরজার পাশে একটা রিক্সা এসে থামল। ছোট একটা স্যুট্‌কেস নিয়ে ভেতরে ঢুকল সাঈদা। কোন কথা না বলে সোজা নিজের ঘরে এগিয়ে গেল সে। তার ব্যবহারে সবাই অবাক হলেন। এক সঙ্গেই প্রায় উঠে গেলেন বারান্দা থেকে।

ঘরের মধ্যে টেবিলের ওপর স্যুটকেসে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সাঈদা।

'সাঈদা!'

এগিয়ে গিয়ে ডাকলেন আম্মা।

কান্না থামিয়ে মুখ তুলে তাকাল সাঈদা। তার দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেলেন সবাই। এই তিনদিনে কী চেহারা হয়েছে তার? চুল উস্কোখুস্কো। সারা দেহে মালিন্যের চিহ্ন। গাল চুপসে গেছে। শাড়ীটাও ভাল করে পরেনি।

'কী হয়েছে তোমার? একা কেন তুমি? হারুন কোথায়?'

'কী দেখে বিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে?'

'তার মানে?'

নটু মামাই এগিয়ে গেলেন এবার।

'ও চরিত্রহীন।'

'এ্যাঁ!'

প্রবল বিস্ময়ে পরস্পর পরস্পরের মুখ চাইলেন। নটুমামার হাতে তখনো চায়ের পেয়ালা ধরা ছিল। মুখ নামিয়ে তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন কাউকে কিছু না বলে।

আব্বার মাথাটা যেন ঘুরে গেল। তিনি দু'হাত সজোরে দরজার চৌকাঠ চেপে ধরলেন। আম্মা অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রয়েছেন মেয়ের দিকে। যেন তার কথা বিশ্বাসই করতে পারছেন না।

ক্রিসেনথিমামের গাছের ওপর একটা বড় মাছি উড়ছে। অনেকক্ষণ ধরে। সাঈদা এতক্ষণ সেদিকে চেয়েছিল। হঠাৎ মুখটা ঘুরিয়ে দেখল চুপ করে বসে রীতা পুরনো একটা ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠা দেখছে। হয়ত অনেকক্ষণ থেকেই দেখছে সে। সাঈদা ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে ম্যাগাজিনটা টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিয়ে সেলফের মধ্যে গুঁজে রাখল।

রীতা অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কেড়ে নিলে যে?'

'জোর করে দেখছিলে বলে। ওতে মন সায় দেয় না রীতা।'

রীতা কোন কথা বলল না। ম্যাগাজিনটা রেখে সাঈদা ওর পাশে এসে বসল।

'সেদিন তোমাকে বলতে পারিনি তা নয়–তোমার খারাপ লাগবে বলেই নিজের কতা বলিনি।' সাঈদা তার দিকে চেয়ে একবার হাসল। অন্তত হাসার চেষ্টা করল। ব্যর্থতাকে যেন সযত্নে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।

'সবাই তার চেহারা দেখেছিল। আর কিছু বিচার করেনি। সে ছিল সুন্দর। অনুপম সুন্দর। এর চেয়ে ভাল বিশেষণ আর আমি খুঁজে পাইনি, রীতা। ভেনাসের মূর্তি দেখেছো তুমি? অবিকল তেমনি। শুধু সে পুরুষ। তা ছাড়া তাদের চেহারার মধ্যে আর কোন পার্থক্য ছিলনা। কিন্তু তবুও।'

সাঈদা একমুহূর্তে ভেবে নিল।

'তবুও তাকে ডাইভোর্স করতে হল।'

সাঈদা হঠাৎ থেমে গেল।

রীতার প্রশ্ন করার কোন ইচ্ছা ছিল না। তবুও তার অজ্ঞাতসারেই একটা শব্দ বেরিয়ে পড়ল মুখ থেকে।

'কেন?'

'কেন? না। কেন না, সে চরিত্রহীন।'

সাঈদা আবার হাসল।

'সে মদ খেত। রোজ। প্রতিদিন।'

'আরও দুটো বউ আছে তার। আছে তিনটে ছেলেমেয়ে।'

'রাতে সে বাড়ী ফেরে না প্রায়ই। কিন্তু কোথায় থাকে তা আমি বলব না তোমাকে।'

'আর–। আমাকে ক্ষমা কর রীতা।'

'তবুও, তবুও, সে ছিল অত্যন্ত সুন্দর। বাইরে থেকে তাকে মনে হত ভেনাসের মত।'

'আঃ! কী নিষ্পাপ সে! আঃ!'

রীতা অবাক হয়ে গেল। সাঈদার কথায় কিছু বলতে পারল না সে। সাঈদা চোখ দুটো গোল করে তাকাল তার দিকে। কেমন টল্‌টল্‌ করছে চোখে দু'টো। এখনি হয়ত ভেঙ্গে পড়বে কান্নায়।

কিন্তু সে কাঁদল না। একদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। ক্রিসেনথিমামের গাছের ওপরে তখন আর বড় মাছিটা উড়ছিল না ঘুরে ঘুরে। সেদিকে সাঈদা চেয়ে রইল একদৃষ্টিতে। চোখের সামনে ভেসে উঠলো পরিচিত সেই রাস্তাটা। রীতা আর সে পাশাপাশি হেঁটে চলেছে অপেক্ষাকৃত জনবিরল রাস্তার ওপর দিয়ে। খানিকক্ষণ পর সে টাউন টু-এ সার্ভিসে লেডিসের সীটে গিয়ে বসবে। খানিকটা ধূলো উড়বে চাকার তলা থেকে। পেট্রোলের একটা গন্ধ। তারপর সে এসে দাঁড়াবে পরিচিত একতলা একটা বাড়ির রেলিংয়ের সামনে। কড়া নাড়ার পর ভেতর থেকে দরজা খুলে দেবেন আম্মা। পড়ার টেবিলে বইগুলো রাখার পর সাঈদা এসে দাঁড়াবে জানালার পাশে। ছোট ক্রিসেনথিমাম গাছটা বাতাসে অল্প [illegible] দুলছে বাগানের মধ্যে। আজও কোন কুঁড়ি ধরেনি গাছটাতে। মনে মনে তখন ভাববে সে।■

চাবি

সন্ধ্যের অন্ধকার চারদিকে আবৃত হওয়ার আগেই মাঠ থেকে ফেরে কলিমুদ্দীন। গরু দুটো গোয়ালে বেঁধে লাঙলটা বেড়ার পাশে রেখে দেয় খাড়া করে। দাওয়ায় লম্ফ জ্বেলে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে দুধ খাওয়াচ্ছিল জরিনা। লম্ফের আলো তার মুখের ওপর পড়ে চিকচিক করছিল। কলিমুদ্দিন হাত-মুখ ধুয়ে জরিনার পাশে বসে ধপ করে। জরিনা আঁচলে বুক ঢেকে ছেলেকে কাঁদের ওপর নিতেই চিৎকার করে কাঁদতে থাকে।

জরিনা রেগে ছেলের ওঠে। ছেলের গালে আস্তে করে চড় মেরে বলে, কতক্ষণ ধইরা খাওয়াইতাছি তাও জল্লাদডার পেট ভরে না। কলিমুদ্দীন লুঙ্গির খোঁটা থেকে বিড়ি বের করে ধরানোর সময় হেসে ওঠে, জল্লাদ কইলে যে ওরে তা আমার চাইয়াও কম জল্লাদ নাহি,

জরিনা স্বামীর দিকে তির্যকভাবে চেয়ে থাকে এক মুহূর্তের জন্যে। স্বামীর কথার মধ্যে জড়িয়ে আছে তাদের সংসার জীবনের উষ্ণ স্পর্শ। বিয়ের পর থেকে স্বামীর শক্ত হাতের স্পর্শ তার সর্বাঙ্গে আদর বুলিয়ে রেখেছে। নিশ্চিন্তে বিছিয়ে দিয়েছে আবেগ আর ভালোবাসার স্নিগ্ধ লাবণ্য আর পৌরুষের সামর্থ্য ছোবল।

বিড়ির আগুনে জোনাকির প্রদীপের মত তার মুখ জ্বলতে থাকে।

কলিমুদ্দিন জরিনাকে ধরার চেষ্টা করতেই সে ছেলেকে তার কোলে দিয়ে চুলোর দিকে চলে যায়। চুলোর আগুনে তার মুখটা সন্ধ্যের লাল সূর্যের মত দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। আনন্দের অনুভূতি গলে গলে দেহের সর্বাঙ্গে প্রপাতের তরঙ্গের মত ঝরে পড়ে। চায়ের পানি চুলোর ওপর চাপানোর পর জরিনা স্বামীর দিকে চেয়ে দেখে। ছোট ছেলেকে কোলের ওপর বসিয়ে আদর করছে দুহাত দিয়ে। বিয়ের রাতে কলিমুদ্দিন জরিনার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলেছিল, তোমারে কিন্তু একডা কথা স্পষ্ট কইরা বলতে চাই। আমার কাছে পোলা-মাইয়া যাই হোক না ক্যান, তুমিই সব চাইতা প্রিয়। জরিনা তার কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল। এমন কথা সে কোনদিন শোনেনি–সাত গ্রামেও না। নিজের ছেলে-মেয়ের চেয়ে স্ত্রী প্রিয়। এটা কেমন করে হতে পারে তা সে কিছুতেই বুঝতে পারেনি। কলিমুদ্দিন তার বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে জরিনাকে বুকের ওপর টেনে নিয়েছিলো। পোলা মাইয়া হারাইলে তাগো আবার পামু, তোমারে হারাইলে আর ত পামু না। তাই তুমিই আমার সব।

লাল আগুনে জরিনার মুখ জ্বলজ্বল করতে থাকে। আনন্দে আর গর্বে। মগে চা ঢেলে নিয়ে যায় স্বামীকে দেওয়ার জন্যে। কলিমুদ্দিন হাটে গিয়েছিল সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে। বাড়িতে ফিরল প্রায় ছুটতে ছুটতে। হাতের থলি দাওয়ায় রেখে হাঁপাতে থাকে। জরিনা গ্লাসে পানি নিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। কলিমুদ্দিন ঢকঢক করে গ্লাসের পানি খেয়ে খালি গ্লাসটা জরিনার হাতে দিয়ে বলে, দেশে গজব অইছে বউ। হাটে শুনলাম পাকিস্তানী সৈন্যরা ঢাকায় বহু মানুষরে খুন করেছে।

ক্যান? জরিনার চোখে বিস্ময় ফুটে ওঠে।

ক্যান অহনও ভাল কইরা কইতে পারুম না। হুনলাম ইলেকশনে আমাগো দ্যাসের লোক জেতার পরও পশ্চিম পাকিস্তানীরা তাগো সরকার গঠন কইরতে দিতাছে না। তুমি এক কাম করো, ভাবীর রেডিওটা লইয়া আস। আটটার খবর শুনুম।

রেডিওর বদলে খালি হাতে ফিরে এলো জরিনা। মিজান ভাই রেডিও খুলে বসে আছে সারাক্ষণ। আটটার সময় তাকে খবর শোনার জন্যে আসতে বলেছে।

আটটা পর্যন্ত উসখুস করে কলিমুদ্দিন। কোন কাজে মন বসাতে পারেনা। জরিনার সঙ্গেও মন খুলে কথা বলে না। আটটার খবর শুরু হওয়ার আগেই মিজান ভাই ডেকে নিয়ে যায় তাকে। কলিমুদ্দিন মন দিয়ে খবর শোনে। খবরের পর মিজান ভাই সবাইকে বুঝিয়ে দেয় সব কিছু। পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন বাংলাদেশ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এদেশে থাকবে শুধু বাংলা ভাষাভাষীরা।

কলিমুদ্দিন মুখ ভার করে ঘরে ফেরে। জরিনা কোন কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস পায় না। ভাত খেয়ে সে নীরবে শুয়ে পড়ে। বাড়ির কাজ শেষ করে কুপি নিভিয়ে স্বামীর পাশে আসে জরিনা। স্বামীর পাশে নড়াচড়া করে।

কী অইল, কথা কওনা যে।

খবর শুইনা মনডা বড় খারাপ অইয়া গেছে বউ। দেশে বিদ্রোহের আগুন জ্বইলা উঠেছে। শেষ তক কী অইব তা কেউ জানে না। জরিনা সান্ত্বনা দেয়।

এসব ভাইবা কী অইব কও? সবার যা অইব আমাগোও তাই অইব।

হ, ঠিকই কইছ। নিদ যাও অহন, বিহানে আবার তাড়াতাড়ি উঠতা অইব।

কদিনের মধ্যেই শিমুলতলায় ঢাকার সব খবর ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকায় হাবিবুদ্দিন ব্যাপারীর দু'ছেলে পড়ে। হাসেম চাচার ছোট ভাইও এসেছে ঢাকা থেকে। তারা সারা গ্রাম ঘুরে দেশের খবর দিতে থাকে। সারা দেশে লেগেছে, এ আগুনের উত্তাপ সবাইকে একদিন স্পর্শ করবে। তাই আগুনের বিরুদ্ধে আগুন লাগাতে হবে। রাতে গ্রামের সবাইকে মোড়ল বাড়িতে ডাকা হয়। ঢাকা থেকে ছাত্ররা বক্তৃতা দেয় ওজস্বী ভাষায়। পাকিস্তানী সৈন্যরা দুদিনের মধ্যেই এ গ্রামে এসে পড়বে। নির্বিচারে হত্যা করবে সবাইকে, নারীর মান সম্ভ্রম লুটে নেবে। নিজেদের বাঁচাতে আর মা বোনদের সম্ভ্রম রক্ষা করতে এগিয়ে আসতে হবে সবাইকে। কাল

সকালেই গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে। তরুণ গ্রামবাসী'দের আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে হবে। আমরা সবাইকে ট্রেনিং দেব।'

দাওয়ার সিঁড়ির ওপর খুঁটি ধরে দাঁড়িয়েছিল জরিনা।

'কি অইল সভায় তোমাগো,

অনেক কিছু। আমি যুদ্ধ করুম মুক্তিবাহিনীর অইয়া।

যুদ্ধ করবা, কি কইতাছ?

হ। কইতাছি সব তোমারে।

কলিমুদ্দিন একে একে নিজেদের পরিকল্পনার কথা খুলে বলে। সব শুনে গম্ভীর হয়ে যায় জরিনা। শাড়ির একপ্রান্ত জড়াতে জড়াতে বলে, আমিও যামু তোমার লগে।

কি যে কও বউ। মাইয়া মানুষ আবার যুদ্ধ করব কী? কত আপদ-বিপদ তার ঠিক আছে নাহি? তোমাগো থাকার জইন্যে ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা অইছে। কোনো অসুবিধা অইব না।' জরিনাকে অনেক কষ্টে বুঝিয়ে রাজি করায় কলিমুদ্দিন। ছেলে নিয়ে সে ক্যাম্পে থাকবে দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত। তারপর একদিন এক হাতে বন্দুক আর অন্য হাতে জরিনাকে নিয়ে গ্রামে ফিরবে সে।

রাতেই ঘরের জিনিসপত্র বাঁধা শেষ করেছিল। চৌদ্দ পুরুষের ভিটে। মোগল এলো, পাঠান গেলো, ব্রিটিশ এলো, পাকিস্তান হলো কোনদিন ভিটেবাড়ি ছেড়ে কেউ কোথাও যায়নি। ভিটে বাড়ি তাদের কাছে মায়ের বুকের দুধের মত পবিত্র। আটচালা ঘরের দিকে তাকানোর সময় কলিমুদ্দিনের চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে।

কলিমুদ্দিন জরিনার হাত ধরে টেনে বাইরে আনার সময় মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ায়। তারপর জরিনার হাত ছেড়ে দিয়ে মাথা নিচু করে মাটিতে কপাল ঠোকে।

চললাম মা জননী তোমারে একা রাইখা। তোমারে রক্ষার ভার তোমার হাতেই ছাইড়া দিলাম। ফিইরা আইসা যেন তোমারে এমনই পাই।

জরিনা কলিমুদ্দিনের হাত ধরে টানে, চলো যাই।

দরজায় ঠিকমত তালা লাগাইছ ত?

হ, চাবি তোমারে দিছি।

শার্টের পকেট থেকে চাবি বের করে বারবার দেখে কলিমুদ্দিন।

পরশু দিন হাট থেকে একটা নতুন তালা কিনে এনেছে। চাবিটা চিকচিক করছে। গ্রামের পর গ্রাম ঘুরেছে কলিমুদ্দিন হাসান ভাইয়ের সঙ্গে। গ্রামের চেহারা দেখে সে শিউরে উঠেছে। লোক নেই, জন নেই, মরুভূমির মত চেহারা। কয়েকটা গ্রামে অল্প সংখ্যক লোক আছে, বাপ-দাদার ভিটের আকর্ষণ ছাড়তে পারেনি। একবার এক গ্রামে ঢুকে সে চমকে উঠেছিল। নদী থেকে পানি নিয়ে

ফিরছে এক গ্রাম্য বধূ। এক কাঁখে কলসী, অন্য কাঁখে ধরা উদ্যত সঙ্গীন। এদেশের গ্রামের মেয়েরাও বন্দুক ধরতে পারে এ দৃশ্য দেখে সে মুগ্ধ হয়েছিল।

ক্যাম্পে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়ি টানে আনমনে কলিমুদ্দিন। উজ্জ্বল নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে ভাবে এই নক্ষত্র তাদের বাড়ির ওপরও ঝিকঝিক করে আলোর প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছে। হয়ত আলো ছিটকে পড়েছে ঘরের চালের মাথার ওপর।

জরিনার লাগান পুঁইগাছটা কি এতদিন বেঁচে আছে? রোজ সকালে উঠে ছেলেকে দুধ খাইয়ে মগে করে পানি ঢালত গাছের শেকড়ে।

'কেমন আছ কলিমুদ্দিন'? হাসান ঘরে ঢুকে বসে তার পাশে।' উঠে বসে কলিমুদ্দিন। হাতের বিড়িটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

'আগামী বুধবার তোমাদের গ্রামে অপারেশনে যাব। ওখানে মিলিটারিরা বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিয়ে লোকদের ওপর অত্যাচার করেছে। আজ সকালেই খবর এসেছে আমাদের কাছে।'

তার কথা শুনে লাফিয়ে উঠে কলিমুদ্দিন।

'আমি যামু হাসান ভাই। আমাদের গেরামে যাইবেন আর আমি যামুনা। একি হয়? যামু আমি আপনাগো সাথে।'

বুধবারের আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ ঝলমল করছে। চাঁদের আলোর জন্যে গা বাঁচিয়ে চলতে হয় সতর্কতার সঙ্গে। পা টিপে টিপে সবাই শিমুলতলী গ্রামে এসে পৌঁছায়। সেখানে পৌঁছাতেই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে হাসানের চর।

'হাসান ভাই, আমি নান্টু,।

'এসো। ফিসফিস করে বলে হাসান।'

'ফিসফিস করে কথা বলার দরকার নেই। শত্রুরা আজ দুপুরেই গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে উজানপুরের দিকে।'

'গ্রামের কোন ক্ষতি করেছে,'

'যা সব জায়গায় করে এখানেও তা করতে বাকি রাখেনি। কাল সকালে নিজের চোখেই সব দেখতে পাবেন।'

কলিমুদ্দিনের বুক কাঁপতে থাকে হাঁপরের মত। ভয়ে, দুর্ভাবনায় তার মন আক্রান্ত হয়ে পড়ে মুহূর্তের মধ্যে। তাদের বাড়ি ঠিক আছে ত? বুক পকেটে হাত ঢুকিয়ে সন্তর্পণে চাবিটা ছুঁয়ে দেখে, চাবিটা ঠিক জায়গাতেই আছে।

'আমাদের আসাটা নিরর্থক হলো।'

'নিরর্থক বলছেন কেন? এখান থেকে উজানপুরে যেতে পারেন আগামীকাল।'

'তাই করতে হবে। চলো, তোমার সঙ্গেই যাওয়া যাক।'

'আপনারা নান্টু ভাইয়ের সঙ্গে যান, আমি আমাগো বাড়িটায় একটু ঘুইরা আহি।

'ঠিক আছে, বেশি দেরি করো না।'

কলিমুদ্দিন হনহন করে হাঁটতে থাকে সামনের দিকে। এখান থেকে বাড়ির পাশের আমগাছটা দেখা যায়। বুকের সানন্দ বেড়ে যায় তার। আর একটু এগোলেই তাদের বাড়ি। এক পা এক পা করে বাড়ির দিকে এগিয়ে প্রচণ্ড বিস্ময়ে থমকে দাঁড়ায় সে। কোথায় তাদের পরিচিত বাপ-দাদার সেই ভিটা? আগুনের শিখা বাড়ির তিনভাগ গ্রাস করার পর বীভৎস্য মূর্তি নিয়ে সেটা দাঁড়িয়ে আছে। রাইফেলটা বাঁ হাতে ধরে দাওয়ার ওপর উঠতেই চাঁদের আলোতে সামনে বীভৎস্য দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়ায়। একটা মেয়ের মৃতদেহ, আটহাত দূরে আর একটা মৃত শিশু। সামনে গিয়ে মৃত দেহের দিকে তাকাতেই তার মাথা ঘুরে ওঠে। তার সামনে প্রায় উলঙ্গ হয়ে পড়ে আছে জরিনা আর দূরে ছোট ছেলেটা ভয়ার্ত চোখে হা করে। ছেঁড়া শাড়ির বেশির ভাগ অংশই লুটেছে মাটির ওপর। ব্লাউজের চিহ্ন হিসাবে একহাত এক টুকরো কাপড়। মাটি থেকে ছেঁড়া কাপড় কুড়িয়ে জরিনার গা ঢেকে দেবার উপক্রম করতেই তার হাত অসার হয়ে যায়। সারা গায়ে ক্ষত আর জমাট বাঁধা রক্ত। যেন শকুন গায়ের মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে। হায়েনার আক্রমণে বুক দুটো ক্ষত-বিক্ষত। ঠোটের কোনে জমাট বাঁধা রক্ত। ভাতের সানকিটা কয়েক টুকরো হয়ে পড়ে আছে উঠোনের এক দিকে। ইতস্ততঃ ছড়ান ভাতের মধ্যে একটু পুঁটি মাছ, জরিনার সবচেয়ে প্রিয় মাছ। আল্লাহ বলে চিৎকার করে উঠে কলিমুদ্দিন। পরক্ষণে জরিনার দেহটা দু'হাতে ধরে চিৎকার করতে থাকে, 'ক্যান আইছিলি বাড়িতে? কে তোরে বলছিল বাড়ি দ্যাখবার লগে। আর কডা দিন সবুর করলি না ক্যান? ক ক্যান করলি না?'

হাতের রাইফেলটা একপাশে ছুঁড়ে ফেলে কলিমুদ্দিন। পাগলের মত জরিনার দেহটা মাটি থেকে দু'হাত তুলে নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকায়।

কও তুমি, কী অন্যায় করছি আমরা, যার জন্যই তুমি মানুষ দিয়া মানুষকে খাওয়াইলে? এই কী তোমার বিচার।

কলিমুদ্দিন চিৎকারে সারা গ্রামে প্রতিধ্বনি হয়ে ফেরে।

'কও কী অন্যায় করছি আমরা?'

কলিমুদ্দিনের চিৎকার শুনে ছুটে আসে হাসান তার দলবল নিয়ে। তার পেছনে সবাই দাঁড়িয়ে থাকে বোবা দৃষ্টি নিয়ে।

অনেকক্ষণ পর হাসান এগিয়ে গিয়ে হাত রাখে কলিমুদ্দিনের পিঠে।

'উঠে এসো ভাই।'

কলিমুদ্দিন চোখ তুলে তাকায় হাসানের দিকে। স্পন্দনহীন দৃষ্টি। জরিনার মৃতদেহ মাটির ওপর রেখে সবাইকে একবার করে দেখে পকেট থেকে কাগজে মোড়া চাবিটা বের করে তাদের দিকে উঁচু করে ধরে।

'আপনারা কেউ কইতে পারেন এই চাবি দিয়া অহন কোন ঘর খুলুম আমি?।'■

জানালা

বন্ধ জানালার পাশে চেয়ার টেনে এনে চুপ করে বসেছিল শওকত। জানালা খুললেই শীতের মিষ্টি রোদ ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সে ইচ্ছা করেই ওটা খোলেনি। কতদিন যে খোলেনি তা নিজেই জানে না। হুকগুলোয় হয়ত মরচে ধরে গেছে। গেলেই বা ক্ষতি কি তার? এমনি করে বছরের পর বছর ওটা বন্ধ থাকবে।

'কিন্তু যা ভয়ানক শীত।'

আলোয়ান গায়ে ভাল করে টানতে টানতে নিজেই অনুবৃত্তি করে। এ-সময় গরম এক কাপ চা হলে চমৎকার জমত। তারও উপায় নেই। নাস্তা খাইয়ে চাকরটা বাজারে গেছে। রবিবারের ছুটিটা গল্প আর বেড়িয়ে কাটাবে বলে খাওয়ার ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি সেরে নিতে চায়। সপ্তাহের একটা দিন কিছুতেই নষ্ট হতে দিতে পারে না।

কিন্তু বন্ধ জানালাটা!

বারে বারে ওর চোখ গিয়ে পড়ে ওটার ওপর। প্রতিহত দৃষ্টি সংহত করতেই মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। শীত না লাগলে বোধহয় এত কষ্ট লাগত না। জানালার কথাও মনে পড়ত না এত বেশী করে।

কতদিন থেকে জানালা বন্ধ করে রেখেছে মনে মনে হিসেব করতে লাগল শওকত। তিন মাসের মত হয়ে গেছে। ওদিকটা যাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর পর হতেই সেখান থেকে সরে এসেছে। নিজের দুর্বল মনকে কিছুতেই আর উঁকি মারতে দেওয়া হবে না।

ও ভেবে দেখল, এখন রোদ নিশ্চয় শাহানাদের উঠোনের ওপরও ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে শাহানা ছোট ভাইবোনদের সঙ্গে রোদ পোয়াচ্ছে। ওর আব্বা এক পাশে চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন আর কখনো বা না পড়ার জন্যে বাচ্চাগুলোকে বকছেন! শাহানা কি সকালে উঠেই গোসল করেছে? ওর ত অভ্যাস! ছাড়েনি নিশ্চয়! তাহলে ও বসে বসে রোদে চুল শুকোচ্ছে। দেখবে নাকি একবার উঁকি মেরে? না। কি দরকার ওর! যার সঙ্গে সম্পর্ক পাতাতে পারেনি তাকে নতুন করে মনে করা অর্থহীন। শওকত নিজের উচ্ছ্বাসকে সংযত করল। বন্ধ জানালার দিকে একবার আক্রোশের সঙ্গে তাকিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে ও নেমে গেল নীচে। পাশের দোকানে এক কাপ চা খাওয়ার পর খানিকটা স্বস্তি পাওয়া যাবে।

দোকানে ঢুকে দেখল বসার জায়গা নেই। আর ভেতরটা অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা। সেখানে না দাঁড়িয়ে আবার বাইরে বেরিয়ে এলো সে। ভাবল, কোথায় যাওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয় চায়ের দোকান এখান থেকে খানিকটা দুরে। সেখানেই যাওয়া যাক বরং। হাতে ত এখন অঢেল সময়। জোরে জোরে পা চালাতে লাগল শতকত।

খানিক দুর যেতেই দেখল বাসষ্ট্যাণ্ডে রেহানা দাঁড়িয়ে। নিশ্চয়ই ওদের স্কুলের গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে। ওকে দেখে রেহানা চোখ তুলে চাইল। তার দিকে তাকিয়েই মুখটা ঘুরিয়ে নিল শওকত। ওর মনে হল, রেহানা একটা অবজ্ঞার ভাব দেখাল। যেন তাকে চেনেই না, এমনিভাবে তার পাশ দিয়ে হেঁটে গেল সে।

রাস্তার ওপাশে গিয়ে একবার পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখল, রেহানা তখনও বাসষ্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে। রেহানাকে একপলক দেখল সে। মনে হল, আগের মতই আছে। যখন ওর হাতে চিঠি গুঁজে দিয়ে বলত, শাহানাকে দিও। কেউ যেন না দেখতে পায়। তাহলে এক প্যাকেট–যা চাও, কাজু বাদাম অথবা টফি–তাই পাবে। তখন রেহানা দুষ্টুমি ভরা হাসি দিয়ে বাড়ির ভেতর ছুটে পালাত। রেহানার হাতে দু'জনে কত চিঠির আদান-প্রদান হয়েছে তার হিসেব নেই। এখন আর রেহানাকে দূতীগিরি করতে হয় না। পাশে দাঁড়ালেও কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলে না–যেন চেনেই না। অথচ, এক সময় রেহানাকে পাশে বসিয়ে কতদিন চা খাইয়েছে।

ধ্যেৎ! কি সব আজেবাজে ভাবছে শওকত এভাবে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে। একথা মনে হওয়ার পরও নড়ল না। একটু পরে রেহানা বাসে উঠে গেল। চলমান বাসের দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এল। কেন তাও স্পষ্ট করে জানে না–কিন্তু একেবারে অজানা নয়। এদের সে পেতে চেয়েছিল, মাঝখান থেকে সব ওলটপালট হয়ে গেল। দোষ বোধহয় তারই। কিন্তু ইচ্ছা করে সে অন্যায় করেনি, করবে বলে ভাবেওনি কখনো।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে অলসভাবে রোদ পোয়াতে ভালই লাগছিল শওকতের। হঠাৎ ওর মনে পড়ল সে চা খেতে বেরিয়েছে। পকেট থেকে সিগারেট বের করে প্রথমে আগুন ধরাল। তারপর একগাল ধোঁয়া ছেড়ে রেষ্টুরেন্টের দিকে এগোতে লাগল ধীর মন্থর গতিতে।

একদিকে নির্জন একটা টেবিল দেখে সেখানে গিয়ে বসল শওকত। এখানেও সবাই রবিবারের সকাল উপভোগ করতে এসেছে অলসের মত। বেয়ারাকে চায়ের অর্ডার দিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে চারদিক একবার দেখে নেয়। পরিচিত কেউই নেই। শওকত লক্ষ্য করল তার পাশে পূর্বদিকের জানালাটা বন্ধ কেন? খুলে দাও ত।'

বেয়ারাকে লক্ষ্য করে বলে সে।

'ওটা খোলা যাবে না। পাশের বাড়ির লোকদের অসুবিধে হয়।'

স্বগতোক্তি করল শওকত। এখানেও পাশের বাড়ির অসুবিধে। জানালাটা খোলা থাকলে একপ্রস্থ রোদ ছড়িয়ে পড়ত টেবিলের ওপর। এখানেও সে উপায় নেই। বিশ্রী। ভারি বিশ্রী এ সব!

চায়ের পেয়ালা টেনে নিয়ে মনে মনে ভাবতে থাকে। চুমুক দিতে দিতে এক একবার জানালার দিকে তাকায়। তার মনে হল শাহানা ওখানে তার নীল শাড়ী রোদে মেলে দিচ্ছে। ওর চেকন হাত দু'টো দেখা যাচ্ছে।

'কেমন আছ?'

ভাল থাকার উপায় কোথায়? ভাল থাকতেই ত চাই, কিন্তু তুমি থাকতে দিচ্ছ কোথায়? তোমাকে ভুলে থাকতে পারিনে এক মুহূর্ত।'

'মাঝে মাঝে ভুলে থেকো, তা নইলে পরীক্ষার একদম....' বলেই থেমে গেল শওকত। হাসল একটু।

'তাই বোধহয় পাপ। জান, একদম মন বসাতে পারিনে পরীক্ষায়। শুধু তোমার কথা মনে পড়ে। আচ্ছা কতদিন এভাবে চলব?'

'আরো কিছুদিন, লক্ষ্মীটি। একটু ঠিক হলেই পাশের বাড়ির দেওয়ালটা ভেঙ্গে দেব।' শাহানার হাত দু'টো পীড়ন করতে করতে বলে শওকত।

বদ্ধ জানালার দিকে তাকিয়ে শাহানার উজ্জ্বল চোখ দুটো দেখতে পেল শওকত। হঠাৎ যেন পানিতে টলটল করতে লাগল ওর চোখ। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি চা-খাওয়া শুরু করল সে। না, এখানে আর এ-ভাবে বেশীক্ষণ থাকা চলবে না। বড্ড বেশী করে কল্পনা করছে আজ।

সকালে উঠেই খবরের কাগজ চোখের সামনে মেলে ধরতেই বি.এ. পরীক্ষার রেজাল্টের দিকে চোখ পড়ল শওকতের। তাড়াতাড়ি বসে পড়ল সে। একটা উত্তেজনায় ওর ভেতরটা কেঁপে উঠল। শাহানা এবার পরীক্ষা দিয়েছিল ও কী পাস করেছে? ওর রোল জানেনা। শাহানা জানায়নি? প্রয়োজন নেই বলে। রোলগুলোর দিকে বারে বারে তাকাতে লাগল সে। প্রত্যেকটি রোলই একবার করে দেখল। কোনটা শাহানার?

শওকত কাগজটা রেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। পূর্বদিকের জানালাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। প্রচণ্ডভাবে একটা ইচ্ছা উঁকি মারতে লাগল ওর মধ্যে।

কিছুতেই নিজের আবেগকে দমন করতে পারল না। জানালাটা ঈষৎ ফাঁক করে কী সে দেখবে? ওরাও নিশ্চয় কাগজ দেখছে এখন? শাহানা কী করছে?

শওকত জানালার খিল খুলে একটা কপাট একপাশে সরিয়ে দিল। পাশের বাড়ির একটা অংশ দেখা গেল সেই ফাঁক দিয়ে। কুয়োর পাশে রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু সেখানে কেউ নেই। এমন সুন্দর রোদ কেউ উপভোগ করছে না। কেউ নেই কেন ওখানে? নিজেকে প্রশ্ন করল শওকত। ও বিস্মিত হল। আরেকবার চাইতেই ও দেখল, দেওয়ালের একপাশে খবরের কাগজটা পড়ে রয়েছে। ওর বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। তাহলে কী পাশ করেনি শাহানা?

জানালাটা বন্ধ করে চোরের মত সেখান থেকে চলে এল শওকত। চেয়ারে বসে দু'চোখ হাত দিয়ে চেপে ধরল। চোখ দু'টো যন্ত্রণা করছে। শওকতের মনে হল, পাশের বাড়ির দোতলায় ঘর থেকে অবরুদ্ধ একটি কান্নার ধ্বনি ভেসে আসছে। কান পেতে শুনল সে অনেকক্ষণ ধরে। ভয়ানক খারাপ লাগল তার। নিজেকে অপরাধী মনে হল সেই সঙ্গে। কোন রকমে পোশাক পরে রান্নাঘরে গিয়ে চাকরকে বলল, 'আজ আগেই অফিসে যাচ্ছি। কাজ আছে অনেক।'

নীচে নেমে রিক্সা ডেকে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বলল, 'চল, সামনের দিকে।'

অফিস থেকে দেরী করেই বেরিয়েছিল শওকত। এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে হবে বলে বারে বারে হাতঘড়ি দেখছিল। হাতে এখনো সময় আছে, ঠিক সময় গাড়ি না পেলে দেরী হওয়ার সম্ভাবনা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রিক্সা কিংবা স্কুটারের প্রতীক্ষায় এদিক ওদিক চাইছিল অধীরভাবে। কোনটাই খালি নয়। এমন সময় ওর লক্ষ্য গেল অফিসের দিকে। সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে একজন মেয়ে নামছে। সেদিকে তাকিয়ে ওর ভাল লেগে গেল। মিষ্টি মেয়েটি। চমৎকার দেখতে। একবার দেখেই তাকে স্ত্রী করার বাসনা জাগল শওকতের। চমৎকার হত মেয়েটিকে পেলে। মেয়েটি ততক্ষণ নিচে নেমে এসেছেন মুখ তুলতেই শওকত থতমত খেয়ে গেল। শাহানা। আশ্চর্য! অবাক লাগল তার।

সে তাকে দেখার আগেই তাড়াতাড়ি করে রাস্তার অন্যপাশে সরে গেল শওকত। আত্মস্থ হতে খানিকটা সময় নিল। পরে শাহানার আবির্ভাব সম্পর্কে প্রশ্ন জাগল মনের মধ্যে। এখানে এসেছিল কেন সে? চাকরী করতে চায় নাকি? ওর ত চাকরীর কোন দরকার নেই। হয়ত সে যা ভাবছে তার জন্যে মোটেই আসেনি শাহান। অযথা মনের মধ্যে অনেকগুলো প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে। সামনে একটা খালি স্কুটার দেখেই তার ওপর চেপে বসল সে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আবার দেখা হয়ে গেল শাহানার সঙ্গে। প্রথমে খেয়াল করেনি শওকত। সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। সামনে কোন মেয়ে ছিল না। একপাশ দিয়ে শাহানা নামছিল। এক সিঁড়িতে যেতেই শওকত ওকে দেখতে পেল। শাহানাও তাকে দেখছিল। ওর দিকে তাকায়নি। মুখ নীচু করে পায়ের গতি বাড়িয়ে দিল। আর শওকত তাকে অতিক্রম করার জন্যেই পাশ দিয়ে তাড়াতাড়ি করে নেমে গেল নীচে। ওর বুকের ভেতরটা দপ দপ করছে তখন। হয়ত প্রবল উত্তেজনায় কিংবা সঙ্কোচের আত্মপীড়নে। এর যে কোন একটি হতে পারে তা শওকত জানে।

পরের দিন অফিসে নিজের ঘরের পাশেই দেখা হয়ে গেল শাহানার সঙ্গে। শাহানা একা নয় অনেকগুলো মেয়ে ছিল তার পাশে। শওকতের মনে পড়ে গেল তাদের অফিসে কয়েকজন মহিলা কর্মচারী নেওয়া হবে। তবে কী তার জন্যেই

শাহানা এসেছে'? ও কিছুতেই শাহানার চাকরীর কথা সহ্য করতে পারল না। এখানে ওর চাকরীর অর্থই হচ্ছে প্রত্যেকদিন দেখা হওয়া এবং... । তারপর আর ভাবতে পারেনা সে। শাহানা ভেবেছে কী'? সে হাতের মুঠোর মধ্যে এসে যাবে? এ ধারণা কেন হল শাহানার! উ:! অসহ্য! শওকত টেবিলের ওপর মাথা গুঁজে বসে রইল অনেকক্ষণ।

কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই শওকতের। যারা টেস্ট দিয়েছে তাদের খাতা দেখতে হবে তাকে। সামনের এক ঢিবি কাগজগুলোর দিকে তাকিয়ে ওর মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। আত্মস্থ হতে বেশ সময় নিল তার। কাগজগুলোর দিকে তাকিয়ে ওর মধ্যে একটা অদম্য বাসনা প্রবল হয়ে উঠতে চাইল। শাহানার খাতা প্রথমে দেখে। কিন্তু না। এ দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। এখানে সে কারুর একদা প্রেমিক পুরুষ নয়– এখানে নিরপেক্ষ অফিসার। ওপর থেকে একটা করে কাগজ টেনে দেখতে লাগল সে। তিন চারটে খাতা দেখার পর খাতা দেখা বন্ধ করে এক একটা পৃষ্ঠা ওল্টাতে লাগল। মাঝখান থেকে শাহানার কাগজের দিকে অপলক নয়নে চেয়ে রইল শওকত। এই তার শাহানার লেখা! কত পরিচিত অক্ষরগুলো! এর মধ্যে দিয়েই একদিন খুঁজে পেত সান্ত্বনার পরম আশ্বাস, অনুভবের গাঢ় চেতনা, উপলব্ধির গভীর আনন্দ। কতবার করে এক একটা চিঠি পড়েছে। তবুও আশা মেটেনি। রাতের বেলায় নেভান বাতি জ্বালিয়ে শাহানার চিঠি পড়ত সে। সেই শাহানা আজ এসেছে তার সামনে অন্য এক মূর্তি নিয়ে। দেবে নাকি কম নম্বর! যাতে শাহানা এখানে না আসতে পারে! শওকত নিরপেক্ষ হওয়ার জন্যে নিজেকে শক্ত করল। প্রথম প্রশ্নের উত্তরের জন্যে শাহানা বলেই এক নম্বর বেশী দিল। সব শেষেও দেখল, শাহানা অনেক নম্বর পেয়েছে। সম্ভবতঃ চাকরী পাবে।

শওকত নিজের ঘরে ঢুকে ফাইলগুলো নাড়াচাড়া করার সময় ওর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল দূরের এক কোণায়। মুখ নীচু করে শাহানা কাগজগুলো দেখছে তন্ময় হয়ে। শওকতের ঘর থেকে ওকে স্পষ্ট দেখা যায়। শওকত ফাইল নামিয়ে একবার দেখল ওকে। ভয়ানক অস্বস্তি অনুভব করল। চোখ তুলতেই শাহানার দিকে দৃষ্টি যাচ্ছে। শওকত জোর করেই নিজের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল।

বেয়ারাকে ডেকে চা আনিয়ে সিগারেট ধরাল শওকত। ছাই ফেলতে গিয়ে দেখল এ্যাসট্রে ভর্তি হয়ে গেছে। এর মধ্যেই এতগুলো সিগারেট খেয়ে ফেলেছে সে! ছাই ফেলার সময় ও দেখল শাহানা ওর দিকে কেমন করুণভাবে তাকিয়ে আছে! শওকতের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। শাহানা ওর বেশী সিগারেট খাওয়া সমর্থন করত না। জোর করে সিগারেটের প্যাকেট লুকিয়ে রাখত। এখনো কী তার সেই পুরনো শাসনের অভ্যেস ছাড়তে পারেনি'? দূর থেকে তাই শাসন করছে শওকতকে'? কিন্তু তাতে কী আসে যায় তার'? শাহানার শাসনকে সে মানবে কেন? এ-কথা মনে হওয়ার পর ওর হাসি পেল। খানিকটা ধোঁয়া ছড়িয়ে দিল ওপরের দিকে। তারপর অর্ধেক সিগারেটটা ঢুকিয়ে দিল এ্যাসট্রের মধ্যে।

কাচঘেরা ঘরের মধ্যে ঢুকলেই অস্বস্তিতে শওকত বিবর্ণ হয়ে পড়ে। আগের মত কাজে মন বসাতে পারে না কিছুতেই। বারে বারে আনমনা হয়ে যায়। বাইরে চোখ যেতেই দেখে, কাগজের ফাঁক দিয়ে তাকে দেখছে শাহানা। সে তাকালেই নিজের দৃষ্টিকে সংহত করে নেয়। কাগজ থেকে মুখ তুললেই দেখে, শাহানা তাকে লক্ষ্য করছে। শওকত ঠিক করল, তার ঘরের চারদিকে পর্দা লাগাবে। তাহলে বাইরের দৃষ্টি তাকে বিদ্ধ করতে পারবে না। নিজেই তদারক করে পর্দা লাগাল সে। তারপর খুশী হয়ে কাজ করতে বসল।

পরের দিন কাজ করার সময় অতিরিক্ত উল্লাসিত হয়ে পড়ল শওকত। শাহানার কথা ভেবে মনে মনে আনন্দ পেল সে। এবার পাহারা দেওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করতে হবে তাকে। শাহানা কী ভেবেছে এভাবে পাশে থাকলেই শওকতকে পাবে? মন জিনিসটা কী এমনিই তরল? তাকে পাহারা দিলেই সে আরো দূরে সরে যাবে?

কয়েকদিন নিশ্চিন্তে কাটাবার পর শাহানার অবস্থা জানার জন্যে ওর অদম্য কৌতূহল জন্মাল। শাহানা কী এখনো তাকিয়ে আছে তার ঘরের দিকে? দরজা ঠেলে বাইরে এল শওকত। শাহানার চেয়ারের দিকে তাকিয়ে দেখল সেখানে কেউ নেই। মনে হল, কেউ বসেনি চেয়ারে। ফাইলগুলো নাড়াচাড়া করা হয়নি। বিস্মিত হল শওকত। শাহানা কী আজ আসেনি। সেদিকে এগিয়ে গিয়ে সে কেরাণীকে জিজ্ঞেস করল,

'এই সিটের মহিলা আসেননি?"

'না। উনি চাকরী ছেড়ে দিয়েছেন।'

'ছেড়ে দিয়েছেন!'

এর জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না শওকত। শাহানা সম্পর্কে অনেক কথা ভেবেছে, এ দিকটা বিন্দুমাত্র চিন্তা করেনি সে। শাহানাকে অত্যন্ত কাছে থেকে শওকত দেখেছে। আজ মনে হল, সে তাকে ভাল করে চিনতে পারেনি। চেনার হয়ত চেষ্টাই করেনি।

বাড়িতে ফিরে গিয়ে টাইটা খুলে বিছানার ওপর ছুড়ে ফেলে দিল শওকত। জুতো খুলে ইজিচেয়ারের ওপর এলিয়ে পড়ল অসুস্থের মত। ওর চোখ যেন ক্রমশ: বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে ক্লান্তিতে, অবসাদে এবং সেই সঙ্গে গভীর শূন্যতায়। শওকত চোখ বন্ধ করল। অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও বিচ্ছিন্নভাবে মন চতুর্দিকে সরে গেল শুধু। বিরক্ত হয়ে চোখ খুলতেই ওর দৃষ্টি পড়ল বদ্ধ জানালার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে সোজা হলে বসল। মুহূর্তের জন্যে ও ভাবল, যেখানে মনের এত ব্যবধান সেখানে জানালা বন্ধ করে দিয়ে লাভ কী? শওকত উঠে দাঁড়াল। তারপর বদ্ধ জানালা তা খুলতে চেষ্টা করল। মনে হল, খিল আটকে গেছে। কিছুতেই খোলা যাচ্ছে না। শুধু বদ্ধ জানালার ওপর থেকে শওকতের আঘাতের শব্দ শোনা যাচ্ছে একটানাভাবে।■

উত্তর পুরুষ

দীর্ঘ বিরতির পর প্রথম সাক্ষাতে দু'জনই পরস্পরের মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। মোশফেক আর মহিউদ্দীন। বিশ্ববিদ্যালয়ে একসঙ্গে এম. এ. পাস করার পর তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ। মাঝখানের সময়টুকুতে ঘটে গেছে বিচিত্র পরিবর্তন। সেই বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে দু'জনে দু'প্রান্ত থেকে মাথা তুলে সামনা সামনি দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে। বিস্ময়ের সঙ্গে একটা অদ্ভুত আনন্দ। বহুদিন পর পরিচিত সান্নিধ্যের সুখ।

'মহিউদ্দীন তুমি! আমি যেন ভাবতেই পারছিনে।'

মোশফেক মহিউদ্দীনের দিকে তাকিয়ে অনুচ্চস্বরে অনুবৃত্তি করে। মহিউদ্দীন সহাস্যে মোশফেকের হাত চেপে ধরে। গোল চোখ দু'টো আনন্দে উদ্ভাসিত হয় ঘন ঘন।

'সাত বছর পর দেখা। অথচ আশ্চর্য লাগছে একটুকুও বদলাও নি তুমি। একবার চাইলেই সেদিনের নামকরা সুন্দর ছাত্রটিকে চিনে নেওয়া যায়। যার মুগ্ধ হতো মেয়েরা।'

মহিউদ্দীনের কথায় দু'জনেই হেসে উঠে। অত্র হাসির প্রবাহ ছড়িয়ে পড়ে সারা ঘরে।

মোশফেক ঘরের ভেতর চেয়ে বললে, 'আস্তে শুনলে অনেক কিছু কল্পনা করবেন; অবশ্য, এখন বাইরে গেছেন।'

মহিউদ্দীন হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে ওঠে। মোশফেকের দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ হাসে। মোশফেক ওর ভাব দেখে বিস্মিত দৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকায়।

'কি ব্যাপার? থেমে গেলে যে হঠাৎ।'

'তোমাকে চম্‌কে দেব আজ। দাঁড়াও।'

মহিউদ্দীনের শ্যামল মুখের ওপর জোৎস্নার হাসি চমকিত হতে থাকে। মোশফেক তার মুখে, ঠোঁটের প্রান্তে এ হাসি কোনোদিন দেখেনি। তাই কিছু বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে থাকে।

'বুঝতে পারনি। আচ্ছা, এখনই সন্দেহ দূর করছি।'

মহিউদ্দীন বাইরে গিয়ে আবার ঘরে ফিরে এল। বাইরের দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসতে থাকে।

'এস রাণু।'

মোশফেক নাম শুনে চম্‌কে ওঠে।'

রাণু!

রাণু ততক্ষণ মোশফেকের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। হাত তুলে অভিবাদন জানায়। মোশফেক এতক্ষণ বিহ্বলের মত দাঁড়িয়েছিল। চম্‌ক ভাঙল তার। হাত তুলে সে-ও অভিবাদন জানায়। যেন রাণুকে দেখে বিস্মিত হয়েছে। ভাবতেই পারেনি।

মহিউদ্দীন মোশফেকের দিকে তাকিয়ে দেখে, ওর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। কানের দু'পাশ লাল। ছাত্রাবস্থা থেকেই মোশফেক নাজুক। মনে মনে হাসে সে।

'এখনো তোমার সেই মেয়েলি লজ্জা গেল না।'

মহিউদ্দীন জোরে হেসে ওঠে।

সবাই এসে বসে সোফার ওপর।

মোশফেক প্রকৃতিস্থ হয়ে নিয়েছে। স্বাভাবিক জড়তা ছেড়ে অনেকখানি সহজ হয়ে পড়ে সে।

বলে, 'সে কি, এতক্ষণ ওকে বাইরে দাঁড় করে রেখেছিলি'?'

মহিউদ্দীন সিগারেট ধরায়। আড় চোখে রাণুকে একবার দেখে মোশফেক। না। হিংসে করার কিছু নেই তার। একটু হয়ত উজ্জ্বল হয়েছে। সরু দেহখানা নাইলনের লাল শাড়ি দিয়ে জড়ান। গলায় ভারি সোনার হার। হাতের সোনার চুড়িগুলো অনবরত শব্দ করে। আঙটির পাথর থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে তার কোলে এসে পড়েছে। মুখ ফিরিয়ে অকারণেই সে হাসে। সাজ-সজ্জার উজ্জ্বল দিক মনে করেই হাসির আভা দু' ঠোঁটের প্রান্তে বিচ্ছুরিত হতে থাকে। মহিউদ্দীন মোশফেকের দিকে তাকিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ে।

'সিগারেট খাওনা নাকি?'

'না। ওটা ভাল লাগে না।'

'খানিকটা ইকনমিক হওয়া যায়। অবশ্য অনেকের দ্বিতীয়পক্ষ ভালওবাসেন না।'

রাণু নিজের দেহ নেড়ে হাসতে হাসতে বলে।

মোশফেকের কানের প্রান্ত অ-কারণেই গরম হয়ে যায়। 'এর কোনটাই ঠিক নয়। কেননা, উনিও এটা পছন্দ করেন, আর আমি ইকনমিক হওয়ার জন্যেও সিগারেট বর্জন করিনি। নিজের পছন্দ অপছন্দের জন্যে ভাল লাগে'না।'

'কিন্তু বর্তমান সভ্য মানুষের পক্ষে এটা যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। অবশ্য ছোটবেলা থেকে জিনিসটা বর্জন করে ভালই করেছ। সে তুলনায় আমরা অকালপক্ক।'

মহিউদ্দীন আবার হাসতে থাকে।

মোশফেক মহিউদ্দীনের দিকে চেয়ে বলে, 'কেমন আছ এবার বল?'

সিগারেটের শেষাংশ এ্যাসট্রেতে ফেলে নতুন করে একটা ধরিয়ে চোখ বন্ধ করে মহিউদ্দীন।

'প্রচুর খবর। একদিনে সব শেষ করা যাবে না। তুমি কিছুটা জানতে। মানে—'

রাণুকে আঙুল দিয়ে দেখায় মহিউদ্দীন।

'এঁর প্রতি যে অনুরাগ ছিল ক্লাসের অনেকেই জানত। তোমাকেও বলেছিলাম। তারপর গত বছর একেবারে পাণিগ্রহণ। সঙ্গে সঙ্গে রাজকন্যা আর অর্ধেক রাজ্য লাভ।'

মহিউদ্দীনের উচ্চ হাসিতে ঘর ভরে যায়।

'আ! সেই পুরোনো কথা না বললে যেন চলে না তোমার। সবার কাছেই একবার করে বলা চাই!"

রাণু মুখে গাম্ভীর্য নিয়ে মহিউদ্দীনের দিকে তাকিয়ে বলে।

'কি যে বল তুমি? মোশফেক আমার পুরনো বন্ধু। তাছাড়া তোমারও বন্ধু। একই সঙ্গে পড়েছি।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে সবাই।

আচম্‌কা প্রশ্ন করে মহিউদ্দীনকে মোশফেক।

'কি করছ আজকাল।'

'ইমপোর্ট লাইসেন্সের ব্যবসা। তাছাড়া, অন্যান্য ব্যবসায়েও হাজার খানেক শেয়ার আছে। বছরে যাট হাজার আয়। কোন রকমে চলে যায়।'

মোশফেক কেমন যেন চুপসে যায়। মুখ নীচু করে থাকে। রাণু শাড়ির আঁচলে আঙুল জড়িয়ে মোশফেকের দিকে তাকিয়ে দেখে। চেয়ারের একপাশে হাতের ওপর অন্য হাত রেখে আগের মতই লাজুকভাবে বসে। একটুও বদলায়নি গত দিনের অভ্যাস।

আপনি নিশ্চয় মাস্টারীর লোভ এখনো ছাড়তে পারেননি।'

রাণু মোশফেকের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে।

'কেমন করে পারব বলুন? ছোটবেলা থেকে একটা সখই ছিল। দু'বছর আগে পি-এইচ. ডি. পেয়েছি। এখন বিশ্ববিদ্যালয়েই আছি। অন্য কিছু করার সময় কোথায়? ডিপার্টমেন্টের হেড হওয়ার পর কাজ বেড়ে গেছে।'

রাণুর চোখ দু'টো হঠাৎ স্তিমিত হয়ে যায়। মুখ ফিরিয়ে নিতেই মোশফেকের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়। একান্ত বিবর্ণ মুখ।

'তাহলে ডক্টরেট ডিগ্রী নিয়েছ?'

'হ্যাঁ। ওটা বিশেষণ মাত্র।'

নৈশব্দে সারা ঘর পূর্ণ হয়ে যায়। মোশফেক রাণুর দিকে চেয়ে দেখে অনেকক্ষণ ধরে। আশ্চর্য সাহস নিয়ে মেয়েটি আজ তাকে বিদ্রুপ করছে। অথচ এই ভঙ্গী একদিন তার মধ্যে ছিল না। তবে কি সেই রাণুর নতুন জন্ম হয়েছে আজ?

মহিউদ্দীন কি ভেবে দাঁড়িয়ে পড়ে।

'তোমাদের সামনের ফ্লাটে আমার একজন আত্মীয় থাকেন। আমি দেখা করে আসি। অনেকদিন থেকে ছাড়াছাড়ি। তোমরা ততক্ষণে গল্প কর।'

মহিউদ্দীন বেরিয়ে গেলে ত্রস্তপদে।

সামনা সামনি বসে দু'জন। অথচ অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলে না। খানিকক্ষণ আগের চপলতা যেন ভুলে গেছে রাণু। আর মোশফেকও সহজ হতে পারে না আগের মত। কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করে। কিন্তু সেটা প্রকাশ হতে দেয় না। মুখ নীচু করে ভাবতে থাকে। রাণু নিজেকে সংযত করে নিয়ে তাকিয়ে দেখে মোশফেককে। অনেক পরিবর্তন হয়েছে তার। চেহারার মধ্যে গাম্ভীর্য এসেছে। পাতলা শরীর অনেকখানি পুষ্ট। তবুও সেদিনের মোশফেককে এক দৃষ্টিতেই চিনে নেওয়া যায়। ঠোঁটের ওপরের স্বচ্ছ হাসি এখনও অমলিন। কিন্তু ও হাসিকে সে বিশ্বাস করে না। কেননা, সে অতি গভীরভাবেই জানে পেছনের অর্থটুকু। সাপের ফণার মধ্যে যেমন বিষাক্ত ইচ্ছা থাকে তেমনি ওই সরল হাসির ভিতরেও আছে একটা কুটিল ইচ্ছা। সেদিন সে এখানেই ভুল করেছিল। তাই মাঝে মাঝে তার ঠোঁটের ওপর এখনও জ্বালা করে ওঠে। কী বিষাক্ত নিঃশ্বাস সেখানে ছড়ান। তা ভুলতে পারে না সে। নিজের সমস্ত জীবনে তার প্রদাহ। মোশফেকের দিকে তাকিয়ে একটা অদ্ভুত জিজ্ঞাসা খেলা করে মনের মধ্যে। তাকে কি এখনও ভালবাসে সে? না ঘৃণা করে! জিজ্ঞাসা করে দেখবে আজ? রাণু সোজা হয়ে বসে।

'এখনও আগের মত চা খান'?'

মোশফেক যেন সম্বিত পায়।

'কিছু জিজ্ঞেস করছেন?'

'আগের মত বেশী চা খাওয়ার অভ্যেস এখনও আছে নাকি?'

মোশফেক হাসল।

'সব পুরনো অভ্যেসগুলোই থাকে না। অনেকগুলো আপনা আপনিই চলে যায়। চা-খাওয়ার ব্যাপারও তাই। আজকাল চা খাইনে। দু'বেলা কফি।'

রাণুর মুখ বিবর্ণ হয়ে যায় অকারণেই। হাসি পায় তার একজনের প্রাচীন ইচ্ছার রূপান্তর দেখে। অথচ এ কথা সে ভুলতেই পারে না আজও ভোলেনি। অনেক স্মৃতির মধ্যে ছোট একটি কথার স্মরণ হলে আজও সে ঠোঁট বেকিয়ে হাসে। চোখ দু'টো ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে অব্যক্ত বেদনার রোমন্থনে।

অসহ্য গরম পড়েছিল সেদিন! বাইরের ঘরে বই পড়ছে রাণু। দু' এক লাইন পড়েই জানালার কাছে গিয়ে বাইরে উঁকি মেরে আবার আগের জায়গায় এসে বসে। এক পৃষ্ঠা পড়তে গিয়ে অসংখ্যবার এমনি করে উঠেছে তারপর আবার বসে বই খুলে ধরেছে চোখের সামনে। কপালে ঘাম জমেছে ঘন ঘন।

মোশফেক এসে দাঁড়িয়েছিল ঘর্মাক্ত কলেবরে। পিঠ আর বুক ভিজে চুপসে গেছে। সিগারেটে শেষ টান দিয়ে সেটা নীচে ফেলে জুতো দিয়ে চেপে ধরে ডাকে সে।

'রাণু।'

রাণু চেয়ারের পাশে বই রেখে এক লাফে দরজা খুলে দেয়।

'এত দেরী যে।'

রিক্সা না পেয়ে হেঁটেই আসতে হল।'

রাণু মোশফেকের দেহের দিকে চেয়ে থাকে। মোশফেক ওর চাহনি দেখে হেসে ফেলে।

'ঘামে ভিজে গেছে। এক কাপ চা দাও, বড় ক্লান্ত।'

চা!

রাণু চমকে উঠে তার সরল হাসির দিকে তাকিয়ে।

'এত গরমে চা খাবে তুমি?'

সে মেয়েরা বুঝবে না।'

হঠাৎ সেদিন কঠিন হয়ে উঠেছিল রাণু। সে নিজেই ভেবে পায়নি এ-কথা। অথচ মোশফেকের কোন কথার বিরুদ্ধাচরণ করেনি, তার কথায় না জানিয়েই বই কিনেছে। সেলফে সেগুলো সাজিয়ে রাখার সময় বইগুলোর ওপর মুখ রেখে তন্ময় হয়ে থেকেছে সেদিন। কিন্তু সেদিন প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করল সে।

'এত গরমে তোমার চা খাওয়া হবে না। একথা ভুলে যেওনা যে, তোমার ভাল মন্দের ওপর আমাকে নির্ভর করতে হয়। নিজের খেয়াল খুশীমত চললে চলবে না।'

মোশফেক বিস্মিত হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে থেকেছে।

'তার মানে!'

'মানে আমি চা দেব না তোমাকে। অন্য কিছু খেতে পার।' রাণু কোন কথা না বলে খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থেকেছে। মোশফেককে ভাল করেই জানত। তাকে ভয়ও করত মনে মনে। নিজের কোন ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ সহ্য করতে পারত না। এক সময় চা করার জন্যে আস্তে আস্তে বাড়ির ভেতরে গিয়েছে সে। খানিকক্ষণ পর চা নিয়ে এসে ঘরের মধ্যে থমকে দাঁড়িয়েছে রাণু। মোশফেক চলে গেছে। চায়ের পেয়ালা টেবিলের ওপর রেখে হাতের ওপর মাথা গুঁজে সন্ধ্যে পর্যন্ত রাণু একই ভাবে বসে থেকেছে। গরম চায়ের ধোঁয়া ক্রমশ মিলিয়ে গেছে। রাণু জানে এই দুপুরে তার ক্লান্ত দেহে কোন রেঁস্তোরায় এক কাপ চা খেতে বাঁধবে না।

সেদিনের কথা ভেবে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল রাণু।

'আপনার নিশ্চয় চা খাওয়াতে অভ্যেস যায়নি?'

রাণু মুখ তুলে তাকাল মোশফেকের প্রশ্নে।

'না। উনি চা খাওয়া অতিরিক্ত পছন্দ করেন।'

মোশফেক হাতের বইখান নাড়াচাড়া করতে থাকে।

'কিন্তু আমার বাড়িতে বিশ্বাস অতিরিক্ত চা খেলে নাকি রোগা হয়ে যাব। তাই নিয়ম খুব কড়া। কফিই ভাল লাগে।'

রাণু দু' আঙুলে মাথা চেপে ধরে। হাতের হীরের আঙটি জ্বলে উঠে এক মুহূর্তে।

মোশফেক উঠে দাঁড়ায়।

'পাখাটা কি খুলে দেব?'

'দিন। মাথাটা সামান্য ধরেছে।'

রাণুর কপালের শির দপদপ করতে থাকে। ফ্যানের হাওয়ায় অনেকখানি যেন স্বস্তি পায়। শান্ত হয়ে সে ঘরের দিকে চাইতে থাকে। নিপুণভাবে ঘর সাজান। এক দিকের দেয়ালে এন্‌লার্জ করা ফটো। মোশফেক আর একজন অপরিচিতা নারীর। আড় চোখে সেদিকে তাকাতেই ওর চোখ দুটো জ্বলে উঠে যেন। এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ফটোর পানে।

'উনি আমার স্ত্রী।'

মোশফেক মৃদু হাসি টেনে বলে।

'কোথায় তিনি, খুব সুন্দরী নিশ্চয়ই।'

রাণুর ঠোঁট দুটো বেঁকে ওঠে। কথাগুলো বলেই মোশফেকের দিকে তার সজাগ দৃষ্টি মেলে ধরে।

'আমার তো তাই মনে হয়। ও একটু বাইরে গেছে, এখুনি আসবে হয়তো।'

মোশফেক হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে।

'চলুন ভেতরে ঘরগুলো দেখবেন।'

রাণু মোশফেককে অনুসরণ করে ভেতরে আসে। ইজিচেয়ারে বসে রাণু। তীক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে দেখতে থাকে সব কিছু। সুদৃশ্য খাটের মাথার ওপরকার দেওয়ালে দ্বৈত ফটো। আর এক পাশে ছোট একটি শিশুর প্রতিকৃতি। আলমারিতে নানা সৌখিন দ্রব্য। আলনায় ভাঁজ করা রঙ-বেরঙের শাড়ি। ছোট টেবিলের ওপর নীল উলের অসমাপ্ত একটা পুলোভার।

ছোট শো কেসের মধ্যে চিত্র-বিচিত্র ছোট ছোট খেলনা দেখতে থাকে রাণু।

'এত খেলনা কেন?'

হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে রাণু।

'ওর খেয়াল। যেখানেই নতুন কোন খেলনা দেখবে সেগুলোই কিনে আনবে। আরও কত যে আছে আলমারির মধ্যে। শুধু কি তাই। নতুন কোন নক্সা বা অন্য কিছু দেখলেই কেনা চাই।'

মোশফেক প্রাণখোলা হাসিতে ঘর ভরিয়ে তোলে।

'আগের কেনা খারাপ জিনিসগুলো সরান না ত?'

রাণু শো কেসের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করে।

'পুরনো জিনিস ওর চোখে নতুনেরই মত। বাদ দেওয়ার মত অভ্যেস নেই। সেগুলো ব্যবসার পক্ষে খাটে।'

রাণুর মুখ লাল হয়ে যায়।

'সে ত ওঁর স্বভাব। কিন্তু আপনার? তাঁর মতকেই নিশ্চয় শ্রদ্ধা করে চলেন?'

মোশফেকের হাসি নিভে যায় এক মুহূর্তে। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, 'আগের জিনিসকে অস্বীকার করিনে। কেননা, সেগুলো এককালে সত্যি ছিল। যদিও আজ তারা সত্যি নয়। আর আজ সত্যি নয় বলেই তাদের মিথ্যে না বললেও আজকের সত্যির মর্যাদা দেওয়া যায় না। সেগুলোই যথার্থ হলে বর্তমান বলে কিছু থাকত না রাণু।'

রাণু নিজের নাম ধরে সম্বোধন করতে দেখে চমকে উঠে মোশফেকের দিকে তাকিয়েই মাথা নীচু করে। মোশফেক মৃদু হেসে জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকে।

দু' জনেই দু' দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে বসে ছিল ঘরের মধ্যে। এমন সময় একজন তরুণী ছোট একটি মেয়ের হাত ধরে সেখানে এসে দু' জনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'কেয়া!'

মোশফেক উঠে পড়ল চেয়ার থেকে।

'এত তাড়াতাড়ি এসে পড়লে যে।'

কেয়া রাণুর দিকে একবার তাকিয়েই মোশফেকের পাশে এসে বসে।

'অসুস্থ শরীরে তোমার বেশীক্ষণ একা থাকতে ভাল লাগবে না বলে চলে এলাম। আর বেশী কিছু কেনার ছিল না, ইনি কে চিনতে পারলাম না তো?'

ফ্যানের দিকে লক্ষ্য পড়তেই তাড়াতাড়ি সে আলনা থেকে শাল নিয়ে এসে মোশফেকের গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ঠাণ্ডা লাগবে যে! ক'দিন আগে অসুখ থেকে উঠে ফ্যান খুলে দিয়েছ!'

রাণু যেন অপ্রস্তুত হয়ে যায়।

'আমার গরম লাগছিল বলে বলেছিলাম। উনি ঠিক খোলেননি।'

এতক্ষণ পর কেয়া রাণুর দিকে চেয়ে ভাল করে দেখল। চিনতে না পেরে মোশফেকের দিকে চেয়ে থাকে জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে।

'ও, তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি। ইনি আমার সঙ্গে পড়তেন। মিসেস মহিউদ্দীন আহম্মদ। আর ইনি রোকেয়া হক।'

দু'জনে হাত তুলে অভিবাদন জানায়।

রোকেয়া কিনে আনা জিনিসগুলো গুছাতে থাকে। রাণু আড় চোখে চেয়ে দেখে তাকে। ফর্সা মুখের দিকে চাইতেই ওর ভুরু কুঁচকে ওঠে। শুধু এই রূপকেই চেয়েছিল সে! আর কিছু নয়? আশ্চর্য হয়ে যায় যেন।

ছোট মেয়েটি ততক্ষণ মোশফেকের কোলের কাছে এসে রাণুকে দেখতে থাকে।

'আমার পুতুল কিনে দেয়নি আব্বা। তোমার জিনিস কিনে এনেছে শুধু।'

রোকেয়া মেয়েকে কোলের কাছে টেনে এনে আদর করে। ফর্সা গাল রক্তিম হয়ে উঠে এক মুহূর্তে।

'তোমাকে কিনে দেব বিকেলে।'

তারপর রাণুর দিকে চেয়ে বলে, 'এত দুষ্টু হয়েছে, কোন কিছু পছন্দ হলে তা না পাওয়া মাত্র কিছুতেই ঘুম হবে না। অবিকল ওঁর মত।'

মোশফেকের দিকে চেয়ে রোকেয়া হাসতে থাকে। দু' জনে চোখাচোখি হতেই অন্যদিকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। 'আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে ভালই হ'ল। আসবেন মাঝে মাঝে বড় একা মনে হয় নিজেকে যখন উনি বাড়ি থাকেন না।'

কাপড় সাজাতে সাজাতে রোকেয়া বলে।

রাণু এক দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল ছোট মেয়েটির দিকে। মা-বাবার আদর নিয়ে জন্ম নিয়েছে যেন।

'কি নাম রেখেছেন ওর?'

'কাজল।'

রাণু আর তাকাতে পারে না। তার সমস্ত স্বপ্নের মৃত্যু হয়েছে। নিজেকে একজন আজ সম্পূর্ণ অন্যভাবে সাজিয়ে চলেছে। অপমৃত্যু ঘটেছে তার অতীত ব্যবহারের। আজ এখানে বেড়াতে এসে এই কি চেয়েছিল সে? নিজের দীন অবস্থা চারদিক থেকে এমনভাবে চিন্তা করেনি। কাজল! কাজল! সে আজ কাজল। আর একদিন তারা কল্পনা করে এঁকেছিল অন্যপূর্ব একটি নাম। শ্যামলী। নিজের বর্ণের সঙ্গে মিলিয়ে এ নাম দু'জনে ঠিক করেছিল। কিন্তু সেদিনের শ্যামলী আজ ফর্সা টুকটুকে রঙ পেয়েছে মায়ের দেহ থেকে। অন্য এক পুরুষের ভালবাসার হাত ধরে সে অপর প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। সেখানের সুর ভিন্নতর। রাণু যেন এক নতুন স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠে।

.

'আজ যাই তাহলে।'

'আবার আসবেন।'

রাণু কোন কথা বলে না। ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসার চেষ্টা করে মাত্র। আলমারিতে সাজান বইয়ের স্তরের দিকে তাকাতে তাকাতে বাইরে মহিউদ্দীনের হাত ধরে এসে দাঁড়ায়।

'ভাবছি, বইগুলো আর রাখব না। ওখানকার কলেজ লাইব্রেরীকে দিয়ে দেব।'

রাণু মহিউদ্দীনের কাঁধে হাত রেখে বলে।

মহিউদ্দীন ধোঁয়ার রিঙ তৈরী করে হাঁটতে হাঁটতে বলে, 'ও-সবের সঙ্গে ত সম্পর্ক অনেক আগেই মিটে গেছে। তোমাকে অনেকদিনই দিতে বলেছিলাম। ও-সব শুকনো ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্যে। যার দাম সাড়ে চারশো মাসিক আয়।'

'তাড়াতাড়ি চল। দম বন্ধ হয়ে আসতে চায় এখানে। কি করে যে মানুষ থাকে?'

দু'জনে জোরে জোরে পা চালায়। ওপরের দোতলার ঘর থেকে তখন একটা মৃদু হাসির শব্দ এসে তরঙ্গায়িত হচ্ছে। ফর্সা একটি মেয়ের মুখ তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। রাণু মহিউদ্দীনের হাত থেকে রুমাল নিয়ে মুখ মুছে। রুমাল থেকে খানিকটা সুগন্ধ তার নাকে তখন বিকেলের বাতাসের মত ছড়িয়ে পড়ে।■

নীল আকাশের জন্য

শাহেদা চম্‌কে উঠ্‌ল। প্রবল একটা বিস্ময় ক্রমাগত সচেতন করে তুলল তাকে। অথচ এই অনুভব সম্পূর্ণ নতুন। আঠারো বছরের জীবনে এই এক অভাবিত চেতনা। অথচ সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে একবারও এমন করে ভাবেনি। মিলিয়ে দেখেনি পরিবেশের সঙ্গে। শাহেদা স্পষ্টতঃই সচেতন হয়ে ওঠে। একরকম দেহের দিকে তাকিয়েই কাপড় ঠিক করে নেয়। কপালে মৃদু মৃদু ঘাম জমে মুহূর্তের নতুন উত্তেজনায়। শাহেদা খানিকক্ষণ কনুয়ের ওপর মাথা রেখে চোখ বুঁজে ভাবল। একান্ত করে নিজের কথা যাকে সে নতুন আবিষ্কার করেছে। চিনেছে অন্য এক উপলব্ধির রঙে। অথচ আশ্চর্য হয়, সে যেন গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করে রেখেছিল। কোন দিকে সতর্ক দৃষ্টি মেলে তাকায়নি, কল্পনা করেনি।

পাশের আয়নায় ছায়া পড়েছিল শাহেদার মুখের। সেদিকে নজর পড়তেই অবাক হয়ে দেখে গালের দু'দিকে অকারণেই এক সময় লাল হয়ে উঠেছে। এপাশে ফিরে নিজেকে সরিয়ে আনতে চেষ্টা করে। নিজের চেহারা যেন উপলব্ধির মতই নতুন করে দেখছে শাহেদা। অথচ কতবার ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে প্রসাধন করেছে। গতানুগতিক মনে হয়েছে প্রাত্যহিক জীবনের কাজগুলো।

শাহেদা বিছানা ছেড়ে উঠে আসে। দরজায় আস্তে খিল দিয়ে নীল রঙের কাগজে লেখা চিঠি আবার পড়তে থাকে। এর আগেও কত চিঠি পেয়েছে। সবগুলো ভাল করে পড়েওনি। হয়ত মনই চায়নি। এক এক করে ভাঁজ করে জানালা দিয়ে ফেলে দিয়েছে বাইরে। কিন্তু এ চিঠিখানা অন্য সবের মত ফেলতে পারেনি। সম্ভবতঃ খানিকটা করুণা করেই।

চিঠি দেওয়ার সময় রাশেদ বলেছিল, 'আমি জানি এ-সব পড়ার মত ধৈর্যও তোমার নেই। তবুও কেন দিলাম জানো?'

রাশেদ একদৃষ্টিতে চেয়েছিল শাহেদার দিকে। দৃষ্টিতে ছিল আত্মমুগ্ধের প্রলেপ।

'আমার কেন যেন বিশ্বাস হয়েছে তুমি নিজেকে এখনও চিনতে পারোনি। নিজের মনের কথাও জানতে পারোনি। তাই চিঠি লেখাকে উপহাস করতে বাধে না। সবচেয়ে আশ্চর্য কী জানো? মনের বিকাশ না হলে নিজেকে প্রকাশ করা যায় না। আমার ভয় হয়, তুমি এদিক দিয়ে এখনও বন্ধ্যা।'

হ্যাঁ। হ্যাঁ। আমি এখনও বন্ধ্যা। আমাকে আঠারো বছর লুকিয়ে রাখা হয়েছিল অন্ধকার গুহায়। সেখানে কোন আলো প্রবেশ করত না। তাই আমি আজ অন্ধ হয়ে গিয়েছি।

শাহেদার যেন চীৎকার করে বলতে ইচ্ছা হয়। পরক্ষণে উত্তেজনায় নিজেই সঙ্কোচ অনুভব করে।

রাশেদের কথাগুলো আজ সত্যি বলে মনে হয়। এ যেন কোন মহাপুরুষের বাণী। মিথ্যের স্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে সত্যের অভিমুখী করে তোলা। পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে মিশে আছে অভিজ্ঞান চেতনা।

রাশেদের চিঠি যেন নতুন পথের সন্ধান দেয় শাহেদাকে।

'কেউ যদি বহুদিন অন্ধকারে বাস করে আলোর রাজ্যে আসে তাহলে সে আলো না দেখে অন্ধকারই দেখে। বধিরের যে গান শোনার ক্ষমতা নেই। তোমাকে দেখে মাঝে মাঝে আমার সে কথাই মনে হয়। তুমি নিজেকে এখনো চিনতে পারোনি। ছোটবেলা থেকে যে পরিবেশে তুমি বড় হয়েছ সেই পরিবেশই তোমার প্রকৃত নয়। তুমি যে একজন নারী! কিন্তু পুরুষের পোশাকের তলায় এই বোধ অনেকদিন আগে হারিয়ে ফেলেছ। তাই হয়ত এখন তাকে আর খুঁজে পাও না। কিন্তু তোমার এখনকার পরিচয়ই আসল নয়। প্রকৃত যে–তাকে খুঁজে বের করতে হবে। তার এমন করে অপমৃত্যু ঘটান যায় না শাহেদা।'

না, না, না।

শাহেদা হাতের মুঠোর মধ্যে চিঠি ধরে যেন চীৎকার করে ওঠে।

আমার প্রকৃত সত্তার মৃত্যু হতে পারে না। শাহেদা থর থর করে কাঁপতে থাকে। বিছানায় শুয়ে ফুলে' ফুলে' কাঁদে সে। তখনো হাতে নীল চিঠিখানা ধরা।

এক বেলার মধ্যে সম্পূর্ণ বদলে গেল শাহেদা। পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে উঠল চোখের সামনে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখখানা একবার ভাল করে দেখল। তারপর ঘন চুলের গোছা ছাড়িয়ে দিল পিঠের ওপর। স্পষ্ট মনে করতে পারে এর আগে সে কোনদিন এভাবে বিস্রস্ত চুলকে প্রশ্রয় দেয়নি। বিনুনি করেছে দুটো। প্রথম প্রথম বব্ করত। তার কাছে বিশ্রী লাগত চুল বাঁধা। যেন খানিকটা মূল্যবান সময়ের অপচয়।

'একটা কথা বলতে চাই তোমাকে। যদি মনে কিছু না করো।' পার্টিতে একদিন রাশেদ তার দিকে এগিয়ে এসে বলেছিল।

'বেশ ত বলুন না!?'

নিঃসঙ্কোচের সঙ্গে বলে শাহেদা।

'এমন সুন্দর চেহারার সঙ্গে বেণী না হলে যেন মানায় না।'

'তার মানে'? শাহেদা বিস্মিত হয় রাশেদের কথায়, 'হোয়াট্‌ ডু ইউ মিন বাই'? আপনাদের মাথায় ছোট চুল থাকার জন্যে চেহারার যদি কোন ক্ষতি না হয়, তাহলে আমারই বা হবে কেন'?'

শাহেদার কথায় রাশেদ আর কোন কথা বলেনি। অথচ অনেক যুক্তিই মনে মনে জমা হয়েছিল। কিন্তু কেন যেন আর প্রবৃত্তি হয় না। সমস্ত ইচ্ছা মরে যায় প্রবল এক প্রতিঘাতে।

'এ-সব বাজে কথার চেয়ে বরং চলুন এক গেম টেনিস খেলে আসি।'

'এক্সকিউস মী।'

রাশেদ ধীরে ধীরে চলে যায় বাইরে।

শাহেদার সে-কথা আজ নতুন করে স্মরণ হয়। মনে পড়ে তার চেতনায় কেমন করে আঘাত করেছিল রাশেদ। অথচ সেদিন কোন তরঙ্গ ওঠেনি ছোট পুকুরে। শাহেদা বাগানের ছোট বেঞ্চিতে বসে একটা গোলাপ ছিঁড়ে সুগন্ধ নেয়। অযত্নে অনেক গাছ নষ্ট হয়ে গেছে। দু' একটা বাঁকা ডাল বেঁধে দেয় সে। তারপর এক সময় নিজের ঘরের সামনের রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়ায়।

'তোমার শরীর কী খারাপ শাহেদা'?'

শাহেদা পেছনে ফিরে আম্মাকে দেখে। একটা প্রশ্ন করতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। না। আম্মা আঘাত পাবেন এ প্রশ্নে।

'না। এমনি ভাল লাগছে না।'

'বাইরে বেরুবে নাকি রাশেদের সঙ্গে।'

না, না, না।

শাহেদার ইচ্ছা হল চীৎকার করে আম্মাকে জানিয়ে দিতে তার মনের উত্তর। কিন্তু না। নিজেকে ক্রমে ক্রমে সরিয়ে আনতে চায় শাহেদা। তবুও যেন বলতে ইচ্ছা হয়, ওদের সঙ্গে সমানভাবে মিশতে দিয়েই ত আজ আমাকে নিজের সত্তা বুঝতে দাওনি তাও তোমাদের প্রয়োজনে। তোমাদের নিষ্ঠুর প্রয়োজনে আমার সমস্ত কোমলতা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছ।

শাহেদা ঘরে এসে বসে অনেকক্ষণ। মাথা যেন ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে। উঠে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বড় ট্রাঙ্কের কাছে দাঁড়াল। তারপর আস্তে আস্তে ডালা খুলে ভেতরে তাকায়। অনেকগুলো ফুল প্যান্ট আর শার্ট। শাহেদা সেগুলো টেনে বের করে টেবিলের উপর রাখে। সেদিকে চাইতেই মুখে একটা বিজাতীয় ঘৃণার ভাব ফুটে ওঠে।

কী বিশ্রী! কী বিশ্রী! এতদিন মন্ত্রমুগ্ধের মত তার পুরনো ছোট পোশাকগুলো জমিয়ে রেখেছিল ট্রাঙ্কের ভেতর'?

শাহেদা পোশাকগুলো দু'হাতে তুলে নিয়ে জানালা দিয়ে ফেলে দেয় নীচে। কোথায় পড়ল সেটুকু দেখার মত তখন আর জ্ঞান নেই। অভিশপ্ত স্মৃতির মাঝে নিজেকে আর আচ্ছন্ন করে রাখতে চায় না।

'তোমরা আমার আসল রূপকে শোষণ করে চিনতে দাওনি আমাকে। আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে, আমিও নারী, পুরুষ নই।'

শাহেদার দু'চোখ ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে—সন্ধ্যের আবছা অন্ধকারে। অন্ধকারের মাঝে আজ যেন পরম তৃপ্তি অনুভব করে। তাই নীরব হয়ে থাকে অনেকক্ষণ তৃপ্তির আনন্দে।

শাহেদা নিজেকে খুঁজে পেয়েছে অজ্ঞানের তিমির থেকে। তাই সম্পূর্ণ নতুন করেই অনুভব করতে চায় নিজেকে। সকালে বিছানা থেকে ওঠার পর ঘরের দিকে তাকাল। কেমন যেন একটা কঠিন ভাব। পৌরুষের আবরণে ঘেরা। এ ঘরের পরিবেশ বদলে দেবে সে। অনেকক্ষণ ধরে ঘর সাজাল সে। বাগান থেকে গোলাপফুল এনে তোড়া বেঁধে ফুলদানিতে রাখল। অনেকদিন থেকে বাড়িতে কতকগুলো বাঁধান ছবি পড়েছিল। সেগুলো এনে টাঙাল দেওয়ালে। সবকিছু শেষ করে চুল বাঁধতে বসল। আশ্চর্য হল যেন। ভাল করে খোঁপা বাঁধার কৌশলও ভুলে গেছে। গোছা গোছা ঘন চুল যেন কোনক্রমে জড়িয়ে রাখা ফিতে আর ক্লিপ দিয়ে। এতেই সন্তুষ্ট হ'ল। তারপর ছোট একটা কাগজে প্রয়োজনীয় জিনিসের তালিকা করল। বিকেলে নিজেই কিনে আনবে নিউমার্কেট থেকে।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল সকাল থেকেই। শাহেদা ঝাপসা আকাশের দিকে তাকিয়ে কেমন আনমনা হয়ে যায়। মেঘের বিষাদক্লিষ্ট ছায়ার পাশে অনেক প্রচ্ছায়া প্রতিভাসিত হয়। শাহেদা এদের কাউকে কোনদিন সঙ্গী ছাড়া বিচার করেনি। অথচ তাদের প্রতিটি কথায় যেন আবেদন ছিল। ছিল নিবেদনের প্রার্থনা। এ-সব কথা মনে পড়তেই লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে যায়। আজ হয়ত এদের কাউকেই সহজভাবে গ্রহণের ক্ষমতা নেই তার। তাদের সঙ্গে আগের মত মিশতে পারবে না উত্তরকালের কোন দিনে। এই পরিবর্তন প্রতিটি পদক্ষেপে অনুভব করতে থাকে।

শাহেদা বারান্দা দিয়ে এগোতে থাকে। এক কোণে মেজ আপার বড় মেয়ে মুনমুন পুতুল খেলা করছে। শাহেদা সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। রঙ বেরঙের পুতুল আর শাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে। পাশাপাশি দু'টো পুতুল সাজান। একটি মেয়ে, অন্যটি পুরুষ। তাৎপর্য মনে পড়তেই শাহেদা আরক্তিম হয়ে ওঠে।

'মুনমুন!'

শাহেদার ডাকে মুনমুন পেছনে তাকিয়েই অবাক হয়ে যায়। তার পুতুল খেলা শাহেদা খালা দেখবে এ-যেন তার কাছে এক বিস্ময়।

'তুমি ছোট খালা!'

'হ্যাঁ রে। কেন, আমাকে কী আসতে নেই নাকি?'

শাহেদা মুনমুনের পাশে বসে পিঠে হাত বুলিয়ে বলে।

'না, মানে।'

মুনমুন ভাল করে কথাটা বলতে পারে না। শাহেদার দিকে চেয়েই মুখ ফিরিয়ে নেয়। শাহেদা মুনমুনের অসম্পূর্ণ কথার তাৎপর্য বোঝে। তাই অসন্তুষ্ট হয় না। চারদিকে একবার তাকিয়ে মুনমুনের কানের কাছে মুখ এনে সঙ্কোচের সঙ্গে ভীত কণ্ঠে বলে, 'আমিও ত তোর মত মেয়ে মুনমুন। আমাকেও যে পুতুল খেলা খেলতে হবে।'

কথাটা বলেই যেন কেমন একটা লজ্জা অনুভব করে শাহেদা। ওর সারামুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে, মনে মনে ধমক দেয় নিজেকে ছেলেমানুষীর জন্যে। আর পরিতৃপ্তি অনুভব করে নিজে নিজেই।

মুনমুন শাহেদার কথার অর্থ বুঝতে না পারলেও তাকে সঙ্গী পেয়ে খুশী হয়। নিজের সমস্ত পুতুল দেখায় একে একে।

'এর নাম বাবলু এর ডাবলু, আর এটা আমার মেয়ে।'

শাহেদা পুতুলগুলো দেখতে থাকে। একটা পুতুল নিয়ে পরম যত্নে জামা কাপড় পরিয়ে দেয়। তার সূক্ষ্ম হাতের যত্নে কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে ছোট বাবলুকে। শাহেদাও মুগ্ধ হয় সেদিকে চেয়ে।

বৃষ্টি তখনও পড়ছে টিপ্‌টিপ্‌ করে। নির্জন সময়ে শাহেদা অতি সন্নিকট অনুভব করে ছোট মুনমুনের।

নিউমার্কেটে একাই গিয়েছিল শাহেদা। রিকশা থেকে নামতেই কেমন যেন নতুন ঠেকে। মনে হয় বহুদিন এখানে যেন আসা হয়নি। সে জন্যে নতুনত্বের স্পর্শ ছড়িয়ে রয়েছে সব কিছুতে। চলতে গিয়েও একটা সঙ্কোচ অনুভব করে শাহেদা। অথচ এর আগে এমন হয়নি। এই সময়টুকুতেই একবার ঘুরে এসেছে নিউমার্কেট।

শাহেদা আনমনে ষ্টেশনারী দোকানের দিকে এগোতে থাকে। ছোট লিস্ট বের করে জিনিসগুলো কেনে একে একে।

দোকান থেকে বাইরে বেরুতেই সায়লার সঙ্গে দেখা। সায়লা তাকে দেখে উল্লসিত হয়ে একপাশে টেনে আনে।

'কতদিন পর দেখা মনে করতে পার শাহেদা?' একসঙ্গে দু'জনে কলেজে পড়েছিল তারা। তারপর তিন বছর ছাড়াছাড়ি।

'এখানে গল্প জমবে না। চল এটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসি।'

শাহেদা এতক্ষণ ধরে যেন তাই চাইছিল। নিভৃত বিশ্রাম।

রেস্টুরেন্টের কেবিনে পর্দা টেনে বসে দু'জনে। কলেজ জীবনের গল্প করে।

'তুমি কী এখানে আগের মতই আছ নাকি? না পুরুষালী ব্যাপারগুলো সব ছেড়ে দিয়েছ?'

শাহেদা প্রথমে কোন কথা বলে না। সায়লার কথায় আঘাত অনুভব করে। অথচ এর চেয়ে সত্যি এতদিন কিছু ছিল না।

শাহেদাকে চুপ করতে দেখে সায়লা নিজের ভুল বুঝতে পারে। তার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরে আবেগ ভরে।

'কিছু ভেবো না শাহেদা। তোমার কোন খবর জানিনে বলেই এ-কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। আঘাত দিয়ে থাকলে মনে কিছু করো না।'

শাহেদার ইচ্ছা হ'ল সায়লাকে নিজের রূপান্তরের কথা খুলে বলে। অথচ প্রতি বারেই যেন সঙ্কোচ এসে তাকে থামিয়ে দিল। সায়লার দিকে চেয়ে কেবল মুখ মুচকে হাসল মাত্র।

'তোমার খবর কি?'

'ভালই।'

সায়লা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে নিজের কথা বলতে থাকে। হঠাৎ এক সময় টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে শাহেদার মুখের কাছে মুখ এনে প্রশ্ন করে, 'কখনো প্রেমে পড়েছ শাহেদা?'

শাহেদার মুখে এক ঝলক রক্ত খেলে যায়। এখন সে প্রেমে-পড়ার অনুভূতি উপভোগ করতে পারে। অথচ এ নিয়ে কতদিন হাসাহাসি করেছে। বন্ধুদের আঘাত করেছে তীব্রভাবে। তার বলিষ্ঠ যুক্তির কাছে কারোর মত টেকেনি। সে-ই শাহেদা আজ প্রেমের কথায় লজ্জা পেল।

'পড়নি তাহলে?'

সায়লা হাসতে থাকে।

'এ এক অদ্ভুত অনুভূতি। না পড়লে বোঝা যায় না।'

সায়লা নিজের কথা বলতে থাকে। সারামুখে উত্তেজনার ভাব।

শাহেদা নিউমার্কেট থেকে যখন বেরিয়ে এসে রিকশায় উঠ্‌ল তখন অনেক রাত হয়েছে। নীল আকাশ আলোতে উজ্জ্বল লাগছে। সেদিকে একবার তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। ঘরে এসে শাহেদা খাটের কাছে সরে এসে ব্লাউজের মধ্যে থেকে নীল কাগজে লেখা রাশেদের চিঠিখানা খুলে পড়তে থাকে। প্রতিবারই যেন

নতুন করে আবিষ্কার করে নিজেকে। যে অতীতকে সে হারিয়ে ফেলেছিল তাকে আবার আবিষ্কার করেছে বর্তমানের বৃহৎ পরিধির মধ্যে।

'আমার মনে হয় তুমি নিজেকে এখনো চিনতে পারনি শাহেদা। বিরাট একটা ভুলের স্তর দিয়ে ঘিরে রেখেছো। এ ভুল একদিন ভাঙবে। সেদিন নিজের প্রতি চেয়ে চমকে উঠবে।'

শাহেদার যেন চীৎকার করে নিজের অভিজ্ঞানের কথা বলতে ইচ্ছা করে। নিজেকে সে এবার চিনেছে। চিনতে পেরেছে এই নীল রাতের মাঝে তার স্থান কোথায়? সে এখন নারী। সে ভালবাসতে জানে।

শাহেদা চিঠিখানা জোর করে কপালের সঙ্গে চেপে ধরে। নীল রঙের কাগজের অক্ষরগুলো কী মর্মান্তিকভাবে সত্য; অথচ আঠারো বছর কীভাবে সে লুকিয়েছিল অন্ধকার গিরি গুহায়!

মিসেস চৌধুরী মেনে নিতে পারেননি সন্তানদের এককেন্দ্রিক জন্ম। পর পর পাঁচ মেয়ের জন্মের পর বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। খানিকটা নিজের ওপর এবং বাকিটা নিয়তির ওপর। মিস্টার চৌধুরীও ভুরু কুঁচকেছিলেন পঞ্চম মেয়ে জন্মানোর পর। পরের বার নতুন সন্তানের আগমনের আভাস পেয়ে একরকম বিরক্তই হয়ে উঠেছিলেন মিসেস চৌধুরী।

'এবারও হয়ত মেয়েই হবে আমাদের।'

সোয়েটার বুনতে বুনতে স্বামীর দিকে চেয়ে বলেছিলেন মিসেস চৌধুরী।

'ব্যতিক্রম হলেই সুখী হব।'

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে গম্ভীর হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন মিস্টার চৌধুরী।

'এ থেকে পরিত্রাণের কী কোন উপায় নেই?'

'সম্ভবতঃ না।'

এরপর আর আলাপ অগ্রসর হয়নি। দু' জনেই চুপ করে আপন আপন কাজে মনোনিবেশ করেছেন। গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে ঘরের পরিবেশ।

মিসেস চৌধুরীর ষষ্ঠ সন্তানও জন্মাল একটি মেয়ে। কাপড়ে জড়ান নবজাতকের দিকে চেয়ে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন কেবল। নিয়তির হাতে তিনি ক্রীড়নক মাত্র। কী-ই বা করার আছে তাঁর? মিস্টার চৌধুরীও আশ্চর্যভাবে চুপ করে গেলেন।

মিসেস চৌধুরী তখন আঁতুড় ঘর থেকে বেরিয়েছেন। ইজিচেয়ারে বসে নবজাতকের নরম চুলে হাত বুলোচ্ছেন আস্তে আস্তে।

খবরের কাগজ পড়তে পড়তে হঠাৎ চোখ তুলে তাকান মিস্টার চৌধুরী।

'এক কাজ করলে হয় আমাদের।'

'কী?'

'ছেলে হওয়ার সৌভাগ্য আমাদের আর নেই। কাজেই তার জন্য অনুশোচনা করে লাভ হবে না। বরং এক কাজ করি। শেষে মেয়েকে ছেলের মত মানুষ করে তুলি! এ ছাড়া ছেলের অভাব পূরণ করতে পারব না কোন দিন।'

'আমিও সে-কথাই ভাবছিলাম।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে স্বগতোক্তি করলেন মিসেস চৌধুরী।

সেদিন থেকে শাহেদার জন্যে শার্ট আর প্যান্ট এল। মিসেস চৌধুরী তাকে পুরুষের পোশাক পরিয়ে দিয়ে একদৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখেন। মেয়ে বলে ধরার কোন উপায়ই নেই। একটু বড় হলে শাহেদার চুল ছেলেদের মত ছেঁটে দিলেন মিসেস চৌধুরী। তাকে মানুষ করতে লাগলেন ছেলের মত। নিজেরা ছাড়া আর কেউ জান্‌ল না পুরুষের পোশাকের অন্তরালে একটি মেয়ে ক্রমশ বড় হয়ে উঠ্‌ছে। আর শাহেদাও এ-কথা কোনদিন ভেবে দেখেনি।

পিঠে ছেলেদের ছোট ব্যাগ ঝুলিয়ে আর পায়ে সু পরে স্কুলে যেত শাহেদা। ছেলেদের সঙ্গে বসত সে। আর কেউ অন্যায় করলে গায়ে হাত তুলতেও কোন সঙ্কোচ অনুভব করত না। এমনি করে নিজেকে শাহেদা দূরবর্তী এক পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে বড় হতে থাকে। মা-বাবা তাকে দূর থেকে দেখে পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলতেন।

শাহেদার এই রূপান্তর ছ' বোনও গভীরভাবেই মেনে নিয়েছিল। মা-বাবার মত নিজেরাও একটি ভাই-এর জন্যে ব্যাকুলতা অনুভব করেছিল। তাই শাহেদাকে তারা আদর করে কাছে টেনে নিল। আদর করে সাজিয়ে দিত প্রতি বিকেলে।

'যাও খোকা ভাই।'

শাহেদা ছোট ছোট লাভ দিয়ে বাইরে যেত খেলতে।

এমনি করে অতিক্রান্ত হয় অনেকগুলো বছর। ছোট শাহেদা বড় হয়। নিজের প্রকৃত অস্তিত্ব যেন সে ক্রমেই ভুলে যায়। মেয়েরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে। এ-সব যেন শাহেদা শুনতেও চেষ্টা করে না। কানে এলেও গুরুত্ব দেয় না কোন। যেন অস্বাভাবিক বলেই দৃষ্টির মধ্যে পড়ে না।

কলেজে সায়লাই একদিন শাহেদাকে তার অদ্ভুত আচরণের কথা বলেছিল।

'এমন করে শাড়ি পর কেন শাহেদা? কোন মতেই মানায় না তোমাকে।'

'তার মানে?'

শাহেদা মুখ তুলে প্রশ্ন করে।

'তোমার শাড়ি পরার মধ্যে কেমন একটা অযত্নের ভাব রয়েছে। আর পুরুষের মত লম্বা লম্বা পা ফেলা ভয়ানক বিশ্রী লাগে। এগুলো বদলাতে পার না?'

'না।'

কঠিন হয়েই উত্তর দিয়েছিল শাহেদা।

'এ-সব আমার খারাপ বা বিপরীত বলে মনে হয় না। আর সে-জন্যেই হয়ত তোমাদের মন্তব্য অর্থহীন।'

'অর্থহীন।'

সায়লা বিস্মিত হয়।

'যাকে তুমি অর্থহীন বলছ তা হয়ত আসলেই অর্থহীন নয়। মেয়েদের আচরণের সঙ্গে মেলে না বলেই অসামঞ্জস্য বলে মনে হয়।'

'তুমি কী বলতে চাও যে মেয়ে আর পুরুষের আচরণ আলাদা?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমি তা বুঝিনে। উপযোগিতার বিচারে সব কিছু দেখতে অভ্যস্ত বলেই হয়ত এমন মনে হয় আমার কাছে। যেমন সাইকেল চড়ার প্রসঙ্গ। তোমরা একে খারাপ বললেও আমি স্বীকার করিনে। কেননা, অনভ্যস্তের কাছে বিসদৃশ লাগলেও যে অব্যস্ত তার কাছে এ ব্যাপার অত্যন্ত সহজ।'

শাহেদা তার পরিবেশকে অস্বীকার করতে পারেনি। সুদীর্ঘকালের ইতিবৃত্ত এই পরিবেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত। নিজেকে মুক্ত করার কথা তাই একবারও মনে পড়েনি।

অথচ আজ?

মনে পড়ল শাহেদার। কী প্রচণ্ড একটা মরীচিকার পেছনেই সে ঘুরে বেড়িয়েছে দিনরাত! সে মিথ্যা ছিল বলেই সত্যের প্রতিঘাতে এমং ভাবে ধূলিস্মাৎ হয়ে গেছে। বিস্মৃতির প্রলেপ দিয়ে যেন অনুভূতির সত্য রূপকে লুকিয়ে রাখা যায় না। শাহেদা এই সুদীর্ঘ সময়ের বৃত্তে ভাল করেই উপলব্ধি করেছে।

শাহেদা খোলা জানালার পাশে এসে দাঁড়ায়। দূরের নীল আকাশ প্রশান্ত। অল্প বাতাসে কপালের ওপরকার চুলগুলো উড়ছে মৃদু। বিকেলের বাতাস নির্জন-উপভোগে প্রশান্তি অনুভব করে শাহেদা।

আম্মা এসে দাঁড়ান ঘরের মধ্যে।

'শাহেদা।'

শাহেদা পাশ ফিরে দাঁড়াল।

'তুমি যেন কেমন বদলে গেছ একদিনের মধ্যে। তোমার দিকে তাকালে যেন চেনা যায় না! কী ব্যাপার বল ত?'

শাহেদা আঙ্গুল দিয়ে কাপড় জড়ায় অনর্থক। আম্মার দিকে একবার তাকিয়েই পরক্ষণে মুখ নামিয়ে নেয়। আজ তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে ইচ্ছা করে।

'তোমরাই ত, কেবল তোমরাই, নিজের স্বার্থের জন্যে আমার সত্যিকার রূপের কাছ থেকে আড়াল করে রেখেছিলে আমাকে।'

কিন্তু শাহেদা কিছু বলল না।

'আমার মনে হয় তুমি কোন ম্যানিয়ায় আক্রান্ত হয়েছ। যদি সত্যিই তাই হয় তাহলে ভাবনার কথা। ডাক্তার দেখাতে হবে। ভেবে দেখো একবার।'

আম্মা আর দাঁড়ালেন না সেখানে। জোরে জোরে পা ফেলেই বাইরে চলে গেলেন। শাহেদা ভাবল বাইরে যাবে সে। এমন করে বন্দী হয়ে থাকলে সারা মন বিতৃষ্ণায় ভরে উঠ্‌বে। আলমারি থেকে নতুন কেনা শাড়ি বের করতে গিয়ে পাশের একটা গোলাকার বস্তুর ওপর তার দৃষ্টি পড়ে। একটা রঙচঙে রাবারের বল। বড় দুলাভাই দিয়েছিলেন। এতদিন আদর করে রেখে দিয়েছিল আলমারিতে। মনে হল, এই ছোট বলের মত জিনিসই তাকে ভুলিয়ে রেখেছিল গোপন অন্ধকারে। হাত বাড়িয়ে বলটা নিয়ে গড়িয়ে দেয় মেঝের ওপর। এ ঘরে খেলতে এসে এক সময় ছোটদের কারুর হয়ত নজর পড়বে। তখন নিয়ে যাবে এটা।

অনেকক্ষণ ধরে প্রসাধন করল শাহেদা। সন্ধার অন্ধকার ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে। একটু পর জমাট বাঁধবে। শাহেদা বাগানের দিকে এগিয়ে গেল। গতকাল একটা আধফোটা গোলাপ দেখে এসেছিল। আজ হয়ত ফুটে গেছে সম্পূর্ণ। লাল টুক্‌টুকে ফুলটা।

নীচু হয়ে ফুল তুলতেই শাহেদা বাধা পেয়ে পেছনে তাকিয়ে প্রথমে কোন কথা বলতে পারল না। রাশেদ তার একটা হাত ধরে বাধা দিতে চেষ্টা করছে। শাহেদা পুরুষের স্পর্শে এই প্রথমবার ঘেমে ওঠে। ছোট দেহ কাঁপতে থাকে যেন।

বাধা দিলাম বলে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি তোমার কাছে। কিন্তু এমন অবস্থায় বাধা না দিয়ে পারিনি। তুমি যা করতে যাচ্ছিলে তা নিজের হাতে যেন মানায় না।'

রাশেদ এগিয়ে গিয়ে গোলাপ ফুল ছিঁড়ে এনে শাহেদার খোঁপায় গুঁজে দেয়।

'এবার চমৎকার মানিয়েছে।'

শাহেদা কোন কথা বলতে পারে না। ও বুঝতে পারে কথা বলার শক্তি আর নেই। ও কাঁপছে।

'শাহেদা।'

শাহেদার হাত নিজের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে বলে রাশেদ।

'রাশেদ।'

পরক্ষণে শাহেদা এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসে। তখনো ভাল করে সন্ধ্যা হয়নি। সূর্যের শেষ রশ্মি প্রতিফলিত হচ্ছে প্রকৃতির দেহে। সেই আলো এসে পড়েছে শাহেদার মুখের ওপর। আর বিমুগ্ধ শাহেদা রাশেদের বুকের ওপর মাথা রেখে ওকে দু' হাত দিয়ে বেষ্টন করে কেঁপে কেঁপে ওঠে শেষ আলোর মত।

'আমাকে চিনতে পেরেছি রাশেদ। নিজেকে আর লুকিয়ে রাখব না ভুলের মোহনায়। স্রোতকে আটকে রাখা যায় না, ক' দিনের জন্য সাময়িকভাবে বাধা দেওয়া যায় মাত্র।'

রাশেদ পরম যত্নে শাহেদার মসৃণ চুলের ওপর হাত বুলিয়ে দিয়ে তার ওপর নিজের মুখ স্থাপন করে।

সন্ধার অন্ধকার তখন ব্যাপ্ত হয়েছে চারদিকে। একটু পরেই জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়বে সেখানে। তখনও দেখা যাবে দুটি ছায়া স্থিরভাবে বড় গোলাপ গাছের কাছে দাঁড়িয়ে।■

পুরাতন পৃথিবী

সৈয়দ হোসেন সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন ওঁদের দু'জনকে। সংখ্যার মত সিঁড়িগুলো নীচে নেমে গেছে একটু ঢালু হয়েই। ওপরে বেশ জমাট বাঁধা অন্ধকার। নীচে নামতে গিয়ে শাকিলা থমকে দাঁড়াল। গাফফার অনেকদূর পর্যন্ত নেমে গেছে। শাকিলা পেছনে তাকিয়ে দেখল সৈয়দ হোসেন তখনও দরজার কাছে আগের মত দাঁড়িয়ে। শাকিলার ঠোঁট দু'টো কেঁপে উঠ্‌ল মৃদুভাবে। মুহূর্তের জন্য তার নির্বিকার মুখের ওপর একটা কৃষ্ণছায়া খেলে গেল। সৈয়দ হোসেন শাকিলার মনোভাব বুঝলেন। একটু এগিয়ে এলেন তিনি, 'কিছু বলবেন আপনি?'

শাকিলা হয়ত কোন কথা বলতে চেয়েছিল, কিন্তু তার আগেই নীচে থমকে দাঁড়াল গাফফার। একেবারে শেষ সিঁড়িতে এসে পেছনে তাকাল সে। আশ্চর্য হ'ল যেন। শাকিলা দু'একটা সিঁড়ি ভেঙে সেখানেই স্থানুর মত দাঁড়িয়ে। কোন অঘটন হয়নি ত আবার! গাফফার দ্রুতভাবে আবার ওপরে উঠে গেল। শাকিলার পাশে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগল তাকে, যেমন করে সূত্রধর তার প্রস্তুত জিনিস বাজারে দেওয়ার আগে কোন ত্রুটি লক্ষ্য করে।

'এখানে দাঁড়িয়ে কেন?'

'হঠাৎ পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরে উঠ্‌ল।'

আর দাঁড়াল না শাকিলা। নীচু হয়ে শাড়ির নিম্নাঞ্চল সরিয়ে নীচে নামতে লাগল।

সুরকি বিছান নির্জন রাস্তা। অনেকদূর পর্যন্ত হেঁটে গেলে অন্তর্দ্বারের প্রান্তদেশ মিলবে। রাস্তার দু' পাশে সারি সারি ফুলের গাছ। দেশী-বিদেশী অজস্র ফুলের সম্ভার। মালিক অকৃপণ নন। দু'দিকে তাকালেই সে-কথার সঙ্গে আরও একটা কথা মনে পড়ে। যিনি দু'পাশে এত যত্ন করে ফুলের গাছ লাগান তিনি নিজেও মনের দিক থেকে একজন উঁচুদরের শিল্পী।

শ্লথভাবে হাঁটতে থাকে শাকিলা। গাফফার এর মধ্যে একটা চুরুট ধরায়। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে শাকিলা যেন অনেকখানি দূরে সরে গিয়েছে। গাফফার একবার ওর দিকে তাকাল। কোনদিকে খেয়াল নেই তার। এই সুরকির বিস্তৃত রাস্তাটুকু পার হতে পারলেই যেন সে নীড়ের মত একটি আশ্রয় পায়। শাকিলার হাঁটার মধ্যেও কেমন একটা বিস্রস্ত ভাব। দূরের কামিনী গাছটাকে লক্ষ্য করে

জোরে জোরে হাঁটতে থাকে সে। অজস্র ছোট ছোট সাদা ফুলে পূর্ণ বিকশিতা একটি নারীর মত কামিনীর গাছ দাঁড়িয়ে। তীব্র সুগন্ধ সারা সুরকির রাস্তায় ছড়ান। ছোট পিণ্ডের মত অন্ধকার গাছের তলায় বিস্তৃত। আশ্চর্য লাগে শাকিলার। তার ইচ্ছা করে ঐ অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত করতে। কী হবে উজ্জ্বল আলো-বিকীরণের মধ্যে খোলস দেহটাকে সাজিয়ে ধরতে?

'অমন করে হাঁটছ কেন?' গাফফার শাকিলার পাশে এসে দাঁড়াল, 'মনে হচ্ছে, কতদিন যেন হাঁটনি তুমি।'

শাকিলা মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল। গাফফারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ, 'বড় ঘুম পাচ্ছে।'

গাফফার ওর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নেয় পরম আবেগভরে। শাকিলা যেন কেঁপে ওঠে। আজকের হাতধরার মধ্যে যেন কতদিনের ব্যর্থলগ্ন অতিক্রমের অবিশ্রান্ত প্রয়াস লুকিয়ে রয়েছে। কিন্তু এতদিনের পুঞ্জীভূত শূন্যতা মুহূর্তের ইতিহাস দিয়ে মোছান যায় না। তাহলে অনেক বড় বড় সাম্রাজ্য বালির প্রসাদের মত সমুদ্রের লোনা স্রোতে হারিয়ে যেত না। তাই শাকিলা চৌধুরী হঠাৎ ক্লান্তি অনুভব করে। হাজার বছরের মমির নির্জীবতা তার দেহে আশ্রয় নিয়ে মন্থর করে দেয়। অস্বস্তিতে শাকিলা হাত ছাড়িয়ে নেয়। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমা হয়েছে মুক্তার মত কপালে। আঁচল দিয়ে ঘাম মুছে ফেলে সে।

'খারাপ লাগছে?' গাফফার প্রশ্ন করে আচম্বিতে।

'না। গরম লাগছে যেন।'

সুরকি-রাস্তার শেষপ্রান্ত পার হতে থাকে দু'জনে। হোসেন সাহেবের বাড়ীর প্রধান দরজার কাছে এসে চমকে ওঠে শাকিলা চৌধুরী। দরজার পাশের জুঁই ফুলের পুষ্পসম্ভার আন্দোলিত হচ্ছে মৃদু বাতাসে। খানিকটা আলো এসে পড়েছে একগুচ্ছ ফুলশুদ্ধ একটা ডালের ওপর। কিন্তু ওই ফুলের সঙ্গে কার মুখের যেন একটা সাদৃশ্য আছে। নিরীহ ক্লান্ত একটি শ্যামবর্ণ মুখ।

কল্পনার দেহ বিবর্ণ হয়ে যেতো, এখানে না এলে হয়ত এমন ঘনিষ্ঠভাবে উপলব্ধি করতে পারত না শাকিলা। অন্ততঃ করার অবসর হ'ত না। দু'পাশের ফুলগাছেব মধ্যেকার সুরকি-পথ দিয়ে হাঁটার সময় কত কী কল্পনা করেছিল। চারিদিকের পরিবেশ যেমন অন্তরঙ্গভাবে মিশে গেছে সে-ও হয়ত এমনিভাবে হারিয়ে যাবে নতুন এক তরঙ্গের অভিঘাতে। কিন্তু গেল না সে। বরং কুমারী মনের রঙিনতা কেমন যেন ফিঁকে হয়ে আসতে লাগল।

কতদিন শাকিলা নিজ গৃহ-বারান্দায় এসে চেয়ে থেকেছে বাইরের পানে। উদাস করা প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে কতবার। অসংখ্য

বিমুগ্ধ প্রহরের কোন হিসেব নেই। ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়নি কোন মনের সঙ্গোপন-উচ্ছ্বাস। অথচ চারিদিকের পরিবেশ কত গভীরভাবে জানে তার কথা।

বিরাট বাড়িটা বেশীর ভাগ সময়েই একা দাঁড়িয়ে থেকেছে অন্তরের রিক্ততা নিয়ে। এক এক সময় অসহনীয় ক্লান্তিতে কেঁপে উঠেছে শাকিলার মন। বই পড়ে আর পত্রিকার ছবি দেখে নিঃসঙ্গ জীবনের কতটুকু কাটান যায়। অসমাপ্ত বই পালঙ্কের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জানালার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সে; কিন্তু একসময়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকাও পুরোনো হয়ে গিয়েছে। রিক্ততায় ভরে উঠেছে চতুস্পার্শ্বের জিনিসগুলো। শাকিলা সোফায় বসে নিজের ক্লান্ত শরীর নিয়ে তাকিয়েছে কড়িকাঠের দিকে।

অথচ এখনও উজ্জ্বল দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। স্মৃতির ইতিহাসে তা অমলিন। বিয়ের পরের প্রথম সপ্তাহ উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার মত লেগেছে তার কাছে। একটি প্রাণের অত্যন্ত নিকটবর্তী হয়েছে সে। গৌরবের আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে শাকিলা। গাফফার আর শাকিলা। কোন ব্যবধান নেই তাদের মধ্যে। নিজেও কোন এক অবচেতন মুহূর্তে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে দিয়েছে গাফফারের কাছে। সে বিস্মৃত-মুহূর্তের কথা এখনও মনে পড়ে ঃ

অপ্রশস্ত পথ দিয়ে গাড়ি এগিয়ে চলেছে। দু'জন গাড়ি-জানালা দিয়ে বাইরের শোভা দেখছে।

'এ-জায়গার নাম হ'ল 'রূপালি নগর'। কোন এক ভূঁইয়া তাঁর স্ত্রীর প্রতি মুগ্ধ হয়ে এই নগরটি নির্মাণ করেছিলেন। ভূঁইয়া-মনের রূপমুগ্ধতার পরিচয় ফুটে রয়েছে এখানে। এখন অবশ্য আগের সৌষ্ঠব নেই। সব জিনিসের ধ্বংসের মত রূপালি নগরও নিজের অস্থিসার নিয়েই দাঁড়িয়ে আছে।'

শাকিলা মন্ত্রমুগ্ধের মত শোনে। সে যেন বিস্মৃত-প্রায় যুগের কোন এক প্রেম-অধ্যায়ের অশ্রুকাহিনী শুনছে নিজের মনকে জালের মত বিছিয়ে দিয়ে। সূর্যের রেণু সেখানে এসে চম্‌কে উঠছে। শাকিলা গাফফারের আরও সান্নিধ্য-সঙ্গ হয়, 'তোমাদের এখানে অনেক ইতিহাস ছড়িয়ে আছে দেখছি।'

গাফফার ওর মাথার ওপর হাত বুলাতে বুলাতে ফিস ফিস করে বলে, 'এ ইতিহাস প্রাচীন। কিন্তু তাকে দু'হাতে নিজের কাছে টেনে নিয়েছি সে বর্তমানের-প্রত্যাশায় রঙিন, উজ্জ্বল আর প্রাণবন্ত।'

শাকিলা বিমুগ্ধের মত হাসে, আহ! 'আস্তে!'

তারপর শাকিলা গাফফারের বুকের ওপর মাথা রেখে ঘন ঘন শ্বাস ফেলেছে এক বিস্ময় প্রহরের ইতিহাস শুনতে শুনতে। হয়ত, বর্তমান-মুহূর্ত অতীতের

ইতিহাস-প্রত্যাশী হয়ে অনবরত কেঁপে কেঁপে উঠছে রূপালী সমুদ্রে অবগাহন করে।

তখনকার বিস্তৃত ইতিহাস বিমুগ্ধ-চেতনাশ্রিত বলে দর্পণের গায়ে লিখে রাখা যায়। সেদিকে তাকালে পূর্বপাঠ মনে পড়ে অনবরত। হাজারিবাগ, রতনগড়, কমলপুর আর চড় ইভাতির মধ্য দিয়ে দিনগুলো কেটে গিয়েছে বিমুক্ত পাখির মত। উত্তেজনা আর উন্মাদনা। চড় ইভাতি করে ফেরার সময় রাত হয়ে গিয়েছে। শাকিলা আলোকস্নাত পথের দু'পাশ দেখতে দেখতে চলেছে। পাশে গাফফারের হাতের সিগার নতুন করে জ্বলে উঠেছে।

'ওই যে ভূঁইয়ার গড়।' রূপালি নগরের কাছে গাড়ি আসতেই শাকিলা হাত দিয়ে গড় দেখায়।

গাফফারের মুখে মৃদু হাসি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, 'মনে আছে দেখছি।'

খানিকক্ষণ গাড়ি থামিয়ে দু'জনে মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে থেকেছে রূপালী নগরের ধ্বংসস্তুপের দিকে।

কিন্তু এক সপ্তাহ পরে বিমুগ্ধতার স্পর্শ অতিক্রান্ত হয়ে গেল। গাফফার নিজের কর্মজীনে ফিরে এসে কাজের মধ্যে ডুবে গেল সম্পূর্ণভাবে। একাকীত্বে ক্রমশঃ বিষণ্ন হয়ে পড়ল শাকিলা। অথচ এ থেকে উৎসারণের কোন পথও নেই। গাফফার সকালে অফিসে বেরিয়ে যায়। ফেরে অনেক রাতে ক্লাব থেকে। প্রথম প্রথম জেগে থাকত শাকিলা। উৎকণ্ঠা আর একাগ্রতা নিয়ে চেয়ে রইত দরজার দিকে। বাইরে পদশব্দ হতেই বিছানা থেকে নেমে এসে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকত দরজার পাশে।

গাফফার এসে বসত সোফায়। রেগুলেটর ঘোরান হ'ত। কোট খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করত, 'এখনও ঘুমাওনি যে?'

'ভাল লাগে না একা একা। তুমি না এলে সব কিছু বিশ্রী লাগে।'

'দেরী হয়ে যায় কাজের চাপে! এরপর আর জেগে থেকো না। লাভ কী অনর্থক জেগে?

সত্যি লাভ নেই। শাকিলা চৌধুরী আজ অত্যন্ত স্পষ্ট করে বুঝেছে রাত জেগে কোন লাভই নেই। কেননা, দু'চোখের ঔৎসুক্যের কোন মূল্য পাওয়া যাবে না। আর সে-জন্য সে কাউকে দায়ীও করতে চায় না। তাহলে অন্যায় করা হবে। অবিচার করা হবে শহরের বিখ্যাত ব্যবসায়ী গাফফার চৌধুরীর ওপর।

বাইরে থেকে ফেরার পর গাফফার পর পর সিগারেট খেয়েছে। শাকিলা সামনে বসে বিস্ফোরিত চোখে তাকিয়ে থেকেছে তার দিকে।

'এত সিগারেট খাও কেন'? লক্ষ্মীটি, এত খেও না। ওর মধ্যে যে নিকোটিন আছে।'

'সামান্য নিকোটিনে আমার কিছু হবে না। কিন্তু ব্যাপার কী জান শাকিলা'? মানুষ ইচ্ছা করেই নিষিদ্ধ জিনিসের বেশী করে ভক্ত হয়ে পড়ে। তাকে বাধা দেওয়া বোকামী মাত্র।'

'তবুও চেষ্টা করা উচিত কমিয়ে দেওয়ার জন্যে। ইচ্ছা ত নিজের মধ্যে।'

শাকিলা উঠে এসে গাফফারের চুলের মধ্যে নিজের হাত চালায়, 'লক্ষ্মীটি, এবার থেকে সাবধান হয়ো।'

গাফফার কোন কথা বলে না। চোখ বন্ধ করে থাকে অনেকক্ষণ। হয়ত ভাবে নতুন কোন টেন্ডারের কথা। আগামী কাল তাকে কী কী সরবরাহ করতে হবে'? কত বস্তা সিমেন্ট সরবরাহ করা প্রয়োজন 'ম্যাসন কোম্পানী'র নতুন দোকান ঘরের জন্য।

কোন দিন গাফফার খায় কোনদিন না খেয়েই শুয়ে পড়ে। শাকিলার চোখ দু'টো ছল ছল করে ওঠে টেবিলে ঢাকা খাবারের দিকে তাকিয়ে। নিজের হাতে সারাটা বিকেল সে খাবার তৈরী করেছে। অথচ তা অভুক্ত রইল। কাল সকালে যার কোন মূল্যই থাকবে না। ছড়িয়ে দিতে হবে উঠোনের এককোণে। এক-পাল মুরগী ঠুক্রে ঠুক্রে খাবে সেগুলো। চোখ দু'টো কেমন জ্বালা করতে থাকে। অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছে তার। নিয়নের বাতিতে দেখেছে খাবারগুলো তেমনি ঢাকা। বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছে জানালার পাশে। মৃদু বাতাসে আন্দোলিত হয়েছে অযত্ন শিথিল করবীগুচ্ছ। খানিকক্ষণ পর মনের আন্দোলন স্থিমিত হয়ে পড়েছে। শাকিলা বালিসের ওপর মাথা রেখে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছে গাফফারের দিকে। কেমন নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে লোকটা। অথচ নিশ্চিন্ত রাতের অন্য একটি অশান্ত আত্মার খবর তার কাছে অপ্রয়োজনীয়।

এখন আর শাকিলা রাতে গাফফারের জন্য অপেক্ষা করে না। খানিকক্ষণ বই পড়ে লাইট নিভিয়ে শুয়ে পড়ে। গাফফার কখন ফেরে সে খবর সে জানে না। সকালে ঘুম ভাঙার পর দেখে একজন মানুষের আচ্ছন্ন ভাব। কেবল এক কাপ বেড-টীর জন্যে অস্থির হয়ে পড়ে শাকিলা। তারপর দিনের বিস্তৃত কাললগ্নে সে সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়। প্রয়োজনের সমুদ্রে অপ্রয়োজনীয় একটি শিশির বিন্দু অথবা চাঁদের অনতিদীর্ঘ জ্যোৎস্না ছায়া মিলিয়ে যায়। তার কোন অস্তিত্ব থাকে না। সূর্যের প্রখর রোদ ঝলমল করতে থাকে সারা পৃথিবীতে।

শাকিলা বই পড়ে। অথচ এক ঘণ্টার মধ্যেই সে হাঁপিয়ে ওঠে স্নায়ুবিক দুর্বলতায়। হয়ত এই সময়ের মধ্যে পনেরো পৃষ্ঠাও পড়া হয়নি। গল্প অদ্ভুতভাবে জমে উঠেছে। শাকিলা চরম মুহূর্তেই উঠে পড়ে বই বন্ধ করে। পুরোনো

পরিবেশে আবার ফিরে যায়। সেই জানালা আর বাইরের দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে ধরে। ক্লান্তি দু'হাতে মুছে ফেলার জন্য কখনও কখনও শাকিলা সিনেমায় ছবি দেখতে যায়। কিন্তু অর্ধেক বই দেখেই উঠে পড়ে। আবার ফিরে আসে পুরোনো পরিবেশে। খানিকক্ষণ আনমনে ঘুরে বেড়ায় সুরকি ঢালা পথে। ক্লান্ত হয়ে একসময়ে লাউঞ্জে এসেচুপ করে বসে পড়ে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত হাতের ওপর থেকে মাথা তোলে না।

নিয়মের আলোর রশ্মি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। গাফফার কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়ে 'রবসন ব্রাদার্সে'র ভাউচারখানা লক্ষ্য করছে। দূর থেকে শাকিলা দেখতে থাকে তাকে। ইচ্ছা করে কাগজপত্রের নারকীয় স্তূপ থেকে তাকে উদ্ধার করে মুক্ত বায়ু সেবন করায়। আশ্চর্য লাগে তার কি করে যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরিশ্রম করেও কোন ক্লান্তি অনুভব করে না গাফফার!

শাকিলা আস্তে আস্তে এক সময় গাফফারের পাশে এসে দাঁড়ায়। হাত রাখে পিঠের ওপর। অত্যন্ত আলগোছে। গাফফার চোখ তুলে তাকায়, 'কী ব্যাপার?'

শাকিলা পাশের ইজিচেয়ারে বসে পড়ে।

'এমন করে কাজ করতে সারাদিন ভাল লাগে তোমার? চল, বারান্দায় বসিগে খানিকক্ষণের জন্য।'

গাফফার কাগজপত্র হাতে নিয়ে উঠে পড়ে, 'চল।'

দু'জনে বারান্দায় এসে বসে। শাকিলা গাফফারের চুলে বিলি দেয়। গাফফার ওর হাঁটা নিয়ে অনেকক্ষণ খেলা করে একসময় ছেড়ে দেয়। হঠাৎ মনে পড়ে আগামীকাল 'সালাম-সন্সে'র মাল সরবরাহ করতে হবে। কাগজপত্রগুলো ভাল করে পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

চুলে বিলি কাটতে কাটতে শাকিলার হাত থেমে যায়। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে মুহূর্তকাল। যান্ত্রিক পরিবেশে আবার ফিরে গিয়েছে গাফফার। কী হবে তাকে অন্য কথা শুনিয়ে। মুখখানা নৈরাশ্যে ভরে যায়। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে সেখান থেকে। সরে আসে কার্নিশের কাছে। কার্নিশে দেহ হেলান দিয়ে তাকিয়ে থাকে বাগানের দিকে। জুঁই আর কামিনী ফুলের উগ্র গন্ধ ভেসে আসছে। সে সৌগন্ধ্যের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে বসে থাকতে ইচ্ছা করে না তার। অথচ কোন উপায় নেই। ব্যথিতের মত দু'চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে।

আজকাল আর পরিশ্রান্ত হয়ে ওঠে না শাকিলা। অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার করার জন্য ছুটে যায় সবুজ দরজার দিকে। টোকা দেয় মৃদু। শাহেদ দরজা খুলে হাসি মুখে অভ্যর্থনা করে, 'আসুন।'

স্টুডিও ঘরে প্রবেশ করে শাকিলা। ঘরের চারপাশে ছবি আর রঙ-তুলি।

শাকিলা ঘুরে ঘুরে ছবি দেখে। এর মধ্যে কতবার সে একটা ছবিকে দেখেছে। তবুও যেন পুরোনো হয় না। লাল রঙ কখনও নীল হয়ে ওঠে, কালো রঙ সবুজ। রঙের সমারোহ তাকে অব্যক্তভাবে আহ্বান করে প্রতিনিয়ত। এবং সে আমন্ত্রণে সাড়া দিতেই দোতলার সিঁড়ি ভেঙে নীচে ছুটে আসে শাকিলা।

শাহেদ নতুন আঁকা ছবিটা দেখায়, 'সবেমাত্র শেষ করেছি।'

শাকিলা ছবির দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। বর্ণের সমারোহ চোখে এক রঙিন নেশা এনে দেয়। অথচ কী সাধারণ ছবির বিষয়বস্তু। নদীর তরঙ্গ এবং বিক্ষুদ্ধ হৃদয়।

'চমৎকার হয়েছে।'

শাহেদ তুলি নিয়ে আঁচড় কাটে পর্দার দেহে। শাদা পর্দার দেহ বিচিত্র বর্ণালিতে সুন্দর হয়ে ওঠে। শাকিলা বসে বসে রঙের খেলা লক্ষ্য করতে থাকে। কেটে যায় অনুক্ষণের বৃত্ত। শাকিলা তন্ময় হয়ে দেখে। উত্তীর্ণ প্রহরের কথা মনে থাকে না তার।

রূপালি নগবের রূপছায়া দূর থেকে দেখা যায়। গাড়ি পাশে দিয়ে যেতেই থামিয়ে দেয় শাকিলা। শাহেদ নেমে পড়ে গাড়ি থেকে। সন্ধ্যার অন্ধকার আর একটু পরেই ঘনীভূত হয়ে ছড়িয়ে পড়বে সবুজ গাছের কোল ঘেঁসে।

'এটাই রূপালি নগর।' আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে শাকিলা।

'ভূঁইয়া-স্ত্রীর স্মৃতিচিহ্ন?'

'হ্যাঁ।' মাথা দুলিয়ে বলে শাকিলা। মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে থাকে সে সুউচ্চ অরণ্যের দিকে। কেমন একটা মাদকতার চিহ্ন তার মুখে-চোখে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে, 'চলুন, দেখে আসি। খানিকটা দূরেই নাকি ভূঁইয়াদের দীঘি। সমাধি আছে সেখানে।'

আকাশের দিকে তাকায় শাহেদ। ক্রমেই অন্ধকার জমাট বেঁধে আসছে, 'ওখানে গেলে অন্ধকার রয়ে যাবে। পথ-ঘাট অচেনা।'

'আমি পথ চিনি। কোন অসুবিধা হবে না।'

দু'জন এগোতে থাকে অপ্রশস্ত রাস্তার ওপর দিয়ে। বড় বড় বহু কাঁটা গাছ এলোমেলোভাবে দাঁড়িয়ে আছে চতুষ্পার্শ্বে। শাকিলা পথ দেখিয়ে চলতে থাকে।

ভূঁইয়াদের দীঘির চতুর্দিকে আগাছা। এখনও গ্রামের লোক এখানে গোসল করতে আসে। পথের রেখা সেজন্য অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে যেতে পারেনি। বরং

দু'পাশের আসনগুলো পরিষ্কার। শাকিলা সেখানে গিয়ে বসে। বিরাট দীগির দিকে তাকিয়ে থাকে। কতদিন আগে এখানে কোন সুন্দরী তরুণীর নূপুর নিক্কণে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিল। অতবা ভুঁইয়া-প্রিয়ার কমলের মত অলক্ত চরণ মৃদুভাবে এগিয়ে গিয়েছিল সিঁড়ির ওপর দিয়ে। এখনও বুঝি পাশের ছোট ভাঙা ঘর থেকে সুন্দরীদের পোশাক আর সুরমার মৃদু সৌরভ ভেসে আসে। শাকিলা তন্ময়ের মত একদিকে তাকিয়ে থাকে।

সমাধি ফলকে অনুজ্জ্বল লেখা এখন আর পড়া যায় না। বিবর্ণ লিপি ভুঁইয়ার প্রাচীনত্বই বহন করে। পাশাপাশি সমাধির দিকে তাকিয়ে থাকে শাকিলা। দু' চোখের মধ্য থেকে যেন চাঁদের কিরণ বিচ্ছুরিত হয় এই প্রশান্ত প্রথম প্রহরে। ভুঁইয়ার কঠিন বুকে যে মেয়েটি তার দীঘল কেশমুক্ত করে আবেশে একদিন হেসে উঠেছিল আজ সে পৃথিবীর বুকে ভুঁইয়ার পাশে নিজের আশ্রয় করে নিয়েছে। আজও হয়ত তাদের বিদেহী আত্মা কোন নির্জন প্রহরে একত্রিত হয়।

শাকিলার দৃষ্টিতে মন্ত্রমুগ্ধতার সুর, 'অত্যন্ত চমৎকার লাগছে।'

অযত্ন শিথিল হলেও মনে হয় এখানে একদিন নোটন পায়রার দল ঝোঁটন বাঁধত।'

'হ্যাঁ।'

আবার সেই পুকুর পাড়। জ্যোৎস্নার ঢল নেমেছে দীঘির বুকে। কালো পানি ঝলমল করছে। ঝিকমিক করছে শাকিলার শাড়ি। অবাক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে শাহেদ।

'অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছে আপনাকে।'

শাকিলা যেন চমকে ওঠে।

শাহেদ অপ্রস্তুত হয়। দোষ স্খলনের জন্য বলে, 'চলুন, এবার বরং ফেরা যাক।'

'না।' শাকিলার দৃষ্টি কঠিন হয়ে ওঠে, 'সেখানে ফিরে গেলে অনুষ্টব ক্লান্তি! সে আমি চাইনে আরও কিছুক্ষণ থাকতে চাই এখানে।'

শাহেদও যেন পরিবেশে বদলে দিয়েছে অনেকখানি। কোন সঙ্কোচ লাগে না শাকিলার দিকে চাইতে। শিল্পীর প্রেরণায় জীবন্ত মডেল। আশ্চর্য হয় শাকিলা। শ্যামবর্ণ মুখের দিকে তাকাতে আজ ভাল লাগে তার। ইচ্ছা করে তার ঘাড়ে মাথা রেখে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে।

'অনেকক্ষণ কেটে গেল! এবার ফিরি।'

শাকিলা তন্দ্রাগ্রস্তের মত চোখ তুলে তাকায় তার দিকে, 'বেশ।'

ঝলমল করছে সবুজ বনানী। ঝিলমিল করছে শাকিলা। আজকের জ্যোৎস্নার স্পর্শে দু'জনই সুন্দর।

গাফফার এখন নিশ্চিন্ত। নিজেকে কাজের মধ্যে গভীর প্রশান্তিতে নির্মজ্জিত করতে পারে। কোন অন্যরেখা এসে হিসাবের দাগের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে না। পরম নিশ্চিন্তে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ে। আর শাকিলার বিরক্তির সময় অতিক্রান্ত হয় শাহেদের চিত্রের বর্ণালী দেখে। গাফফার দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের খাতায় ধরত না যাকে, অথচ সেই শাহেদই আজ শাকিলার পরিশ্রান্ত সময়ের বিশ্রাম হয়ে উঠেছে। এজন্য শাহেদের প্রতি মনে মনে কৃতজ্ঞ সে।

কয়েক দিনের জন্য কি এক কাজে বাইরে গিয়েছিল গাফফার। সেদিন ফিরে এসে সিঁড়ির পাশে থেমকে দাঁড়ায়। কেমন থম থম করছে সারা বাড়ীটা। বাইরে থাকার চারদিনের মধ্যেই বাড়ীর রূপ যেন সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। শাহেদের স্টুডিওঘর বন্ধ। দরজায় তালা ঝুলছে। গাফফার দোতালায় উঠে যায়। অন্ধকার বিস্তৃত সারা ঘর আর বারান্দার ওপর। দরজা খুলে আলো জ্বালাতেই ঘরের শূন্য মূর্তি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কাপড়ের আলমিরাটা ফাঁকা। শাকিলার শাড়ি আর বিচিত্র ধরনের ব্লাউজগুলো আজ আর শোভা পাচ্ছে না সেখানে। ড্রেসিং টেবিলের ওপরটা খালি একবারে। চারদিকে তাকিয়ে থমমত খায় সে। নিয়নের উজ্জ্বল আলো আজ যেন ঘরের নিস্প্রভতাকে কোনক্রমে মুছিয়ে দিতে পারে না। গাফফার ক্লান্তি অনুভব করে আজ। এক সময় মুখ নীচু করে বসে পড়ে চেয়ারের ওপর।

কফি এনে টেবিলের ওপর রেখে দেয় মোস্তফা। বাড়ীর শূন্যতা তার পক্ষেও যেন অসহ্য। চলার বিষণ্নতার চিহ্ন পরিস্ফুট।

'শোন।'

মোস্তফা দরজার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়।

'ওরা কবে গিয়েছে এখান থেকে?'

'আপনি যাওয়ার দিনই।'

'আচ্ছা যাও।'

ধীর পদে মোস্তফা চলে যায়।

গাফফার অপেক্ষা করল সাত দিন। শূন্য বাড়ি আবার নতুন করে পদশব্দে মুখরিত হয়ে উঠল না এর মধ্যে। তেমনি পূর্বতন বিভীষিকা ছড়িয়ে রইল। কার্নিশে আর ছাদের ওপরে। অবশেষে ধরা পড়ল দু'জন। ছোট একটি বাড়ি থেকে পুলিশ

উদ্ধার করে শাকিলা আর শাহেদকে। গাফফার জামিন দিয়ে ছাড়িয়ে আন্‌ল শাকিলাকে। শাকিলা গাফফারের বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল।

'আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল বেড়ানোর নাম করে।'

গাফফার ওর চুলের গোছার মধ্যে হাত বুলায়। কেমন স্নেহভাব জাগে নিজের মধ্যে। গালের অশ্রুও মুছিয়ে দেয় রুমাল দিয়ে। আশ্চর্য! মেয়েটি ভয় পেয়ে আজ এত কাঁদছে।

সৈয়দ হোসেনের চেম্বারে অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে শাকিলাকে। বেশী পাওয়ারের বালবও চেহারায় দৈন্যগ্রন্থি মুছে ফেলতে পারেনি। প্রসাধনলিপ্ত মুখের ওপর পানির দাগ। অনেকক্ষণ কেঁদেছিল হয়ত প্রসাধনের আগে। খোঁপার মধ্য থেকে কাঁটাগুলো বেরুনো। বিড়েটা ঝুলছে ঘাড়ের ওপর। অথচ শিফনের উল্লাস দেহকে সযত্নে ঘিরে। যত্ন আর অযত্নের রেখা দু'টো পাশাপাশি থেকে অদ্ভুত করে তুলেছে আজকের শাকিলাকে।

এ্যাডভোকেট সৈয়দ হোসেন পুরু কাচের মধ্য দিয়ে তাঁর তীক্ষ্ম দৃষ্টি মেলে ধরেন শাকিলার দিকে। খানিকক্ষণ দেখেন তাকে। দৃষ্টি দিয়েই তিনি অপরাধীর মন বুঝতে চেষ্টা করেন। জেরার আগে অর্ধেক পাঠ সেরে নেন। কিন্তু শাকিলাকে দেখে বিস্মিত হলেন তিনি। একে দেখে সম্পূর্ণ সন্দেহও করা চলে না, অথচ একেবারে নিসন্দিগ্ধও হওয়া যায় না।

'আমি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। উত্তরগুলো একেবারে প্রকৃত হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে আপনার সম্মান বাঁচানো আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আইনজ্ঞদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন। এবং সেজন্যই আমাকে লজ্জা করলে চলবে না। সব কথা নিসঙ্কোচে খুলে বলতে হবে।'

সৈয়দ হোসেনের কথায় শাকিলা গাফফারের দিকে একবার তাকিয়েই মাথা নীচু করে। সৈয়দ হোসেন চশমা মুছে আবার চোখে দেন, 'আমার প্রথম প্রশ্ন আপনি স্ব-ইচ্ছায় বাড়ী ছেড়ে গিয়েছিলেন কি-না?'

শাকিলা গাফফারের দিকে অবাক দৃষ্টি মেলে ধরে।

'ভেবেচিন্তে উত্তর দিন।'

শাকিলা কোন কথা বলে না।

'বেশ! তাহলে বলুন, আপনি কেন গেলেন ওর সঙ্গে?' শাকিলা আবার গাফফারের দিকে তাকায়। এ-দৃষ্টির অর্থ সবাই বোঝে। শাকিলা তার সামনে বলতে স্পষ্ট দ্বিধা পাচ্ছে। গাফফার পাশের ঘরে চলে যায়। সৈয়দ হোসেন খানিকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখেন।

'এবার বলুন, আপনি নিজের ইচ্ছায় তার সঙ্গে গিয়েছিলেন কি-না'? অথবা সে আপনাকে জোর করে নিয়ে গিয়েছিল। এই শ্রেণীর পুরুষরা এমনিই হয়। প্ররোচনা দিয়ে ভাল মেয়েদের মন নষ্ট করে। আবেগের মুহূর্তে মেয়েরা গৃহত্যাগ করে।'

শাকিলা ভাবতে থাকে। অত্যন্ত দ্রুত চিন্তা করে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি নিরীহ শ্যামবর্ণ মুখ, উজ্জ্বল চোখে আর কোঁকড়া চুল। প্রশান্ত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে।

'উত্তর দিন আমার প্রশ্নের। এমনভাবে চুপ করে থাকলে চলবে না। কেস চালাতে হবে আমাকে।'

শাকিলা তবুও কোন কথা বলে না।

'কিন্তু এমন করে নীরব হয়ে থাকলে চলবে না। আমার প্রশ্নের উত্তব দিতে হবে।'

একমুহূর্ত কী ভাবেন সৈয়দ হোসেন। তারপর বলেন, 'বেশ ত! এ কথার উত্তর দিতে নিশ্চয় বাঁধবে না আপনার, আপনি পালিয়ে গেলেন কেন?'

শাকিলা মুখ তুলে তাকাল সৈয়দ হোসেনের মোটা চশমার দিকে। চোখ দুটো যেন জ্বালা করতে শুরু করে তার।

'উনি সারাদিন ব্যবসা নিয়ে থাকতেন।'

সৈয়দ আহমদ হোসেন চমকে উঠলেন। কিন্তু পরক্ষণে তাঁর নামের পাশের এল-এল-বি ডিগ্রীটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। মনস্তত্ত্ববিশারদ হলে চলবে না। তাঁকে জয়ী হতে হবে এই কেসে। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ঘটনা জেনে সাজাতে হবে নতুন ছাঁচে। যাতে একটুও ভাঙে না, টলে না সামান্যও।

'তাহলে ওর সঙ্গেই পালিয়ে গিয়েছিলেন ওরই প্ররোচনায়?'

শাকিলা আবার মুখ তুলে তাকাল। মুহূর্তের জন্য আবার শ্যামবর্ণ মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

'কোথায় কোথায় ছিলেন আপনারা। বাড়ী থেকে কী নিয়ে গিয়েছিলেন'? খরচ চল্‌ল কেমন করে? বলুন- এ-সব আপনার সম্মানের জন্যই জানতে হবে আমাকে।'

শাকিলা কোন কথা বলে না। ওর মাথাটা ঝিম ঝিম করতে থাকে।

গাফফার পাশের ঘর থেকে আবার এসে বসে চেম্বারে। সৈয়দ হোসেন অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকান তার দিকে। নীরব মুহূর্ত অতিক্রান্ত হয়। আবার প্রশ্ন।

'এ-ভাবে চুপ করে থাকলে চলবে না শাকিলা। তুমি সত্যিকারের ঘটনাটুকু খুলে বলবে। নতুবা লোক সমাজে হেয় হয়ে পড়বে তুমি-, তোমার পরিবার, আমার মান-সম্ভ্রম।'

শাকিলা মাথা নীচু করে শাড়ির আঁচল নাড়তে থাকে।

'বেশ কী উত্তর দিতে হবে আমাকে?'

সৈয়দ হোসেন এবার উল্লসিত হয়ে ওঠেন। চশমা খুলে প্রশ্ন করতে থাকেন। 'আপনি তাহলে নিজের ইচ্ছায় পালাননি, আপনাকে প্ররোচনা দেওয়া হয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ।'

সৈয়দ হোসেন জেরা করে মামলা সাজাতে থাকেন। এতক্ষণ পর প্রকৃত পথের সন্ধান পেয়েছেন তিনি।

ঘর ছেড়ে উঠে পড়ে দু'জন। তারপর এগিয়ে যেতে থাকে সিঁড়ির দিকে।

সৈয়দ আহমদ গভীরভাবে কাগজ পরীক্ষা করছেন। আগামীকাল কোর্টে উপস্থাপিত করতে হবে নথিপত্র। হঠাৎ দরজায় ধাক্কা পড়ে ঘন ঘন। সৈয়দ হোসেন চমকে ওঠেন। এত রাতে কারুর আসার কথা নয়। দরজা খুলতেই ঘরে একজন নারী প্রবেশ করে তাঁর হাত আবেগে ধরে কেঁদে ওঠে।

'আমি যা স্বীকারোক্তি করেছি সব মিথ্যে সব মিথ্যে। একবর্ণও সত্য নয়। আমি স্বেচ্ছায় ওর সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলাম। ওর কোন দোষ নেই। ওকে বাঁচাতে হবে আপনাকে যত টাকা লাগে আমি দেব।'

সৈয়দ হোসেন অবাক হয়ে যান। এতক্ষণ ধরে লেখা রিপোর্টখানা সম্পূর্ণ মিথ্যে হয়ে যায় তাঁর। কোন কথাই যেন বলতে পারেন না তিনি।

শাকিলা চোখ মুছে তাঁর সামনে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর বিদ্যুৎগতিতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে হনহন করে। আর প্রৌঢ় আইনজ্ঞ তখনও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছেন না নিজেকে–নিজের এতদিনের অভিজ্ঞতাকে। যে অভিজ্ঞতা তিনি সংগ্রহ করেছিলেন মেধা আর পরিবেশ থেকে। কিন্তু তখনি তাঁর মনে পড়ে আজকের সন্ধ্যার কথা। তখনকার অনুভব অনুমান হলেও মিথ্যা হয়নি। মিসেস শাকিলা চৌধুরী সম্পূর্ণ সত্য নয়, অথচ একেবারে মিথ্যাও নয়। তবে সে কী? মনুকন্যা!■

সর্পিল

সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে প্রতিদিনই ছোট ঘরটা চোখে পড়ে সাইফুরের। হাসিনা স্টোভ জ্বালিয়ে ডিম ভাজছে, আর সাদেক নীচে বসে রয়েছে ভাতের বাসন সামনে রেখে। ভাজা তেলের গন্ধ নাকে এসে আঘাত করে তার। আশ্চর্য হয়েছে সাইফুর। একদিনও এর ব্যতিক্রম হয়নি। প্রথম প্রথম হাসিনা দরজা ভেজিয়েই রাখত, আজকাল আর তা-ও করে না। অনেক দিন ভেতরে দৃষ্টি পড়তেই থতমত খেয়ে গিয়েছে সে। স্বামী স্ত্রী শুয়ে রয়েছে বিছানার ওপর। গলা খাঁখারি দিয়ে সাইফুর সদর দরজার দিকে এগিয়ে গিয়েছে অপেক্ষাকৃত জোরে জোরে পা ফেলে।

কিন্তু আজ একটু অন্যরকম ঠেকল নিজের কাছে। ভেতরের ঘরে ডিম ভাজার শব্দ নেই। সাইফুর ঘরের দিকে নজর দিতেই যেন আশ্চর্য হয়ে যায়। রঙিন কাগজ দিয়ে ঘরটা সাজাচ্ছে স্বামী-স্ত্রী দু'জন। অন্যান্য দিনের অফিসে যাওয়ার জন্য যেন কোন প্রস্তুতিই নেই সাদেকের।

সাইফুর ছাতা বগলে নিয়ে সদর দরজার দিকে এগোতেই সাদেক হাসি মুখে তার সামনে এসে দাঁড়ায়।

'অফিসে যাচ্ছেন বুঝি?'

'জী।'

সাদেক হাতের কাগজগুলো নাড়াচাড়া করে মুহূর্ত, 'আজ রাতে আমাদের এখানে আপনাদের সবার দাওয়াত রইল।'

সাইফুর বিস্মিত হয়ে তাকাল সাদেকের দিকে।

'বিশেষ কিছু নয়। আজ আমাদের প্রথম বিয়ে বার্ষিকী উদ্‌যাপন করব। তাই কয়েকজন বন্ধু আপনাদের নিয়ে একটু আমোদ-আহলাদ, আর কি। আসছেন নিশ্চই।'

'কি বলেন, এতে আসব না।'

সাইফুরের মুখের দিকে চেয়ে পরিতৃপ্তির হাসি হাসে সাদেক।

'আচ্ছা আসি তাহলে।'

সাইফুর সদর দরজা ঠেলে বাইরে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায়।

আশ্চর্য লাগে তার এবং তার সঙ্গে একটা প্রগাঢ় বিস্ময়। সাদেক আর হাসিনা তাদের প্রথম বিবাহ-বার্ষিকী উদ্‌যাপন করছে। হয়ত এতে বিস্ময়ের কিছু নেই, তবুও তার কাছে এ যেন কোন্ দূরের পাহাড়ের ওপরের লাল মেঘ। সে রঙিন মেঘ সে প্রতিদিন দেখে, আপন করার একটা আন্তরিক ইচ্ছা জাগে, কিন্তু ছেলে-মেয়েদের দিকে তাকাতেই সমস্ত উচ্ছ্বাস একসঙ্গে নিভে যায়। বিলাসিতাকে আস্তে আস্তে সরিয়ে দেয় স্পর্শ করার পূর্বাহ্নেই। প্রৌঢ় অপরাহ্ন ব্যঙ্গ করে তাকে। ব্যঙ্গ করে রাস্তার পাশের গ্ল্যাক্সোর বিজ্ঞাপনটার মতই। কতদিন সুলতানা বলেছে ছোট ছেলেটার জন্য একটিন গ্ল্যাক্সো কিনে আনতে। অথচ জমানো টাকা প্রতিবারই অন্য কাজে খরচ করতে হয়েছে। খোকার গ্ল্যাক্সো আসেনি। খোকা খেয়েছে সস্তা বার্লি আর পানি মেশান দুধ। সাইফুর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে।

দিন বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে কাজও বেড়ে চলে সাইফুরের। ব্যাংকের কেরানী-জীবন একমুহূর্ত অবসর পায় না কল্পনার চিত্রাঙ্কন করতে। কিন্তু আজ বারেবারে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে সাইফুর। মনে পড়ে তাদের একতলার ভাড়াটেদের কথা। কতই বা মাইনে পায় সাদেক? হয়ত তারই মত, অথবা তার চাইতেও কম। অথচ তবুও তারা বিবাহ বার্ষিকী উদ্‌যাপন করতে চায়। স্মরণ করে একটি উজ্জ্বল বিগত বছরের কোমল রাতের কথা। যে রাত কোনদিন অমলিন হতে পারে না ইতিহাসের প্রবাহে। শত সহস্র ক্লান্তিবিন্দু, তা হয়ে থাকবে স্বর্ণরেখার মত দীপ্তিমান, সোনালী চাঁদের মত মসৃণ। সাইফুর ভাবে, গভীর চিন্তার জাল বুনে। সুলতানার মুখ অত্যন্ত উজ্জ্বল আর লাজুক মনে হয়েছিল তার কাছে। খোলা জানালা দিয়ে নারকেল গাছের কোল ঘেঁষে খানিকটা জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে ঘরের মধ্যে। সুলতানার মুখ স্পষ্ট দীপ্তি পাচ্ছে তারার মত। সাইফুর একটা লাল গোলাপ তার খোঁপার মধ্যে গুঁজে দিয়েছিল। একটি কোমল স্পর্শ ক্লান্ত প্রহরেও স্মরণ করতে পারে সে। অজস্র ঘটনার প্রবাহে একটি স্পর্শ আজও মিলিয়ে যায়নি।

সাইফুর ক্লান্তি অনুভব করে। দীর্ঘ চাকরী-জীবনে আজ কাজে যেন শৈথিল্য দেখা যায়। টাকার বাণ্ডিল গুণতে গিয়ে ভুল করে অনবরত। সহকর্মী মুশতাক অবাক হয়ে তার দিকে অনবরত চায়।

'শরীর কি ভাল নেই তোমার?'

'উঁ!'

সাইফুর তন্দ্রাগ্রস্তের মত তাকায় তার দিকে। টাকা গুণে দেয় নতুন করে।

'কি বলছ?'

'আজ যে কাজে বড় আনমনা দেখছি তোমাকে। কোনদিন তো এমন হয় না তোমার।'

'ও এমনি।'

সাইফুর আবার কাজে মন দেয়। টাকা গুণে সরিয়ে রাখে পাশের কাউন্টারে। স্তরে স্তরে সাজান টাকা বান্ডিলগুলো সে যেন সযত্নে গুছিয়ে রেখেছে। ওদের জন্য একটা আন্তরিক মমতা আছে তার। অথচ তা নিঃস্বার্থ একেবারে। অনেকটা দূরের রঙিন আকাশকে ভালবাসার মত। সাইফুরের চোখের সামনে সাদেকের সাজান ঘরটার ' বি ভেসে ওঠে। স্বামী-স্ত্রী দু'জন হাসিমুখে ঘর সাজিয়ে চলেছে। হাসিনার খোঁপায় ফুল গোঁজা। হয়ত টগর অথবা বেলী। সাইফুর যেন বিস্তৃত অতীত থেকে জেগে ওঠে। জেগে ওঠে একটি স্বেদবিন্দুর মত। একটি মেয়ে আকুল নয়নে অপেক্ষা করছে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে। সাইফুর রাস্তা থেকে বাড়ির দিকে তাকাতেই সুলতানা জানালার কাছ থেকে সরে যায় ঘরের মধ্যে। সাইফুর হাসে মনে মনে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে ঘরে ঢোকে আস্তে আস্তে।

'এত দেরী যে?'

'মিনিট ধরে বসে আছ নাকি?'

সুলতানা সাইফুরের দিকে চেয়ে সলজ্জ হাসে।

'কারুর বয়েই গিয়েছে অপেক্ষা করতে?'

'তাই নাকি?'

সাইফুর সুলতানার পাশে দাঁড়িয়ে ওর একটা হাত নিজেব হাতের মধ্যে তুলে নেয়।

'স্বপ্নে দেখলাম একটি মেয়ে জানালার ধারে বসে আছে বাস্তার দিকে চেয়ে। দেরী দেখে চোখ দু'টো ছলছল করে উঠেছে দারুণ অভিমানে।'

'যাও, মিথ্যুক কোথাকার।'

সাইফুর একটানে সুলতানার খোঁপা খুলে দিয়ে দূরে দাঁড়িযে হাসতে থাকে। সুলতানা ভাঙা খোঁপা হাতে চেপে ধরে ঠোঁট ওল্টায়।

'আমি আর পারব না বাঁধতে।'

'বেশ।'

সাইফুর পকেট থেকে একটা মোড়ক বের করে।

'বলতে পারলে পাবে।'

'আর না পারলে?'

'আমার কাছ থেকে জোর করে নিতে হবে।'

'তবে আমি চাইনে।'

সাইফুর মোড়ক খুলে ছোট তোড়া বের করে সুলতানাব এলো খোঁপার মধ্যে গুঁজে দিয়েছে।

'আঃ। কেউ দেখে ফেলবে।'

সাইফুরের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায় মুহূর্তের জন্যে। দশ বছর আগে কোন নির্মল অপরাহ্নে অফিস থেকে বাড়ি ফেরার সময় সুলতানার জন্যে ইসলামপুর থেকে ফুল কিনে নিয়ে গিয়েছে। নিজে বিনুনি করে ফুল রেখেছে খোঁপার মধ্যে। কিন্তু একদিন এই ফুল আনাও বন্ধ হয়েছে তার। স্পষ্ট মনে পড়ে তার। একটি নবজাত শিশুর আর্তরবে দু'জনে খুশী হয়ে উঠেছে। দৈনন্দিন জীবনের অনেক কিছু কেটে বাদ দিতে হয়েছে তার জন্যে। ফুল কেনা আর ছবি দেখা আস্তে আস্তে খোকার দুধ আর পোশাকের স্থান অধিকার করেছে। সন্ধ্যের সময় ছাদে বসাও আর হয়নি। বরং খোকার কান্না থামাতে হয়েছে দু'জনকেই। সেই খোকা আরও কত রূপান্তর ঘটিয়েছে তার আত্মীয়তার মাধ্যমে।

'এই যে চা খেয়ে নাও। বড্ড অন্যমনস্ক দেখছি তোমাকে।'

মুশতাকের কথায় সম্বিত ফিরে পায় সাইফুর। না, বিগত স্মৃতিতে নিজেকে আর আচ্ছন্ন করবে না। চায়ের পেয়ালা টেনে নেয় সামনে।

বিকেলে অফিস থেকে ফিরে বাড়ী ঢোকার সময় থমকে দাঁড়ায় সাইফুর। ছোট ঘরখানা শুধু সাজান নয়, রঙিন বালব দিয়েও সাজিয়েছে সাদেক। ঘরের সামনে কতকগুলো ভাড়া-করা চেয়ার। রান্নার মিষ্টি গন্ধ আসছে বারান্দার ওপাশ থেকে। সাইফুর ছাতা বন্ধ করে ঘরের দিকে তাকাতে তাকাতে সিঁড়ির দিকে এগোতে থাকে। তার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এর মধ্যেই ভিড় করেছে ঘরের মধ্যে।

'এলেন বুঝি অফিস থেকে?'

মাথা নাড়ল সাইফুর।

সাদেক হাতে খাবার নিয়ে ঘরে ঢোকে।

আর দাঁড়াল না সাইফুর। তরতর করে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠে। নামেই দোতলা, আসলে ছোট একটা চিলেকোঠা আর বারান্দা। টিন দিয়ে ঘেরা।

সুলতানা কাঁথা সেলাই করছিল মেঝেতে বসে। সাইফুরকে দেখে ঘোমটা টেনে দেয়। সাইফুর ছাতা নামিয়ে জলচৌকির ওপর বসে পা ছড়িয়ে দেয়।

'রাতে ওদের ওখানে যেতে হয়, এত করে বলেছে যখন।'

'হ্যাঁ, কিন্তু---'

'কিন্তু কি?'

'খালি হাতে যাওয়া যায় না। একটা কিছু দিতেই হয়।'

'তাই তো।'

সাইফুরের কপাল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। এদিকে সে একেবারেই লক্ষ্য করেনি, শুধু যাওয়া নয়, সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে একটা উপহার। তা যত সামান্যই হোক।

'কিন্তু কি নিয়ে যাব বল?'

'একটা বই অথবা—'

'কি?'

'ফুলদানি।'

'ফুলদানিই ভাল। তা কিনতেও পাঁচ ছ' টাকা লাগবে।'

সুলতানা বাক্স খুলে পাঁচ টাকার একটা নোট বের করে দেয়।

সাইফুর অবাক হ'য়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

'এ-যে তোমার শাড়ির।'

'আগামী মাসেই না হয় শাড়ি কিনে দিও। এ-মাসটা কোন রকমে চালিয়ে নেব।'

সাইফুর টাকা নিয়ে পকেটে রাখে। চা খাওয়ার পর তাকে আবার বেরুতে হবে ফুলদানি কেনার জন্য।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে ছোট বাড়ীটার ওপর। অন্যদিন যেমন অন্ধকারের মধ্যে বাড়ীটা মুখ ডুবিয়ে বসে থাকত, আজ তেমন সঙ্কুচিত লজ্জা নেই। ছোট ছোট রঙিন বালবে বাড়ীর একাংশ আলোকিত হয়ে উঠেছে। বিচিত্র লাগছে বহুরঞ্জিত আলোর সমারোহ। সুলতানা মুখ বাড়িয়ে নীচের দিকে চায় একবার। এর মধ্যেই আমন্ত্রিতেরা এসে গিয়েছেন। খালি চেয়ারগুলো এখন আর শূন্য নয়। ছোট আয়নাটা বের করে অনেকদিন পর সযত্নে চুল বাঁধে সুলতানা। খোঁপা ঝুলিয়ে দেয় কাঁধের ওপর। বহুদিনের অব্যবহৃত স্নো কেমন শক্ত হয়ে গিয়েছে। খানিকটা পানি মিশিয়ে শক্ত স্নো নরম করে সুলতানা। যত্ন করে মুখে দেয়। তারপর ট্রাঙ্কের ওপর ঝুঁকে পড়ে। কাপড়ের মধ্য সেই বিয়ের বেনারশী শাড়ি আর ব্লাউজটা। সুলতানা গোলাপী রঙের শাড়ি আর ব্লাউজ বের করে। বিবাহিতা জীবনের কত স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে শাড়িখানার টানাপোড়েনের ফাঁকে ফাঁকে। সূতো খোলার সঙ্গে সঙ্গে হয়ত সে স্মৃতি আপন পেখম মেলে ধরবে। এ শাড়ি পরার জন্যে কত যন্ত্রণাই দিয়েছে সাইফুর। আর আজ? সুলতানার মুখ ম্রিয়মান হাসিতে ভরে ওঠে। বেনারসীখানা খুলে ফেলে তাড়াতাড়ি। দু'এক জায়গায় ছিঁড়েও গিয়েছে। রিফুও করা হয়নি। ছেঁড়া জায়গাগুলো বাঁচিয়ে শাড়ি পরে সুলতানা। অনেকদিন পর দীর্ঘ-সময় ধরে নিজের চেহারা দেখে আয়নার দিকে চেয়ে। তারপর নেমে যায় সিঁড়ি বেয়ে।

ছোট ঘরটা মেয়ে আর ছোট ছেলে-মেয়েতে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। হাসিনা গল্প করছে সবার দিকে চেয়ে। আলোতে ঝিল্‌মিল্‌ করছে তাঁর সবুজ রঙের দামী শাড়িখানা। আমন্ত্রিতেরা তার শাড়ির দিকে ঝুঁকে পড়ে, 'কি শাড়ি এটা?'

'শিফন।'

'বাব্বা! দাম কত?'

'পঞ্চান্ন টাকা।'

'প-ঞ্চা-ন্ন।'

আঁৎকে ওঠে সুলতানা। বিস্ফোরিত চোখে চেয়ে থাকে হাসিনার প্রতি। পঞ্চান্ন টাকার শাড়ি পরেছে হাসিনা। কল্পনাই করতে পারে না সে। সবাই হাসিনার শাড়ি নিয়ে আলোচনায় মেতে ওঠে। হাসিনা সবার মাঝে বসে শাড়ি দেখতে থাকে।

একসময় উৎসব শেষ হয়। নীল-লাল বাতিগুলো নিভে যায়। কিন্তু ঘুম আসে না সুলতানার। ওর চোখের সামনে হাসিনার সবুজ রঙের শাড়িখানা ভাসতে থাকে। হাসিনার উজ্জ্বল দৃষ্টি তার সামনে ভেসে বেড়ায়। বড় ছেলেটার গায়ে পা দিয়েছে মেজ ছেলে। হাত দিয়ে সুলতানা পা-টা নামিয়ে দেয়। চেয়ে দেখে সাইফুর ঘুমুচ্ছে। নিজের একটা হাত সাইফুরের কপালের ওপর রাখে। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। হাত দিয়ে মুছিয়ে দেয় সেগুলো। ছেলেদের দু' হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আদর করে হঠাৎ। তারপর ছোট ছেলেকে কোলের কাছে টেনে এনে ওর ছোট ছোট চুলে হাত বুলায়।

'খোকা, খোকা, সোনামণিরা আমার।'

সুলতানার চোখ ছলছল করে ওঠে। আরও জোরে সে খোকাকে নিজের কাছে আকর্ষণ করে।

'মণি আমায়।'

সাইফুর অফিসে যাওয়ার পর সুলতানা সম্পূর্ণ একা। ছেলে-মেয়েরা রাস্তায় খেলতে যায়। ভাত খাওয়ার আগে আর আসে না। কখনও কখনও গল্প করতে আসে হাসিনা। আজও তেমনি এলো।

'রান্না করছ নাকি, আপা?'

'হ্যাঁ, ভাই। এস।'

হাসিনা এসে বসে।

'কি কি রাঁধছ?'

'যা রোজ রোজ রাঁধি।' হেসে বলে সুলতানা, 'নতুন আর কি রাঁধব। সেই ডাল আর ভাত। কখনো বা ট্যাংরা মাছের ঝোল।'

'আমাকে আজ অনেক রাঁধতে হয়েছে। ওঁর এক বন্ধু খাবেন তাই মাংসই হয়েছে। তাছাড়া ফুলকপির ডালনা আর আলুর দম।'

হাসিনা অনর্গল বকতে থাকে। গল্প করতে করতে সে হঠাৎ থেমে যায় মাঝখানে। সুলতানার হাতের দিকে চেয়ে থাকে খানিকক্ষণ।

'আপা?'

'কি?'

'তোমার হাতে চুড়ি নেই যে।'

'ও— মানে—'

'ছিঃ। সধবাদের হাতে চুড়ি ছাড়া মানায় না। অন্ততঃ একগাছা করে কাঁচের চুড়িও রাখতে হয়। এটাও কি কিনতে পারো না তোমরা?'

সুলতানা মুখ নীচু করে থাকে।

'উনি এলে কিনে আনতে বলো। আমাকে তো এ-সব বলতেই হয় না---আর বলবই বা কেন? আমাদের যে-সব জিনিস প্রয়োজন তা অমনিই দেবে। কি বল তুমি? আর এ তো সামান্য ক' গাছা কাঁচের চুড়ি।'

সুলতানা কোন কথা বলে না। কিন্তু ওর ভেতরে কে যেন প্রচণ্ড শব্দে আঘাত করতে থাকে। তাড়াতাড়ি ঘরে এসে ঢুকে চোখে কাপড় চেপে ধরে।

নীচের তলা আজকাল ছোট শিশুর কান্নায় মুখরিত হয়ে ওঠে। দুপুরের রোদের মতই কান্না ছোট বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে। রাঁধতে রাঁধতে সুলতানা একবার নীচের দিকে তাকিয়ে দেখে। হাসিনা ছোট মেয়ে নিয়ে বসে আছে উঠোনে। চারদিকে অসংখ্য খেলনা ছড়ান। কাগজের ফুল হাতে নাড়ছে হাসিনা।

সুলতানা নীচে নেমে আসে।

'বড় যে কাঁদছে তোমার মেয়ে?'

'আর বলো না, তিন মাস ধরে মেয়েটা শুধু যেন কান্না ছাড়া আর কিছু জানে না। এত খেলনা দিয়েও থামান যায় না।'

হাসিনার মুখে মাতৃত্বের হাসি প্রতিফলিত হতে থাকে অনবরত। কাগজের ফুল ঘন ঘন নাড়ে।

'এত খেলনা।'

সুলতানা বিস্মিত দৃষ্টি মেলে ধরে খেলনাগুলোর ওপর।

'দামই বা কত। দেড় টাকা দু' টাকা করে একেকটা। ছেলে-মেয়েদের জন্যেই তো আমাদের জীবন, আপা।'

হ্যাঁ। সুলতানা সে-কথা আজ গভীরভাবে বোঝে। তবুও যেন মানতে চায় না কিছুতেই। আবার উঠে আসে নিজের জায়গায়।

দূরের ঘড়িতে তিনটে বাজে। সুলতানা সরে আসে ছোট জানালার কাছে। নীজের ঘর এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। হাসিনা প্রসাধন করছে। চুল বেঁধেছে বিনুনী দিয়ে। হয়ত কালই এক কৌটা নতুন স্নো কিনে এনেছে। কাগজের প্যাকেটটা জানালার এ-পাশে পড়ে রয়েছে। আশ্চর্য হ'ল সুলতানা। এত দামের স্নো মাখে হাসিনা? আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে স্নো মাখছে সে আর সারা মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে হাসিতে। তার পরের ঘটনাও নিখুঁতভাবে জানা হাসিনার। অফিস থেকে ফিরবে সাদেক। হাসিনা হাসিমুখে এগিয়ে গিয়ে ওর হাত ধরে নিয়ে আসবে ঘরের এককোণে। এবং তারপরেই দু'জনে এগিয়ে যাবে ঘরের এককোণে। ঘরের একটি প্রাণ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে টুকরো হাসিতে। না— চোখে পড়েছিল ক'য়েকদিন। এ-সময়ে সুলতানা এদিকের জানালাটা বন্ধ করে দেয়। ম্রিয়মান লজ্জা অবসিত ঠোঁট খানিকক্ষণের জন্যে রক্তিম হয়ে ওঠে।

সন্ধ্যার অন্ধকার একটু পরেই ছড়িয়ে পড়বে ছাদের এপাশে। সুলতানা রান্নাঘরে বসে সে-কথাই ভাবছিল আনমনে। আগামী মাসে খোকার মাইনে না দিতে পারলে নাম কাটা যাবে। অথচ ছেলে-মেয়েদের ঘিরে কত স্বপ্নই দেখেছে সুলতানা। ছেলে বড় হবে। সম্রাটের মত মহীয়ান হয়ে উঠবে তাদের কাছে। সেই সম্রাটের মাইনে না দিতে পারলে তাদের সমস্ত স্বপ্ন আসন্ন অন্ধকারের মধ্যে ঝাপসা হয়ে যাবে।

'আপা।'

হাসিনা মেয়ে কোলে রান্নাঘরে এসে ঢোকে :

'হাসিনা যে! কি মনে করে?'

'মেয়েটাকে খানিকক্ষণের জন্যে রেখে যাব আপনার কাছে। সিনেমায় যাচ্ছি।'

নতুন একটা লাল রঙের শাড়ি পরেছে হাসিনা। নাইলনের স্যাণ্ডেল ঝক্‌ঝক্ করছে। উগ্র প্রসাধন ছড়িয়ে পড়েছে দেহ থেকে। 'বেশ তো।'

সুলতানা হাসিনার মেয়েকে কোলে নেয়।

'আপনার ছেলেমেয়েদের খেতে দেবেন।'

হাসিনা বাটিতে খানিকটা মিষ্টি রেখে দেয় সুলতানার সামনে।

'এসব আবার কেন?'

হাসিনা কোন কথা না বলে নীচে নেমে যায়। মৃদু আলোতে কানের দুল ঝল্‌মল্ করে ওঠে। সুলতানা খুকীকে নিয়ে উঠে পড়ে। সস্নেহে হাত বুলায় তার ভেলভেটের জামার ওপর।

সুলতানা উৎকর্ণ হয়েই ছিল। ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে গিয়েছে। সাইফুর শুয়ে শুয়ে বিড়ি টানছে। নীচে জুতোর শব্দ শুনতেই সুলতানা মেয়ে কোলে উঠে দাঁড়ায়।

'আপা।'

'এই যে ভাই।'

হাসিনা মেয়েকে কোলে নিয়ে আদর করে।

'এত দেরী হ'ল যে।'

'দেরী।'

হাসিনা সুলতানার দিকে চেয়ে হেসে ফেলে।

'সিনেমা দেখে রেস্টুরেন্টে গিয়েছিলাম চা খেতে। বাড়ীতে আর খাব না আজ। ওখানেই কিছু খেয়ে নিয়েছি। যদি যেতে আপা সিনেমায়। এত ভীড় জীবনেও দেখিনি—শেষে ওপরের ক্লাশের টিকিট কাটলাম। তিন টাকা চার আনা করে একজনের।'

হাসিনা কথা বলতে বলতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

'যাই আপা, অনেক কষ্ট দিলাম তোমাকে।'

সুলতানা ঘরে এসে ঢোকে। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে জানালার পাশে। চেয়ে থাকে নীচের দিকে। একটি বদ্ধ জানালার সমস্ত ইতিবৃত্ত সে নিঃশেষে হরণ করতে চায়। ক্লান্তিতে দু'চোখ অত্যন্ত ভারি হয়ে ওঠে তার।

অফিস থেকে ফিরে অবাক হয়ে গেল সাইফুর। নিজের চোখে যেন বিশ্বাসই করতে পারে না প্রথমে। বিয়ের বেনারসী শাড়ী পরে সেজেগুজে বসে রয়েছে সুলতানা। অযত্ন-শিথিল চুলগুলো গোছা করে খোঁপা বেঁধেছে। ছোট একটা গোলাপও গুঁজেছে সেখানে। পরিশ্রান্ত দশটি বছর যেন আজকের বিকেলে পিছিয়ে গিয়েছে।

সুলতানার দিকে সে চেয়ে থাকে খানিকক্ষণ।

সুলতানা তাকে দেখে উঠে পড়ে। নাস্তা এনে দেয়। 'তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও।'

'কিন্তু, আমি যেন নিজের চোখকে বিশ্বাসই করতে পারছিনে সুলতানা। কী ব্যাপার বল তো?'

'কিছুই নয়।'

'এত সাজগোজ কেন?'

'সাজগোজ!' সুলতানার মুখে ব্যঙ্গের হাসি ফুটে ওঠে।

'সিনেমায় যাব। কেন মানুষের মনে কী আমোদ আহ্লাদ কিছুই থাকতে নেই? সংসারের পরিশ্রম করতে করতেই তো জীবন গেল।'

সাইফুর চা খেতে খেতে চোখ তুলে তাকায় তার দিকে।'অন্যায় নয় সুলতানা, বরং সেটা অত্যন্ত স্বাভাবিক?'

সাইফুর এখনও স্মরণ করতে পারে পরজ-বসন্তের কালগুলো। সেদিনের বসন্ত উজ্জ্বল আর প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল? সিনেমা দেখার ভেতর দিয়ে। আত্মীয়দের বাড়ী যাওয়ার নাম করে তারা বেরিয়ে পড়ত বাড়ী থেকে। তারপর ফার্ষ্ট শো সিনেমা দেখে খানিকক্ষণ পার্কের নিভৃতে বসে বাড়ী ফিরত। সে-সব কথা যেন প্রায় ভুলেই গিয়েছিল সে। আজ সিনেমা দেখার মধ্য দিয়ে অতীতকে নতুন করে ফিরে পেল যেন।

'কোন সিনেমায় যাবে?'

'গুলিস্তান।'

সাইফুর অস্ফুট হাসে। কিন্তু কোন কথা বলে না।

দু'জনে নেমে যায় সিঁড়ি বেয়ে। হাসিনা দরজা ভেজিয়ে ওদের দিকে চেয়ে থাকে। একটা কৌতুকের হাসি তার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে।

সাদেককে ডেকে বলে, 'শুনছ?'

'কী?'

'চার ছেলের মা'র সখ দেখ। ড্রেস করে শাড়ি পরে বাইরে যাচ্ছে।'

সাদেক হেসে ওঠে সেদিকে চেয়ে।

সাইফুর আস্তে আস্তে এগোচ্ছিল গলির রাস্তা ধরে। বিড়ি টানতে টানতে ভাবতে থাকে। এবার শীতে একটা পুরনো কোট না কিনলেই চলে না। সেদিন সদরঘাটে পুরনো কোটের দোকানে গিয়ে অনেকগুলো কোট দেখেছিল। একটাকা অগ্রিম দিয়েও এসেছে নিয়ামত মিয়াকে। আগে তাদের অফিসের বেয়ারার ছিল। কোর্টের দোকান করেছে এখন। নীল রঙের কোটটা মন্দ নয়। বিক্রি করতে বারণ করে এক টাকা দিয়েছিল অফিস থেকে ফেরার সময়। ন'টাকা দিলে কোটটা পাওয়া যাবে। আজ বাকী টাকা দিয়ে আসবে। সেজন্যে সমস্ত দিক ভাল করে চিন্তা করে সাইফুর। একটা কোট না হলেই চলে না। সকালে ঠক্ ঠক্ করে অফিসে যাওয়া আর রাতে মুখ গুঁজে বাড়ী আসার সময় শীতে সারা দেহ জমে যায়। তার চেয়ে বরং একটা পুরনো কোটই ভাল। কিন্তু দশ টাকার মাঝ ছাড়া তার পক্ষে সহজ নয়। তাই অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে থাকে।

'আরে, আপনি যে!'

গলির মোড়ে সাইফুরকে দেখে সাদেক দাঁড়িয়ে পড়ে।

'আপনাকে পেয়ে ভালই হ'ল। চলুন, একটু ঘুরে আসি।'

সাইফুরকে নিয়ে সাদেক একটি কাপড়ের দোকানে ঢোকে।

'কোটের একটা কাপড় পছন্দ করুন দেখি।'

সাইফুর বিস্মিত চোখে চেয়েই নিজের বিহ্বল ভাব সরিয়ে ফেলে। অনেকগুলো কাপড় দেখে সাদেক। শেষে বাদামী রঙের একটা কাপড় পছন্দ হয় তার।

'এটা কেমন হবে?'

'ভালই।'

'কত গজ?'

'পঁচিশ টাকা।'

'বেশ দিন।'

সাদেক কাপড় নিয়ে টাকা গুণে দেয়। দু'জনে ফুটপাথে এসে দাঁড়ায়।

'মাইনে পেয়েই কিনে নিলাম কাপড়টা। আর তাছাড়া দরকারও যখন আমার।'

'এত দামের কাপড়!'

সাদেক হাসে।

'দাম আর এমন বেশী কি হ'ল। ক'দিনই বা আছি পৃথিবীতে। যেটুকু পারি জীবনটা আনন্দের মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দিই। তারপর আর দাবী জানাব না কোন কিছুর জন্যে।'

সাদেক রাস্তার মাঝে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে।

'দেখছেন, কী ভুলই না করলাম এতক্ষণ। আপনাকে এক কাপ চা খাওয়ানোর কথাই ভুলে গিয়েছি।'

'না, না চা আর লাগবে না।'

'কি যে বলেন।'

সাদেক সাইফুরকে নিয়ে রেস্টুরেন্টে গিয়ে ঢোকে গল্প করে নিজের চাকরি-জীবন সম্পর্কে। পাটের মিলের কেরানী-জীবন খুবই ভাল লাগে তার। নিজের ইচ্ছানুযায়ী সারাদিন কাজ করতে হয়।

সাইফুরের কানে কোন কিছু যেন ঢোকে না। চায়ের স্বাদ বিস্বাদ ঠেকে আজ বিকেল বেলা। তার চোখের সামনে ভেসে উঠে, বাদামী রঙের একটা কাপড়ের পাশে নীল একটা কাপড়। এক নিশ্বাসে চায়ের পেয়ালা শূন্য করে ফেলে সে।

'উঠি এবার।'

'চলুন না, এক সঙ্গেই রিক্সায় বাড়ি যাওয়া যাক।'

'আমার একটা কাজ রয়েছে অন্য জায়গায়। সেখানে না গেলেই চলবে না।'

'বেশ, যান।'

সাইফুর প্রায় টলতে টলতে রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে আসে। না নীল রঙের পছন্দ করা কোটটা কেনা চলবে না তার। এখনই নিয়ামত মিয়ার কাছ থেকে অগ্রিম টাকাটা চেয়ে আনতে হবে।

রবিবার বাইরের কাজ থাকে না সাইফুরের। সকালে চা খেয়ে পড়াতে বসে ছেলেমেয়েদের। সপ্তাহের একটি দিনেই তার সান্নিধ্য পায় ছেলেমেয়েরা। মনের আনন্দে পড়তে বসে সবাই। সাইফুর চেয়ে চেয়ে দেখে সবাইকে।

'আব্বা।'

বড় ছেলেটা পড়ার ফাঁকে মুখ তুলে তাকায় সাইফুরের দিকে।

'কি খোকন?'

'সন্তুর মত একটা ছোট খেলনা।'

খেলনা! নীচতলার তিন মাসের শিশুর মত একটা খেলনার আবদার জানিয়েছে খোকন।

'আচ্ছা দেব।'

'কবে দেবে?

'কাল।'

'মনে থাকে যেন।'

খোকন খেলনার নামে মনোযোগ দিয়ে পড়তে থাকে।

'আমার জন্যে একটা উড়োজাহাজ।'

'আমাল জন্যে পুতুল।'

সাইফুর কেমন সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। রবিবারের সকালটা বিষণ্ন মনে হয় তার। এতগুলো ছেলেমেয়েদের আবদার মেটাবে কেমন করে?

রান্নাঘরে একমনে রান্না করছে সুলতানা। সাইফুর বিড়ি হাতে করে ঢোকে সেখানে।

'আগুন।'

সুলতানা জ্বলন্ত কাঠ থেকে কয়লা ভেঙে দেয়। সাইফুর বিড়ি টানে জোরে জোরে। সুলতানা তার মুখের দিকে কয়েকবার চেয়ে থাকে।

'আজ বিকেলে বেরুবে নাকি?'

'কেন?'

'একটা স্নো কিনে আনতে। মুখটা বড় চড়চড় করে।'

'আচ্ছা, হবে।'

সাইফুর আর সেখানে বসে না। তাড়াতাড়ি করে নীচে নেমে যায়। আড়-চোখে একবার সাদেকদের ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখে। আড়ার সঙ্গে একটা দোলনা ঝুলছে। আর দূরে দাঁড়িয়ে হাসিনা মৃদু করে দোলনা দোলাচ্ছে আর আপন মনেই হেসে উঠছে। উঠোনে বসে শেভ করছে সাদেক। সাইফুর কোন দিকে আর না তাকিয়ে বের হয়ে পড়ে বাড়ী থেকে।

দুপুরের ক্লান্ত রোদের সঙ্গে সঙ্গে ছোট বাড়ীটাও ঝিমিয়ে পড়েছে। ক্লান্তির বিষণ্নতায় সারা বাড়ী নিঝুম। শুয়ে শুয়ে হাই তুলছিল সুলতানা। দরজায় মৃদু টোকা পড়ে।

'আপা।'

'কে?'

সুলতানা উঠে পড়ে। দরজার ওপাশে হাসিনা দাঁড়িয়ে। হাতে একটা বাঁধান বই। সুলতানাকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে আনন্দে। দু'জনে রান্নাঘরে গিয়ে বসে। হাসিনা হাতের বইখানা খুলে ধরে সুলতানার সামনে।

'একটা হারের ডিজাইন পছন্দ কর না আপা।'

অনেকগুলো ছবি খুলে দেখায় হাসিনা।

'কোন্‌টা ভাল লাগে তোমার?'

সুলতানা নক্‌শাগুলোর ওপর ঝুঁকে পড়ে। কৌতূহল নিয়ে দেখতে থাকে সে।

'চমৎকার তো ডিজাইনগুলো।'

'হু। এদের দোকানের খুব নাম বাজারে।'

শেষে একটা ডিজাইন পছন্দ হয় হাসিনার।

'চলি আপা।'

সুলতানা আবার এসে শোয় বিছানায়। কিন্তু ঘুম আসে না। কেমন একটা ক্লান্তি অনুভব ক'রে সে। হাসিনার হাসিমাখা মুখ কল্পনা করে। কতই বা বয়স হবে তার? হাসিনার চেয়ে পাঁচ-ছ বছরের বেশী নয়। তবুও যেন এর মধ্যেই নি:শেষ হয়ে গিয়েছে তার প্রাণের সম্পদটুকু।

একটা হট্টগোল শুরু হয় নীচে। রান্না করতে করতে বের হয়ে আসে সুলতানা। হাসিনা উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করছে। আর তার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদছে খোকন। সুলতানা বিস্মিত হয়ে নীচে নেমে আসে।

'কী হয়েছে?'

'এই দেখুন আপনার ছেলের কীর্তি। আমার মেয়ের খেলনা চুরি করে পালাচ্ছিল। ছি:! ছি:! এই কী শিক্ষা এদের?'

সুলতানার কান গরম হয়ে ওঠে। খোকনের হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে আনে ঘরে। ঠাস করে ওর গালে একটা চড় বসিয়ে দরজা বন্ধ করে ঘরে আটকে রাখে। রাগে কাঁপতে থাকে সুলতানা। হাসিনার কথার ইঙ্গিতের মধ্যে কোন অস্পষ্টতা নেই। শেষে ছোট হতে হ'ল তার কাছে'?

বাইরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল সাইফুর। বিড়িতে শেষ টান দিয়ে ফেলে দেয় বাইরে। সুলতানা ঘরে ঢুকে ওর সামনে দাঁড়ায় থমথমে মুখে।

'খোকনের একটা খেলনা চাই।'

'খেলনা!'

সাইফুর হাসতে চেষ্টা করে।

'আমাদের ছেলেমেয়েদের খেলনা দেওয়া মানে বিলাসিতা, সুলতানা।'

'তা হোক, কিন্তু একটা চাই।'

সুলতানার স্বরের দৃঢ়তায় চমকে উঠে সাইফুর।

'কি হয়েছে তোমার'?'

'কিছু হয়নি। আর খেলনা না এনে দিলে তোমার ছেলেরা নীচের ঘর থেকে চুরি কবতে শিখবে।'

সাইফুরের কাছে সমস্ত দৃশ্য পরিষ্কার হয়ে যায়। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাবে সে। তারপর তাড়াতাড়ি চলে যায় ঘর থেকে।

সন্ধ্যার নিঃস্তব্ধতা ভেদ করে নীচের ঘর থেকে একটা আর্ত কান্নার স্বর ভেসে আসে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই চমকে ওঠে। পরক্ষণে হাসিনাদের ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। খোকন ডুকরে ডুকরে কাঁদছে একহাতে সেলুলয়েডের একটা এরোপ্লেন চেপে ধরে। হাসিনা বজ্রমুষ্টিতে খোকনের হাত ধরে রয়েছে।

কি হয়েছে'?

'কী হয়নি তাই বলুন। আবার আমার মেয়ের খেলনা চুরি।'

সাইফুরের চোখ দু'টো জ্বালা করে ওঠে। এক লাফ দিয়ে সে খোকনকে ছিনিয়ে এনে ওপরের ঘরে গিয়ে ঢোকে। খোকনের আর্তকান্না সারা বাড়ী তরঙ্গায়িত হতে থাকে। সুলতানা স্থানুর মত বদ্ধ দরজা কপাটে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করে।

খোকনের চোখ-মুখ ফুলে উঠেছে। দেহে অনেক উত্তাপ। সুলতানা পাশে বসে কপালে হাত বুলায় খোকনের তিন দিন একইভাবে সে বসে রয়েছে অসুস্থ খোকনের পাশে। নিজের রঙিন কল্পনা আজ যেন তাকে করতে উদ্যত। সমস্ত সূত্র ছিঁড়ে দেওয়ার ব্যগ্র। সাইফুর কোন কথা না বলে বেরিয়ে যায় বাইরে। খোকনকে ভাল করতে হলে চাই ওষুধ। তার চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে। ডাক্তারের প্রেসক্রিপসন বিদ্রূপ বলে মনে হয়। খানিকক্ষণ বেড়িয়ে আবার ঘরে এসে ঢোকে।

'আমার খেলনা।'

খোকন মৃদুস্বরে উচ্চারণ করেই আবার চোখ বন্ধ করে।

ওরা পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। সাইফুর মাথা নামিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। অফিসের সময় হয়ে গিয়েছে।

কাজ করতে করতে অনবরত আনমনা হয়ে যায় সাইফুর। খোকনের ক্লান্তিপূর্ণ মুখ তার চোখের সামনে বারেবারে ভেসে ওঠে। মনে পড়ে সেলুলয়েডের একটি খেলনার কথা। কতই বা দাম হবে? হয়ত আড়াই টাকা। তবুও আড়াই টাকার খেলনা দিয়ে সে আজ নিজের ছেলেকে খুশী করতে পারছে না।

'চা খাবে নাকি?'

'না।'

মুশতাক সাইফুরের দিকে চেয়ে থাকে মাঝে মাঝে।

'ছেলের অবস্থা কেমন?'

'বিশেষ ভাল নয়।'

সাইফুরের দু'পাশে অসংখ্য নোটের বাণ্ডিল। গুণে গুণে পাশে সরিয়ে রাখে। আজ সেদিকে অপলক নয়নে তাকায় সে। মানুষের জীবনে টাকার স্থান সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকে। একটা এলোমেলো চিন্তা। কপালের দু'পাশে ঘাম জমে যায়। কেমন একটা নিঃসীম ক্লান্তি অনুভব করে যেন।

নগরের বুকে বৈদ্যুতিক আলোর প্রবাহ ছড়িয়ে পড়েছে। অন্ধকারের ফাঁকে ফাঁকে আলোর রেখা প্রতিভাসিত হয়ে ক্লান্তির অস্তিত্ব মুছিয়ে দিতে চায়। সাইফুর বড় ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে থাকে। দূরে দেখা যাচ্ছে বড় বড় ষ্টেশনারী দোকানগুলো। তাদের একটির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। শো-কেসে সাজান জিনিস দেখতে থাকে। হঠাৎ সেলুলয়েডের এরোপ্লেনের ওপর চোখ পড়ে তার। তাড়াতাড়ি করে দোকানে ঢুকে পড়ে। এরোপ্লেন কেনে অনেকগুলো। সব ছেলে-মেয়েদের একটা করে দেবে। তারপর একটা স্নো আর পাউডার কেনে। কাউকেই বঞ্চিত করবে না সে। দোকানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে লাল রঙের একটা শাড়ির দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়াল আবার। সুলতানাকে কেমন মানাবে?

দু'হাতে জিনিস নিয়ে ঘরে ঢোকে সাইফুর। সুলতানা তার দিকে চেয়ে অবাক হয়ে যায়। ছেলেমেয়েরা ছুটে আসে।

'আমাদের খেলনা আব্বা।'

সাইফুর সবার মধ্যে খেলনাগুলো ভাগ করে দিয়ে সুলতানাকে ডেকে একপাশে নিয়ে যায়।

'এত সব কিনলে কেমন করে?'

'সে-কথা পরে। কোনদিন তোমাকে কোন উপহার দিতে পারিনি সুলতানা। তোমার ইচ্ছা মনের মধ্যেই মরে গিয়েছে সবার অলক্ষিতে। আজ বাধা দিও না আমাকে।'

সুলতানার হাতে সাইফুর লাল শাড়ি, স্নো আর পাউডার তুলে দেয়।

'শাড়িখানা পর, তোমাকে এই বেশে নতুন করে আজ আবার দেখতে চাই।'

সাইফুর আস্তে আস্তে বাইরে এসে দাঁড়ায়। এখান থেকে রাজপথের উজ্জ্বল আলো দেখা যায় না। অন্ধকারের একচ্ছত্র অধিকারের মধ্যে আলোর কোন প্রবেশ-পথ নেই। সাইফুর একটা দীর্ঘ নি:শ্বাস ফেলে।

রুগ্ন খোকনের শয্যার পাশে এসে দাঁড়ায় সাইফুর। শিয়রে বসে ওর কপালে হাত বুলিয়ে মৃদুস্বরে ডাকতে থাকে, 'খোকন তোমার খেলনা এনেছি বাবা।'

খোকনের ঠোঁট মৃদু নড়ে ওঠে। সাইফুর ওর শীর্ণ হাতে খেলনা তুলে দেয়। সুলতানা আস্তে আস্তে পাশে এসে দাঁড়ায়।

'আজ এত তাড়াতাড়ি এলে যে!'

সাইফুর যেন চমকে ওঠে। উঠে দাঁড়ায় সে। চেয়ে দেখে অনেকক্ষণ। এই বেশেই জীবনের একটি রাত উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত দীপ্তিমান হ'য়ে উঠেছিল। ছেলেমেয়েদের হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে একবার তাকিয়ে, সবার অলক্ষ্যে বাইরে এসে দাঁড়াল সাইফুর।■

দ্বিতীয় দুর্গ

চট দিয়ে ঘেরা হয়েছিল চুলোর চারদিক। আগে বেড়া ছিল। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে ক্রমে ক্রমে সে বেড়া ক্ষয়ে গেছে। সুরতজান নিজের চোখেই উপলব্ধি করেছে ক্ষয়ে যাওয়ার ইতিহাস। প্রথম প্রথম ছেঁড়া কাগজ দিয়ে বেড়ার ফাঁকগুলো বন্ধ করত। একদিন দেখল তাও আর করা যায় না। বেড়ার ভগ্নাংশগুলো ছেঁড়া কাগজ দিয়ে ভরা চলে না। শেষে গোটা একটা কাগজই টাঙিয়ে দিত। একবার কালবৈশাখীর ঝড়ে সে অবকাশও আর রইল না। উপায় না দেখে সুরতজান মটমট করে বেড়ার কঞ্চিগুলো ভেঙে চট ঝুলিয়ে দিল, তারপর হতে চটই ঝুলছে। বৃষ্টির সময় চটের গায়ে ঝাপটা লাগে। বাতাস হলে ভারি চট দুলতে থাকে। কিন্তু প্রকৃতি এগুলোর বুকেও নিজের বিজয় চিহ্ন এঁকে দিতে ভুল করেনি। চটের একদিকে একটা বড় ফুটো হয়ে গেছে। আর সেখান দিয়েই রোদ এসে পড়েছিল ভেতরে। রোদের তাপ বাড়লে এই অল্প রোদই অসহ্য লাগবে তার। কেননা, সূর্য তখন বেঁকে যাবে একদিকে আর রোদ এসে পড়বে সুরতজানের কপালে। আস্তে আস্তে গালের একদিক গরম হয়ে উঠবে।

সূর্য এখনো বাঁকা হয়নি। উত্তপ্ত রোদ এসে পড়বে সুরতজানের গালের একদিকে। কিন্তু সুরতজান উষ্ণ হয়ে উঠেছিল আর এক সূর্যের রোদে। তার বিরক্তি লাগে এই ভেবে যে আকাশের সূর্যটাকে অনায়াসেই প্রতিরোধ করা যায় চটের ফুটোতে একটা কাগজ গুঁজে। কিন্তু এই সূর্যটাকে কোন মতেই বাধা দেওয়া যায় না। আত্মগোপন করলেও তার রোদ এসে পড়বে দেহের মধ্যে। যেমন উষ্ণ তেমনি চিটচিটে। হাজার বার পাখা করলেও গরম যায় না। যেন বেশী করে আরও ঘাম বের হয় দেহ থেকে।

সুরতজান বড়া ভাজছিল। চালের কুমড়ো গাছে কতকগুলো ফুল ধরেছে। তারই একটা ছিঁড়ে কতকগুলো বড়া তৈরী করছে। অনেক দিনের জমান খানিকটা চর্বি ছিল। সেবার ঈদে ফুফু আম্মা অনেক মাংস দিয়েছিল। চর্বিগুলো জমিয়ে রেখেছিল সে। কুমড়োর ফুল দেখে হঠাৎ মনে পড়ে গেল জমান চর্বির কথা। তারপরই বড়া তৈরী করতে শুরু করেছে সকাল থেকে। কিন্তু তখন থেকেই পেছনে লেগেছে রহমত। ঘ্যান ঘ্যান করতে শুরু করেছে। প্রথমে এসেছিল বক ধার্মিকের মত ভাব নিয়েই। সুরতজান কুমড়োর ফুল ছিঁড়ে রাখছিল একে একে।

হাতে একটা লম্বা বিড়ি নিয়ে রহমত আস্তে আস্তে এগিয়ে এল চুলোর কাছে.

'আখা ধরাইছ নাহি?'

'হ।'

তার দিকে না তাকিয়েই আপন মনে কাজ করতে করতে জবাব দিল সুরতজান।

রহমত বিড়ি ধরিয়ে দু'তিনবার টান দিয়ে সুরতজানের পাশে এসে দাঁড়াল। মুখ থেকে বিড়িটা নামিয়ে দু আঙুলের মধ্যে চেপে ধরে সুরতজানের দিকে তাকাতে লাগল বড় বড় চোখে।

'এই বিড়িডা দ্যাখতেছ না, সুরত! হেই যে! পলাশপুরের মিঞাভাইয়ের দোকানের বিড়ি। বড় নাম এই বিড়ির। সাত গেরামের লোক এই বিড়ির জন্যি পাগল। বুজঝনি!

সুরতজান বুঝল কি-না তার হাব-ভাব দেখে তা বিন্দুমাত্র বোঝা গেল না। আগের মতই নিজের কাজ করতে লাগল। রহমত তার ঔদাসীন্যে মুখটা একটু বেকাল। তারপর তার পাশে খানিকটা এগিয়ে এসে পিঠের ওপর নিজের হাত রাখল।

'একডা কথা কইবার লগে আইছি–'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই সুরতজান মুখ তুলে তাকিয়ে একবার রহমতের সর্বাঙ্গ দেখে নিল।

'একডা কেন, হাজারডা কও না কেনে, আমার কোন আপত্তি নাই। শুধু তার আগে কইয়া দিই ট্যাহার কথা তুইলো না। তুললেও কোন লাভ অইব না। সাদাসিদা কথা আমার। মনে থাহে যেন।–'

সুরতজানের কথায় এক মুহূর্তে–বেলুনের মত চুপষে গেল রহমত। প্রথমে কোন কথাই বলতে পারল না। এত সহজে সুরতজান তাকে ধরে ফেলবে' তা ভাবতে পারেনি। খানিকক্ষণ চুপ করে রইল নতুন পরিকল্পনার জন্যে। কিন্তু মনে যেন কোন কিছুই এল না। আধপোড়া বিড়িটা দাওয়ার একপাশে ফেলে দিল অবশেষে নিরুপায়ের মত।

'কামে যাইব না নাহি?'

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে অবশেষে নিজেই প্রশ্ন করল সুরতজান। আর অনেকক্ষণের বন্ধ আবহাওয়া বের হওয়ার পথ পেয়ে খানিকটা সুস্থ হল। সেই সঙ্গে আশার একটা আলোও দেখতে পেল সে।

'যাইব ত। কিন্তুক—'

'কিন্তু কী?'

'কয়ডা ট্যাহা অইলে কতকগুলান নিব কিনতে পারতাম। বাজারে এবার আমরিকা থাইকা নতুন নিবের চালান আইছে। কারবারের কথা কী বোঝবা তোমরা। শুধু ভাব বাহানা কইরা ট্যাহা চাই। কমু আর কী! এ কথাডা কিছুতেই বোঝবারে চাও না যে দু' দিনেই হগ্‌গল নিব শেষ অইয়া যাইব। আর ইয়ার মধ্যে কিছু কিনবার না পারলে কারবারে লাল বাতি জ্বলব। এক্কেবারে ফর্সা অইয়া যাইব তখন আমাগো দিনগুলান! এমনিতেই দিন চলব তহন। কারবার কইরা লাভ কি'?

বক্তৃতা করে একপাশে হেলান দিয়ে বসল রহমত। একটানা বক্তৃতা তার পক্ষে নতুন নয়। নিব বেচতে গিয়ে এমন অনেক কথা বলতে হয় তাকে। গ্রামের শিক্ষিত মানুষগুলো বুঝতে পারে না। আর না পারার কারণও আছে। শহরে গিয়ে গিয়ে ব্যবসা এবং বাক্‌চাতুরীতে পাকা হয়ে উঠেছে সে। গ্রামে কলমের ব্যবসা ভালই চলে। নতুন পড় য়া আর শৌখিন লোকদের কাছে কলম লোভনীয় জিনিস। শহর থেকে কিনে এনে গ্রামে গ্রামে ফেরি করে রহমত। স্কুলের সামনে বসে থাকে পসরা সাজিয়ে। লাল নীল আর সবুজ কলমগুলো চিক চিক করতে থাকে।

খরিদ্দাররা যেমন তার কথাগুলো শোনে সুরতজানও তেমনি শুনল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, হেই দিন না ট্যাহা নিয়া কতকগুলান নিব কিনলে'?'

'হ, কিনছিই ত! একী আমি অস্বীকার করবার চাইছি? ইয়ার মইধ্যে একডা কিন্তুক আছে। হেই নিবগুলো জারমানী। আমরিকান নয়। আজকাল আমরিকান নিবের বড় চাহিদা। আর হেই সময় কিইন্যা রাখলে বরষা কালে সুবিধা অইব। কাদা-পানি ভাঙা শহরে যাইবার লাগব না। কিছু ট্যাহা বাঁচব—আর গেরামেও লাভ অইব।'

সুরতজান কোন কথা বলল না। কেন্ যেন সে রহমতের কথা বিশ্বাস করতে পারল না। রহমত চেষ্টা করল তাকে বুঝাতে। কিন্তু তার ভেতরে প্রবেশ করতে পারল না গভীর বাধা অতিক্রম করে। আধপোড়া বিড়িটা আবার ধরিয়ে উঠে গেল সেখান থেকে। পায়চারি করতে লাগল ছোট আঙিনার ওপর। সুরতজান একবার চটের ফুটোর মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে দেখল। রহমতের পা দুটো কেমন অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। ঠোঁটের আগায় বিসর্পিল একটা হাসি খেলে গেল তার। একপাশে সরে এসে বসল। যেন বাইরে থেকে তাকে দেখতে পায় না রহমত।

একটু পরেই আবার এল রহমত। এবার তার মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়েছে। আগের মত গাম্ভীর্যের প্রলেপ নেই। তার দিকে তাকিয়ে সুরতজান অত্যন্ত অবাক হ'ল। এত তাড়াতাড়ি তার মধ্যে এমন কী পরিবর্তন ঘটল তা বুঝতে পারল না সে।

রহমত তার পাশে বসে পড়ল পা ছড়িয়ে। হাসল সুরতজানের দিকে তাকিয়ে।

'কী অইল'? অমন হাসত্যাছ কেন?'

'আরে একডা বড় খবর আছিল। এক্কেবারে ভুইল্যা গেছিলাম। কী যে মন অইছে! তুমিই না চটাইয়া দিলে? আমার কি দোষ?'

সুরতজান তার দিকে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

'কাল হাতিমগঞ্জর পাশ দিয়া চলতাছিলাম লটবহর লইয়া। এমন সময় হেই বড় আম গাছডার নীচে নজর পড়ল। দেহি পীর সাহেব আবার আস্তানা গাড়ছেন। চারদিকে অনেকগুলান লোক ভিড় কইরা ঘিরা রইছে তাঁরে।'

হাতিমগঞ্জের পীর সাহেবের নাম শুনে কান খাড়া করে রইল সুরতজান। এত দিন পর তাহলে তাঁর দয়া হয়েছে! আবার এসেছেন হাতিমগঞ্জে! তাঁরই জন্যে দীর্ঘ তিন বছর ধরে অপেক্ষা করে রয়েছে সে। পীর সাহেবের পানিপড়া খেয়ে সেবার সে যমের দুয়ার থেকে বেঁচে উঠেছিল। তারপরই খালেদা ভাবীর ঘটনা মনে পড়ল। পীর সাহেবের পানিপড়া খেয়ে খালেদা ভাবীর ছেলে হয়েছে। অথচ অনেক ঔষধ খেয়েছিল, কোন কাজ হয়নি। তার কথা শুনে সুরতজানও চেষ্টা করেছিল সেখানে যেতে। যেদিন সে গিয়েছিল তার আগের দিনই পীর সাহেব গঞ্জ ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছিলেন। তারপর থেকেই রহমতকে বলে রেখেছে তিনি এলে তাঁর খবর নেওয়ার জন্যে।

সুরতজানের মুখখানা হঠাৎ আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। উত্তেজনায় কোন কথাই বলতে পারল না। চুলোর ওপরকার বড়াগুলো পুড়ে গিয়ে কালচে হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি করে সেগুলো নামিয়ে রাখল সে।

'হাচা কইচ?'

'তাইলে তুমিই না হয় খবর নাও।'

'না, না এমনি জিগাইছি।'

আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে সুরতজান। রহমতের বিস্রস্ত চুলগুলো নেড়ে দেয় একবার। পরক্ষণে ঘরের ভেতরে ঢুকে যায়। বাইরে এসে রহমতের দিকে একটা দশ টাকার নোট বাড়িয়ে দিয়ে বলে। নাও, আমরিকান নিব কিনবা। আর হাঁ, আজ একবার ভাল কইরা খবর নিও পীর সাহেবের।'

'আইচ্ছা। আমি ত গঞ্জর রাস্তা দিয়াই শহরে নিব কিনবার যাব। হেইখানে একবার দেখা করব পীর সাহেবের লগে।'

রহমত চলে গেল। আর সুরতজান কুমড়োর গাছ থেকে আরও দুটো কুমড়োর ফুল ছিঁড়ে নিয়ে এল। আরও ত কতকগুলো ফুল রইল। তাতেই যথেষ্ট। মুখখানা লাল হয়ে ওঠে। আর, তার নিজের মধ্যেই এবার ফুল হবে। জন্ম নেবে শিশু। আর ভাবতে পারে না সুরতজান। হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে চুপ করে বসে রইল সে।

ঝিঁঝিঁ পোকার অবিশ্রান্ত একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। অন্ধকারের মধ্যে এই শব্দই যেন একমাত্র জেগে রয়েছে। কোলাহল থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শব্দ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঘরের মধ্যে বসে কান পেতে শুনতে চেষ্টা করে পদধ্বনির শব্দ। মাঝে মাঝে সামান্য শব্দ হতেই চমকে ওঠে সুরতজান। দরজার কপাট ঠেলে বাইরে এসে একবার উঁকি দিয়ে যায়। না, কোথাও কিছু নেই। এখনো আসেনি রহমত। কখন সে আসবে সে-ই জানে। কুয়াশার মতই অস্পষ্ট তার আসা-যাওয়ার সময়। কখনো দূর থেকে কুকুরের ডাক শোনা যায়। উৎকর্ণ হয়ে ওঠে সুরতজান। কেউ হয়ত আসছে মাঠ পেরিয়ে। আচম্বিতে দেখে কুকুর চীৎকার করে উঠেছে। এমন সময় বাইরে খুট করে একটা শব্দ হয। সুরতজান উঠে বসে। একবার আর ভুল নয়। রহমতই এসেছে।

'এত দেরী অইল যে?'

'অইব না। হগ্গল কথাই কইছি তোমারে। যা ভিড় গাছতলায়। কত লোক আইত্যাছে যাইত্যাছে। দরশন পাওয়াই দায়। বহুত কষ্টে যাইবার পারছি উনার কাছে। হেইখানেই না এত দেরী অইয়া গেল। হুধু হুড়াহুড়ি, ঠেলাঠেলি।'

থেমে নিশ্বাস নিতে লাগল রহমত।

'কথা অইছে কোন?'

'হ, হ অইছে। সব কথাই আভাসে জানাইছি তেনারে। উনি তোমারে যাইতে কইছেন। দেইখ্যা হুইন্যা পানিপড়া আর তাবিজ দিবেন তোমারে।'

সুরতজান খুশী হয়ে ওঠে, 'থাক, কাইল আবার অইব এ-সব কথা। অনেক রাত্তির অইছে। তুমি খাওয়া লও।'

'তেমন খিদা নাই আইজ। মনে করত্যাছি খাইব না।'

না, না তা অইব না। আমি আমাগো কুমড়া গাছের ফুল তুইল্যা বড়া ভাজছি চর্বি দিয়া। হেই যে, ঈদের সমরকার গোস্তের। তোমারে কইতে অইবে কেমন অইছে। আমি কোন কথা হুনুম না।'

রহমতের আর প্রতিবাদ করার ইচ্ছা হল না। সুরতজান ভাত বাড়তে লাগল।

'পা ধুইয়া আও না। বাইরে পানি রাখছি বদনায় ভইরা।'

তার দিকে চেয়ে বলতে লাগল সুরতজান।

রহমত শার্টটা খুলে বাইরে গিয়ে পা ধুয়ে এল।

কিছুতেই ঘুম আসছিল না সুরতজানের। বারে বারে মনে পড়ছিল পীর সাহেবের কথা। কালই সে যাবে সেখানে। তারপর ঘটি করে নিয়ে আসবে পানিপড়া। যে পানিপড়া খেয়ে তার সমস্ত অভাব ঘুচে যাবে। নতুন জীবন পাবে সে। স্বামীর ভালবাসার জন্যে কাঙালের মত চেয়ে থাকতে হবে না। বরং তার স্বামীই তার পানে এসে দাঁড়াবে। তার কোলের ছেলের দিকে তাকিয়ে হাসবে

মুখের দিকে চেয়ে। বাজার থেকে কারবারের শেষে কিনে আনবে ঝুমঝুমি, কাগজের রঙিন ফুল আর তার জন্যে কানের দুল। কাচ বসান। তখন হয়ত তার স্বামী ভুলে যাবে তার কথা। যার কথা প্রায়ই সে শোনে অনেকের মুখে। সেখানে রহমত যায় প্রতিদিন। জিনিসপত্র কিনে দেয়। নামও শুনেছিল মেয়েটার তফুরণ। তফুরণ কি তার চেয়েও দেখতে ভাল? হয়ত নয়। আর যদি এখন ভাল হয়ে থাকে তাহলে ছেলে-হওয়ার পর তার সঙ্গে তফুরণের কোন তুলনাই হবে না। তফুরণ তখন খড়ের মত খসখসে। তখনও কি রহমত তার কাছে যাবে? মায়ার মত পেছন পেছন ঘুরবে? না, কখনই নয়। এ হতেই পারে না। স্বামীর প্রতি একটা অপত্য স্নেহ অনুভব করল সুরতজান। চেয়ে দেখল রহমত ঘুমুচ্ছে আর নাকের ভেতর থেকে একটা ঘর ঘর শব্দ হচ্ছে। পরম আদরে সুরতজান তার পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। তার মুখের কাছে নিজের মুখখানা স্থাপন করে। আহা! কী যাদুই না করেছে তফুরণ! মায়াবিনী! ডাইনী! না হলে আবার এমন হয়! সুরতজান পরম আবেশে চোখ বন্ধ করতে চায়। চোখ বন্ধ করার উপক্রম করতেই তার দৃষ্টি পড়ে রহমতের ছোট বাণ্ডিলটার দিকে। কোন জিনিসের খানিকটা লাল অংশ দেখা যাচ্ছে। কী ব্যাপার? কৌতূহলী হয়ে বিছানা থেকে উঠে এক পা এক পা করে সে দিকে এগিয়ে গেল সে। বাণ্ডিলের বাঁধুনী খুলতেই অবাক হয়ে গেল সুরতজান। একটা লাল পেড়ে শাড়ি। সেদিক তাকাতেই তার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আগের মত গিট দিয়ে আবার এক পা এক পা করে পেছনে ফিরে বিছানায় এসে শুল সে। নিজের বালিশটা রহমতের বালিশের কাছ থেকে কানিকটা দূরে সরিয়ে নিল।

কাজে বেরুবার আগে রহমত তার ছোট পুঁটলিটা ভাল করে বেঁধে নিচ্ছিল। এমন সময় নিঃশব্দে সেখানে এসে দাঁড়াল সুরতজান। রহমতের কাজ দেখতে লাগল এক দৃষ্টিতে। পাশ ফিরতেই রহমতের চোখ পড়ল তার দিকে।

'পীর সাহেবের কাছে কাইল লইয়্যা যাইব তোমারে। হাঁঝের বেলা ঠিক অইয়া থিকো।'

'হুঁ।'

'দেরী কইরো না। আমি আইয়াই নিয়া যামু।'

'হুঁ।'

'আইজ শহরে যাইব পসরা নিয়া। কয়েকজন আমরিকান নিবের লাইগা বইল্যা রাখছে অনেক দিন থিক্যা। দিতে অইব তাদের।'

'হুঁ।'

রহমত এবার মুখ তুলে তাকাল সুরতজানের দিকে। মুখটা যেন থম থম করছে তার কোন অজ্ঞাত 'কারণে।

'হুঁ হুঁ করত্যাছ ক্যান?'

সুরতজান এবার কোন কথা বলল না। রহমত বোঁচকা তুলে নিল।

'যাই তাইলে।'

সুরতজান তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো তার দিকে। যেন কোন কিছু অনুসন্ধান করছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সাহায্যে। রহমত কেন যেন থতমত খেয়ে গেল। সুরতজান তার দিকে পাঁচ টাকার একটা নোট বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নাও শেমিজ কিইন্যা দিও তারে। এটাই বা বাকী থাহে ক্যান।'

রহমতের মুখখানা হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেল রোদ কমে যাওয়া আকাশের মত।

'ই-ই-মানে, ভুল বুইঝ না আমারে সুরতজান। ই-ডা, মানে, তুমি কারবারের কতা ঠিক বুঝবা না।'

সুরতজান তার কথা শোনার জন্যে সেখানে না দাঁড়িয়ে চলে গেল ঘরের মধ্যে। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল রহমত। তারপর ত্রস্ত পদে বেড়িয়ে পড়ল রাস্তায়। তফুরণ হয়ত এখন অপেক্ষা করছে তার পথের দিকে তাকিয়ে। বারে বারে এসে দাঁড়াচ্ছে ছোট জানালার পাশে।

ছোট দাওয়ার ওপর বসে একমনে কাজ করে চলে রহমত। পুরানো নিবগুলো ঘষতে থাকে। তারপর চোখের সামনে তুলে একবার পরীক্ষা করে আবার রেখে দেয় ছোট টিনের বাক্সের মধ্যে। সুরতজানও তার হাবভাব দেখে কম আশ্চর্য হয়নি। এমনভাবে নিবিড় হয়ে তাকে কাজ করতে দেখা এই প্রথম। কিন্তু কোন কথা বলে না। রহমতের ওপর থেকে রাগ যায় তার। লাল পেড়ে শাড়ির কথা কোন ক্রমেই ভুলতে পারে না সে। চোখ বন্ধ করলেই টকটকে লাল রঙের শাড়ির পাড় তার চোখের সামনে ভাসতে থাকে তখন অসহ্য লাগে। সহ্য করা একান্ত কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু তবুও সহ্য করতে হয়। কোন উপায় নেই। অসহায় সে। অবহেলাকে অবহেলা ফিরিয়ে দেওয়ার মত ক্ষমতা নেই। তাই অক্ষমতা মেনে নিয়েছে। কিন্তু তবুও অবাক হয়। বিরক্ত হয় একমনে কাজ করতে দেখে। রহমত নিজেই দিন প্রকাশ করল সব কথা।

সুরতজান চুলোর কাছে বসে ভাতে কাঠি দিচ্ছিল রহমত এগিয়ে এল। সেই লম্বা বিড়ি নিয়ে।

'আগুন দাও দেহি একটু।'

সুরতজান পাটকাঠি ভেঙে আগুন দিল।

তোমার জন্যে ক'দিন কাম করতে অইতেছে আমার। অবশ্যি তার লাইগ্যা আমার কোন দুঃখ নাই। দুঃখু একডাই–সব সময়ে তুমি ভুল বোঝ আমারে। তাই এবার পরমাণ করব। শহরে হাজী জহুরীরে বইল্যা আইছি। দু'চার দিনের মইধ্যেই

তোমার হার দিতে পারব। ইয়ার লাইগ্যাই এত কাম। পুরানো নিবগুলান ঠিক কইর‍্যা বিক্রি করবার চাই।'

সুরতজান কোন কথা বলল না। কেবল বুকের ভেতরকার স্পন্দন বেড়ে গেল আগের চেয়ে।

'মানুষের দেখাইও হার ছড়াডা। কলম সাহেব কইলেই হুধু অয়না। এমন হার করাইত্যাছি, দেখবা–কলম সাহেবের নাম চিরকাল থাকব এই গেরামে।'

সুরতজান আগের মত মুখ নীচু করেই থাকে। রহমত তার দিকে একবার তাকিয়ে আবার চলে যায় নিজের জায়গায়। ঘষতে থাকে পুরনো নিবগুলো। তারপর চোখের সামনে তুলে ধরে পরীক্ষা করে দেখে। উজ্জ্বল নিবের সঙ্গে কাগজের ছোট একটা প্যাকেট ওঠে। অনেকগুলো দশ টাকার নোটে ভর্তি। আর সে নোটগুলোকে ঘিরে রয়েছে একজন নারীর শ্যেন দৃষ্টি। যেন প্রেত পাহারা দিচ্ছে। নিজের ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্যে কতদিন টাকাগুলো চেয়েছে রহমত, সুরতজান তার কথা কানেও আনেনি। সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত সে। নির্বিকার। নিজের পৈতৃক সম্পত্তির ওপর অন্য কারুর দাবী নেই। রহমতও তাই জোর করতে পারেনি। জোর করার ফল ভাল করেই জানত।

তফুরণের কথা মনে পড়ে তার। আর মুগ্ধ হয়ে পড়ে। দু'জনের সঙ্গে বিরাট একটা পার্থক্য। একজন চেনে শুধু পৈত্রিক অর্থ। পৃথিবীর সবকিছুই তার কাছে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে ছোট একটি খামের মধ্যে। তাছাড়া আর কিছু চেনে না সে। রহমতের মনে পড়ে গরমকালের দিনগুলোর কথা। যখন কেনা-বেচা প্রায় হতই না, একবেলা উপোস করে থাকতে হত, তখন সুরতজান তার অর্থে হাত দেয়নি। নিবগুলো ঘষতে ঘষতে রহমতের আঙুলগুলো এক সময় শিথিল হয়ে যায়।

কলম আর নিবের কারবার আশেপাশের প্রায় সব গ্রামগুলোতেই করে সে। মাথায় ছোট পসরা চাপিয়ে হেঁটে যায় মাঠের মাঝখানের সরু রাস্তা দিয়ে। নীলডাঙায় ব্যবসা সবচেয়ে ভাল চলে তার। প্রায়ই সে সেখানে যায়। দিনটা তার এখনো মনে আছে। শনিবার। নিব আর কলম বিক্রি করে ক্লান্ত হয়ে হাঁটছিল। পরিষ্কার একটা মাটির ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। লাল পেড়ে শাড়ি পড়ে একজন মেয়ে পানি তুলছিল কূয়ো থেকে। সেখানে গিয়ে দাঁড়াল রহমত।

'একটুখানি পানি দিবেন।'

মেয়েটি তার দিকে একবার তাকিয়ে পানি ঢেলে দিল বালতি থেকে।

তারপর প্রায়ই দেখা হ'ত। রহমত তার কলমের গল্প বলত। আর সে উৎকর্ণ হয়ে শুনত। গল্প বলার সময়ে একদিন রহমত তার হাত চেপে ধরল।

'তফুরণ।'

মৃদু কেঁপে উঠল তফুরণ।

'কেউ আইয়া পড়বে। ছাইড়া দাও।'

'না। আমি ছাড় ম না। চিরকাল এমনি কইর‍্যা ধইর‍্যা রাখুম।'

'রাখ না। মানা করত্যাছে কে?'

তফুরণের মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। আর সেখানে সে থাকেনি।

প্রায়ই আসত রহমত। কারবার শেষ করে ঘুরে যেত নীলডাঙার ছোট একটি ঘর।

'আর কতদিন অপেক্ষা কুরুম, কও। আর যে পারি না আমি।'

তফুরণ রহমতের বুকে মাথা রেখে বলেছিল।

মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছিল রহমত।

'আর বেশী দেরী নাই। শিগ্‌গীর একটা বিহিত করত্যাছি।'

তফুরণ সান্ত্বনা পেয়েছিল। অন্ততঃ ঘামে ভেজা শার্টের ওপর মুখ রেখে আনন্দ অনুভব করেছিল। যা অভাবিত। অনাস্বাদিত। সম্পূর্ণ নতুন তার কাছে।

রহমত ভাবে। নিবগুলোর মধ্যে থেকে তফুরণের মুখখানা যেন স্পষ্ট দেখা যায়।

ঘুম আসছিল না সুরতজানের। খানিকটা কৌতূহলে আর বাকিটা হার পাওয়ার কামনায়। একে একে অনেক কথা মনে পড়ছে তার। কী ভুলই না করেছে সে। অবিচার করেছে রহমতকে। তাকে অস্পষ্টভাবে বিচার করে নিজেই ঠকেছে প্রতিনিয়ত। হৃদয়ের অশান্তি ক্রমশই বেড়ে গেছে।

রহমত এসে ঢুকল ঘরে। তার মুখেও হাসির ছটা। এসে সুরতজানের দিকে তাকিয়ে বিছানার একপাশে বসে পড়ল।

'হুইয়া পড়ছ ইয়ার মধ্যেই।

'না।' উঠে বসল সুরতজান।

পকেট থেকে ছোট একটা বাক্স বের করল রহমত। হেরিকেনের অল্প আলোতে ভেতরের হারটা চিক চিক করে উঠল।

'আও দেহি এইহানে।'

রহমত এগিয়ে গিয়ে সুরতজানের গলায় হারটা পরিয়ে দিল। গর্বে সুরতজানের এতদিনের শূন্য বুক ভরে গেল। যেন আর কোন অভাবই নেই, নেই কোন শূন্যতা।

'পছন্দ অইছে?'

সুরতজান হাসল।

চমৎকার হারটা। কলমের নিবের মত কাটাকাটা। রহমতের পছন্দ মত উপহার। তার ব্যবসায়ের প্রতীক।

'তুইল্যা রাখ পোটমানে। সোনার জিনিস–কহন কী অয় কওয়া যায় না। চল দেহি, রাইখ্যা দিই।'

সুরতজানের চোখের সামনে থেকে ধীরে ধীরে একটা কালো পর্দা সরে গেল। কত পরিশ্রম করেই না দিনের পর দিন টাকা জমিয়েছে রহমত! আশ্চর্য! লোকটা এত ভালবাসে তাকে।

সুরতজান চাবিটা খুলে দিল আঁচল থেকে।

'রাইখ্যা দাও তুমি।'

'তুমিও আইস, দেইখ্যা যাও। হেষে কইবা ট্যাহা নিছি তোমার অলক্ষিতে।'

'ছি।'

সুরতজান জিভ কাটল। অবশ্য সেখানে দাঁড়িয়েই রইল আগের মত।

রহমত পোটমান খুলে ফেলল। চাবি হাতে নিয়ে সে ভাবল কত দিনের আকাঙ্ক্ষা তার এই চাবিটা পাওয়ার। অথচ আজ কত সহজভাবে এসে পড়েছে হাতের মুঠোর মধ্যে। ঠোঁটের প্রান্তে একটা হাসি খেলে গেল। অনেকগুলো শাড়ি সাজান পর পর। সেগুলো তুলে ফেলল রহমত। টাকা ভরা খামটা দেখা গেল সেখানে।

'ইয়ার উপরেই তোমার হারডা রাইখ্যা দিই। কী কও? দামী জিনিস ত।' সুরতজান মাথা নাড়ল।

টাকার খামের ওপর সযত্নে হার রেখে দিল রহমত।

বাজার থেকে ভাল মাছ আনিয়েছিল সুরতজান। নিজে বসে আজ খাওয়াল রহমতকে। খাওয়া শেষ করে রহমত শার্টটা গায়ে দিল। স্যান্ডেলটা পরল। এখনই সে যে আবার বাইরে যাবে তা ভাবতে পারেনি সুরতজান।

'বাইরে যাও নাহি?'

বিস্মিত হয়েই জিজ্ঞেস করল সে।

'হ। একডা জরুরী কাম আছে।'

'আইবা কহন?'

'দেরী অইব একডু।'

রহমত বাইরে এসে দাঁড়াল। লম্বা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগল তাড়াতাড়ি। অনেক দূর গিয়ে হঠাৎ পথের এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল সে। হাসি পেল তার। পকেটে হাত ঢুকাতেই একটা মোটা খামে হাত লাগল। ধীরে ধীরে খামটা বের করে মুখটা একটু খুলল। না। ঠিকই আছে। দশ টাকার নোটে ভর্তি। আবার খামটা পকেটের মধ্যে রেখে দিল সে। কীভাবেই না ঠকেছে আজ সুরতজান! একটুও টের পায়নি। খামভরা টাকা নিয়ে সেখানে আর একটা কাগজ ভর্তি খাম রেখে দিয়েছে। আর তার ওপর রয়েছে হারটা। পুরনো কলমের নিব ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে পালিশ করে সেগুলো জুড়ে একটা হার তৈরী করেছে। হঠাৎ জোরে জোরে হাসল রহমত এবং সেই সঙ্গে একটা হাত বারে বারে পকেটের ভেতরের খামটা স্পর্শ করতে লাগল।■

ব্যাধ এবং একটি হরিণী

হরিণীর মতই চোখ ছিল সাহানার। লম্বা, টানা, দীর্ঘ চোখ। ঘন কালো ভুরুর মাঝখানে মণিটা ঝিকমিক করত। যেমন মুক্তোর আভা। এবং সেই দীর্ঘায়িত চোখের দু'কোণে লম্বা করে কাজল টেনে দিত। তারপর চেয়ে থাকত সোজাভাবে। এক মিনিটের মধ্যে চোখের পাতা পড়ত না। তার দিকে চাইলে মনে হতো নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে অন্যের নিভৃত অন্তরদেশে দৃষ্টি ফেলে নিঃশব্দে দেখে নিচ্ছে। সাহানার চোখ নিয়ে সবাই আলোচনা করত নিজেদের মধ্যে। বান্ধবীরা ঈর্ষা অনুভব করলেও তার বাহ্য বিকাশ ঘটাত না বলে সাহানার কাছে তাদের মনোভাব খানিকটা অজানা থাকলেও অপ্রত্যক্ষভাবে সবার মনোভারই সরলভাবে প্রকাশিত হতো। সুরকির রাস্তার ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় সাহানার চোখের দিকে কোন ছেলেমেয়ে দেখলে তার বান্ধবীরা ভ্রূ কুঁচকাত। কিন্তু সাহানার কোন দোষ ছিল না। নিজের চোখ সম্পর্কে কোনদিন সচেতন ছিল বলেও মনে পড়ে না। ছোটবেলা থেকেই সে চোখে কাজল দিত– আজও সে অভ্যেস ছাড়তে পারেনি বলে কাজল দিতে যায় নিয়মিতই। কতকটা যান্ত্রিকের মতই কাজ করে যেন। বাইরে বেরুবার আগে কিংবা ভার্সিটি যাওয়ার আগে পড়ার টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ছোট কাজললতা টেনে নিয়ে কাজল দেয় টানা চোখে খানিকটা টান দিয়ে। অন্যের আকর্ষণ দেখে আজকাল কাজল দেওয়ার সময় চোখের প্রতি একবার চেয়ে দেখো না। চোখের প্রতি তার কোন মমতা নেই। সেজন্যে আকর্ষণেরও অভাব।

ছুটির দিনে দুপুর বেলাতে প্রায় নির্জন বাড়ীতে ছোট ভাই-বোনদের জন্যে জামা-কাপড় সেলাই করত সাহানা। সারা দিনের পরিশ্রমের পর মা ঘুমোত নিজের ঘরে। তাকে আর বিরক্ত করতে চাইত না। সে নিজেই ভেবে পায় না ছোটদের প্রতি কর্তব্য নিজের অলক্ষিতে কখন তার মধ্যে এসে জমা হয়েছে! এ কথা ভাবলে আজ অবশ্য তার বিস্ময় জাগে না। স্পষ্ট বুঝতে পারে স্নেহের সম্পর্ক তাকে সে পথে আকর্ষণ করেছিল আব্বার মৃত্যুর পরে। তাই অবাক হয়নি তার পরিবর্তনে। নির্জন দুপুরে জামা ও ফ্রক সেলাই করতে গিয়ে কতবার এ-কথা তার মনে পড়েছে। অবাক লেগেছে নিজের এ-কথা মনে হওয়ার পর, সে আরও বেশী কর্তব্য সচেতন হয়ে উঠেছে। মনোযোগ দিয়ে সেলাই করেছে জামাগুলো। সেই সময় রোদছড়ান উঠোন বড় একটা ছায়া পড়েছে। ছায়া নড়ে উঠেছে আস্তে আস্তে। শেষে এসে থেমেছে তার সামনে।

মুখ তুলে তখন তাকিয়েছে সাহানা।

খালেদ হাসান।

তার সম্পর্কিত বোনের স্বামী।

ভদ্রলোককে দেখতে ভাল লাগত তার। তিনি লম্বা। দীর্ঘ বপু। ছোট মাথা বিশিষ্ট। তাকে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে হলে মাথা তুলতে হতো। তাই তিনি বিনা ভূমিকায় সাহানার সামনে বসে পড়তেন।

আসুন।

কোন কোন দিন তিনি বসার আগেই অভ্যর্থনা জানাত সাহানা।

খালেদ হাসান ছোট মোড়ার ওপর বসতেই সেটা শব্দ করত। সাহানা মনে করত মোড়াটা প্রতিবাদ জানাত। হয়ত তাই।

তবুও তিনি বসতেন। এবং নিয়মিতই।

সাহানার ভালই লাগত তাঁকে। বিশেষ করে নির্জন দুপুরে একজন আত্মীয়ের সাহচর্য তার পক্ষে চরম কামনীয় ছিল। নিঃসঙ্গ একাকীত্বের ক্লান্তিকর হাত থেকে সে বেঁচে যেত। তিনিও তা চাইতেন বলে অনেক দূর থেকে ছোট একটি বিবর্ণ একতলা বাড়ীতে ছুটে আসতেন। মোড়াতে বসেই তিনি সিগারেট ধরিয়ে সাহানার চোখের দিকে প্রথম তাকাতেন। তারপর মুখের প্রতি।

চমৎকার!

কী?

মুখ তুলে জিজ্ঞেস করত সাহানা।

তোমার সেলাই।

সুন্দর হল কোথায়? এ ত সবাই জানে। অতি সাধারণ কাজ।

নিজের কাছে অবশ্য কারুর কোন জিনিসই ভাল লাগে না। ওটা একটা ম্যানিয়া। যেমন আমি। নিজের কাছে আমাকে মোটেই মোটা লাগে না–সে বলল বরং তোমরা।

সাহানা কষ্টে হাসি সংবরণের চেষ্টা করে ঠোঁটের আগায় স্বচ্ছ হাসির তরঙ্গ খেলিয়ে তাকাল তাঁর দিকে।

তাই নাকি?

নিশ্চয়ই।

তারপর খালেদ হাসান নানা গল্প করে যেতেন। নিজের ব্যবসার গল্প। বড়লোক হওয়ার কাহিনী। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাস করার ইতিবৃত্ত।

সাহানা শুনত সব। মন দিয়েই, শুনত সে। ভাল লাগত তার। অন্ততঃ তার একজন আত্মীয় যে নিঃস্ব নয়। একথা ভাবতে ভাল লাগত তার।

সেদিনও সাহানা জামা সেলাই করছিল আনমনে। তার সামনে নারকেল গাছের ছায়া বেঁকে পড়েছে। সেদিকে মাথা তুলে তাকাতেই দেখল আরও একটা ছায়া পড়েছে অন্যদিনের মতই দীর্ঘ। সাহানা হাত থেকে জামাটা একপাশে নামিয়ে রাখল।

আসুন।

খালেদ হাসান হাসিমুখে এসে দাঁড়ালেন বারান্দার ওপর। হাতে বড় একটা প্যাকেট। সেটা তিনি নীচে নামিয়ে রাখলেন।

কল্পনা কর দেখি ওর মধ্যে কি আছে?

সাহানা মাথা নাড়ল।

পারলে না?

না।

নিজেই তিনি প্যাকেট খুলে দেখলেন। দুটো শাড়ি, কয়েকটা শার্ট আর ফ্রক।

তোমাদের সবার জন্যেই আনলাম। রোজ ছুটির দিনে তোমার সেলাই করা দেখতে ভাল লাগে না। এগুলো তুলে রাখ। এখন বরং চল বাইরে থেকে ঘুরে আসি।

সাহানা মুখ নীচু করে ভাবতে লাগল।

কিন্তু মা কী বলবে?

কিছু বলবে না, আমি বলেছি আগে।

সে-ই সময় মা-ও ঘর থেকে বেরিয়ে এল। জামাগুলোর দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে বললে,

যাও না সাহানা, এখন ত আর কোন কাজ নেই। সাহানা ঘরে চলে গেল নিশব্দে পা ফেলে। লাল রঙের একখানা শাড়ি পরে বের হয়ে এল খানিক পরে।

তার দিকে তাকিয়ে খালেদ হাসান বলল,

সে কী, নতুন শাড়িটা না হয় পর না এখন!

না থাক।

পর না, সাহানা।

এবার মা বলল। সাহানার হাতে নিজেই শাড়ি তুলে দিল।

আবার নতুন করে শাড়ি পালটাতে হল তাকে।

দেরি করেই বাড়ী ফিরেছিল সাহানা। মা শুয়ে পড়েছিল। ছোট ভাই-বোনেরাও নিজেদের ঘরে শুয়ে ছিল। সাহানা তার ছোট ঘরে ঢুকল। হাতে তার অনেক জিনিস। সেগুলো টেবিলের ওপর রেখে দিল সে। ছোট টেবিল প্রায় সম্পূর্ণ ভরে গেল জিনিসের স্তূপে। খালেদ হাসান চৌকির ওপর বসলেন।

আপনি অনর্থক এত জিনিস কিনে দিলেন। না দিলেও হতো।

হতো না। তোমার প্রয়োজন বলেই দিয়েছি। ওটা বাড়িয়ে বলছ।

সত্যি না।

আচ্ছা, কাল তাহলে আসব।

খালেদ হাসান চলে গেলেন। তারপর প্রত্যেক দিন নিয়মিত করে আসতে লাগলেন বিকেল বেলায়। বাড়ীর সবাই ঘুমিয়ে গেলে তিনি ফিরতেন। সাহানা এগিয়ে দিত দরজা পর্যন্ত। তারপর ক্লান্তিতে বিছানায় শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে রইত অনেকক্ষণ। না, কোন উপায় দেখে না সে যেন ক্রমশঃ বন্দিনী হয়ে পড়ছে।

পাশে বসে সাহানার খাতার দিকে লক্ষ্য করছিল সুলতানা। সাহানা এক মনে খাতায় ফার্নগুলো লাগাচ্ছিল। অত্যন্ত যত্নে–তন্ময় হয়ে। সুলতানা দেখল খাতার পৃষ্ঠায় ফার্নগুলো অদ্ভুত লাগছে।

যেন মাকড়শার জাল ছোট একটা কীটকে নিজের দেহের মধ্যে টেনে আনতে চাইছে।

সাহানা।

সুলতানার ডাকে সাহানা ফিরে তাকাল তার দিকে।

কী হল তোমার?

খাতার দিকে চেয়ে দেখ একবার।

খাতার প্রতি তাকালেও তার চোখে কোন নতুনত্ব ধরা পড়ল না। সুলতানার আকস্মিক প্রশ্নে সে বরং বিস্মিত হল।

আমি ত কিছু দেখতে পাচ্ছিনে।

কিন্তু আমি পাচ্ছি। খাতায় এমনভাবে ফার্নগুলো লাগিয়েছ যে মনে হচ্ছে ছোট একটা কীট যেন মাকড়শার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

সুলতানার অদ্ভুত মন্তব্য শুনে সাহানা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল বিহ্বলের মত।

সত্যি?

হাঁ। দেখ তুমি ভাল করে।

না। তবুও সাহানা কোন কিছু খুঁজে পেল না খাতার মধ্যে। খাতাটা বন্ধ করে সে উঠে দাঁড়াল।

বলল, চল, এক কাপ চা খেয়ে আসি।

দুজনে ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে এল।

ঘাসে বিন্দু বিন্দু শিশির পড়ছিল। শাড়ির আঁচল ভিজে গেল দুজনের।

বেশ শিশির পড়েছে।

হ্যাঁ।

সাহানা নিজের দৃষ্টি প্রসারিত করে ধরল সুলতানার মুখের ওপর।

এক-একবার কী ভাবি জান?

কী?

যদি আমি কাউকে ভালবাসতাম তাহলে শিশিরের মতই শাড়ির আঁচল ভিজিয়ে দিতাম।

কিন্তু তাতে বাধা কোথায়? প্রথমতঃ তুমি অবিবাহিতা। দ্বিতীয়তঃ সুন্দর। তৃতীয়তঃ....

সাহানা বাধা দিল।

থাকা। বাধা নেই। কিন্তু সে-লোকের অভাব।

তোমার কথা বড় হেঁয়ালির মত ঠেকছে।

স্বাভাবিক। অনেক সময় নিজেও নিজেকে বুঝে উঠতে পারিনে দুর্বোধ্য বাক্যের মত।

আর কোন কথা হয় না। দুর্বোধ্য বাক্য তাদের মাঝখানে প্রসারিত হয়ে নৈশব্দের দিকে চালিত করে।

এ্যালবামে সাজান অসংখ্য নতুন তোলা ফটো। দিনের পর দিন এ্যালবাম ক্রমশঃ ভারি হয়ে উঠছে। শুধু এ্যালবাম নয়–সাহানা অনুভব করে, তার ছোট ট্রাঙ্কও নানা পোশাকে পূর্ণ হয়ে উঠতে শুরু করেছে। সে তুলনায় এ্যালবাম অবশ্য তেমন কিছু নয়।

খালেদ হাসানও তাই বলতেন।

ছোট চেয়ারে বসে সিগারেট বের করতেন সোনার কেস থেকে। তারপর ধরিয়ে তাকাতেন সাহানার দিকে। সিগারেট ঠোঁটে চেপে চেয়ে থাকতেন তার দুচোখের দিকে।

না, আশ্চর্যই। একদিন ছায়া পড়েছিল চৌবাচ্চার মধ্যে একজোড়া চোখের। আমি অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়েছিলাম। হঠাৎ চোখ পড়ল একটা হাসও পানির দিকে তাকিয়ে আছে অবাক হয়ে। তখন বিস্মিত হলাম।

সাহানা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। না। এ প্রসঙ্গ ভাল লাগে না তার সব সময়। মনে হয় অতি কৃত্রিমভাবে কথাগুলো সাজান।

খালেদ হাসান এবার চেয়ার ছেড়ে সাহানার পাশে এসে বসলেন। পিঠে হাত রাখলেন একটা। নিজের কিনে দেওয়া শাড়িটা পরীক্ষা করলেন হয়ত আঙুল দিয়ে ঘষে ঘষে।

না, বেশ মসৃণ জমি।

আমার কী ইচ্ছা করে জান, দু' হাতে সব কিছু নিজের মুঠোর মধ্যে আনতে। হাতছাড়া করলে কিছুতেই স্বস্তি পাইনে।

সে হয়ত আপনার অহঙ্কারী মনের গর্ব।

হতে পারে। তা আমি অস্বীকার করতে পারিনে। পারব-ও না। এই যেমন তোমার কথা ধর। তোমাকে আমার ভাল লাগে। তাই ইচ্ছা করে.....

পাশের ঘরের দরজা খোলার শব্দ হয়।

মা বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

খালেদ হাসান সিগারেট ফেলে দেন একদিকে।

চল, কোথাও বেড়িয়ে আসি।

আমার খুব ভাল লাগছে না আজ।

ও কিছু নয়।

সন্ধ্যের অনেক আগেই দোকানের বাতি জ্বলে উঠেছিল। দু'পাশের দোকান থেকে আলো ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তার ওপর। সাহানার রঙিন কাপড় ঝিকমিক করতে থাকে। ওর শ্লথ পা এক সময় চঞ্চল হয়ে ওঠে। বাঁদিকে তাকিয়ে দেখতে পায় তার কলেজ জীবনের বান্ধবী রওশনকে। স্বামীর সঙ্গে চলেছে। না, আগের চেয়ে অনেক পরিবর্তন হয়েছে তার। সাদা শাড়ি পরতে শিখেছে আজকাল। অথচ আগে রঙিন শাড়ি ছাড়া অন্য কোন শাড়ি ব্যবহারই করত না। চেয়ে চেয়ে রওশনকে দেখল সাহানা। তাকে বিশেষ আমলই দিত না।

হঠাৎ থেমে গেল সাহানা।

থামলে যে?

খালেদ হাসান পেছন থেকে প্রশ্ন করলেন।

আপনি এত পেছনে পড়লেন কেন?

মোটা মানুষ হাঁটতে হাঁটতে হাঁপিয়ে পড়েছি।

আসুন। একটা বই কিনব।

সাহানা খালেদ হাসানের একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরে বইয়ের দোকানের দিকে এগিয়ে গেল.। তাদের দেখে দোকানদার অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে এল।

কী বই চাই বলুন?

সাহানা দেখল রওশন ছোটদের জন্যে কতকগুলো বই দেখছে। তাকে ঢুকতে দেখেই তাকাল অবাক হয়ে। সাহানা সেদিকে না তাকিয়ে দোকানদারের দিকে চেয়ে বলল,

প্যাস্টারনকের কোন কারেন্ট বই আছে?

আজ্ঞে, না।

রাবিশ। কী যে রাখেন আপনারা সব।

সাহানা আঁচলটা পিঠের দিকে নামিয়ে দোকান থেকে নেমে গেল। একেবারে সোজা নেমে পড়ল রাস্তার ওপর।

কী, বই দেখবে না আর?

না। অন্য দিন দেখব। আপনি আসুন।

সাহানা চলতে লাগল কংক্রিটের ওপর দিয়ে। একটু এগিয়ে গিয়ে পেছন ফিরে দেখল দূরের বইয়ের দোকান থেকে তখনও একটি কৌতূহলী চোখ চেয়ে রয়েছে তার অপসৃয়মান দেহের দিকে। আর আর দাঁড়াল না সাহানা।

ঘরে ফিরে সাহানা দেখল ঘড়ির কাঁটা এগারোটার ঘর অতিক্রম করে গেছে। জামা কাপড় না ছেড়েই সে বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়ল। ক্লান্তিতে তার দেহ একবার কেঁপে উঠে পরক্ষণে থেমে গেল বেতসী বনের মত। সাহানা যখন উঠল তখন তার চোখের দু'কোণ সিক্ত। সে স্পষ্ট বুঝতে পারল না এই সময়ে কেঁদেছিল না ঘামের পানিতে মুখ ভিজে গেছে?

এখনো সেই দুপুর আছে। অপ্রশস্ত উঠোনের একপাশে নারকেল গাছের ছায়া পড়ে বাঁকা হয়ে। কিন্তু সেই ছায়ার পাশে বারান্দায় একজনকে নীচু হয়ে কাজ করতে দেখা যায় না। গাছের ছায়া থেকে স্বল্প ব্যবধানের ঘরের জানালার পাশে ছায়া পড়ে এক নারীমূর্তীর তন্ময় হয়ে বই পড়ছে। একাগ্রতা মিশিয়ে সে তাকিয়ে থাকে বই-এর দিকে। অন্যেরা তার প্রতি একবার দৃষ্টি হেনে আবার চলে যায়। কিন্তু নিজে সে জানে অন্যের চোখকে ফাঁকি দেওয়ার জন্যে এর চেয়ে প্রকৃষ্টতম উপায় আর নেই। বই-এর অক্ষরের দিকে চেয়ে তার সামনে সেগুলো নতুন আকারে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। মনে হয় কালো অক্ষরগুলোর প্রত্যেকের মধ্যেই একটা গূঢ় অর্থ আছে। যেগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে ছবির মত ভাসতে থাকে। সাহানা মিলিয়ে মিলিয়ে দেখে। কোম্পানীর কাগজপত্রের গুচ্ছ এবং সেই সঙ্গে ব্যবসার নতুন সূত্রগুলো পরপর গুছোন।

সাহানা!

সাহানা মুখ ফিরিয়ে দেখে খালেদ হাসান দাঁড়িয়ে। এ-সময়ে তাঁর আগমন নিতান্ত অস্বাভাবিক না হলেও আজ কল্পনা করেনি। রবিবারের দিন তাঁর ব্যবসাসংক্রান্ত হিসাবের দিন। তাই তিনি এদিন বাড়ী থেকে বের হন না। সেজন্যে সাহানা বিস্মিত হল।

খালেদ হাসান বিনা ভূমিকায় তার সামনে কোম্পানীর কাগজ মেলে ধরলেন।

একটা সই দাও ত। কয়লার ব্যবসাটা এক্সপান করার জন্যে একটা নতুন উপায় বের করেছি। তোমার নামেই এটা করছি। তোমার হলেই আমার! কী বল! হা, হা।

খালেদ হাসান প্রাণখোলা মুক্ত হাসি হাসলেন। তারপর সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলেন স্মিতবদনে।

আমার নামে আবার কেন?

না, না, তোমার কোন আপত্তি শুনতে চাইনে। সই করে দাও তাড়াতাড়ি।

পকেট থেকে পার্কার পেন বের করে দিলেন তিনি। সাহানা মন্ত্রমুগ্ধের মতই পেন তুলে নিয়ে সই করল।

খালেদ হাসান ছোট চেয়ারের ওপর বসলেন।

দুপুর গড়িয়ে গেল। বিকেল এল হালকা রোদের মধ্যে দিয়ে। সাহানা হালকা পোশাক পরল। কপালে বড় করে টিপ দিল। কাজল দিয়ে টানা চোখ আরও বড় করল। কোমরের সঙ্গে শাড়িটা জড়িয়ে সাহানা এগিয়ে গেল খালেদ হাসানের সঙ্গে।

স্কুটার এসে থামল নিউ মার্কেটের উত্তর গেটের পাশে। তারা দুজনে নামলেন। খানিক দুরে এগিয়ে যেতেই খালেদ হাসান থেমে গেলেন।

কেমন আছেন?

খালেদ হাসান পেছনে তাকিয়ে দেখলেন তারিক সাহেব।

আপনি?

চমৎকার দিন বলতে হবে। এমন সুন্দর দিন ব্যর্থ হতে দেওয়া উচিত নয়। আপনার মত নিশ্চয়ই ঋণাত্মক নয়। কী বলুন?

নিশ্চয়ই!

তবে চলুন।

তিনজন এগিয়ে গেলেন অভিজাত রেস্টুরেন্টের দিকে।

তিনটে চেয়ারে তাঁরা বসলেন রঙিন টেবিলক্লথ ঘিরে।

দেখেছেন, আপনার পরিচয় করিয়ে দিতে একেবারেই ভুলে গেছি।

খালেদ হাসান নিজের ভুল সংশোধন করলেন তাকালেন সাহানার দিকে।

ইনি কোল ইন্সপেক্টর তারিক সাহেব। আর ইনি আমার স্ত্রী।

ধন্যবাদ।

সাহানার কপাল হঠাৎ কুঁচকে উঠল। সেই কুঁচকানো কপালের ওপর এক বিন্দু ঘাম জমে উঠল। সে তাকাল খালেদ হাসানের দিকে জিজ্ঞাসু মনোভাব নিয়ে। কিন্তু তিনি সুযোগ দিলেন না। তারিক সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন ব্যবসা বিষয়ে। তারপর নতুন কোম্পানীর কাগজটা বের করে তাঁর সামনে দিলেন।

আপনি এটা দেখুন আমি ততক্ষণ স্ট্যাম্প কিনে নিয়ে আসি।

তাড়াতাড়ি করে খালেদ হাসান বাইরে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় বাইরে থেকে পর্দাটা একটু টেন দিলেন।

নির্জন গলির প্রান্তে টিম্ টিম্ করে বাতি জ্বলছে। গাড়ি থেকে নেমে সাহানা তাড়াতাড়ি বাড়ীতে ঢুকে ছোট বেতের চেয়ারে বসে রইল চুপ করে। বাতি পর্যন্ত জ্বালাল না। পাশের ঘর থেকে যে আলো আসছিল তাই অসহ্য মনে হচ্ছে তার

কাছে। নিজেকে যেন সে নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে চায়। যেখানে কেউ তার সান্নিধ্যে আসতে পারবে না। একাগ্রমনে কাজ করে চলবে অন্ধকারের মধ্যে। না। হঠাৎ সাহানার মনে হল সে ভুল সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। কিছুতেই নিজেকে দমতে দেবে না। না। না। না। হঠাৎ উত্তেজনার বশে সাহানা লাফ দিয়ে উঠে বাতি জ্বালিয়ে দিল।

অন্যান্য দিনের মত আজও সায়িদ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে পথের পাশে। প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস শেষ করে সাহানা যখন বান্ধবীদের সঙ্গে যাবে তখন তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে সে। সাহানা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে আস্তে আস্তে সেখান থেকে চলে যাবে।

তোমার প্রেমে পড়ে গিয়েছে সায়িদ।

বান্ধবীরা হাসত যাওয়ার সময় সায়িদের দিকে তাকিয়ে।

আমার নয়–পথের। দেখ না, কিভাবে দাঁড়িয়ে থাকে রাস্তার ওপর।

সাহানা হাসত। জোর করেই। কেননা, নিজেও জানত সে সত্যি বলছে না। এখনও তার কেমিস্ট্রি বই-এর মধ্যে নীল কাগজখানা আছে। ফেলতে পারেনি। চিঠির মধ্যে অদ্ভুত মাদকতা আছে বলে। অথচ সায়িদ প্রেম নিবেদন করেছিল এবং একদিন তাকে একা পেয়ে জিজ্ঞেসও করতে ভোলেনি।

আমি আপনাকে চিঠি দিয়েছিলাম একটা–

কই মনে পড়ে না ত।

সাহানা আর দাঁড়ায়নি, তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিল সেখান থেকে। সায়িদ হতভম্বের মত তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। এরপর আর কোনদিন প্রশ্ন করেনি, চুপ করে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়েই থাকত।

চলতে চলতে আজ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল সাহানা। প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস না করে এতক্ষণ কমনরুমে বসে বসে গল্প করছিল সময় কাটানোর জন্যে। ঘণ্টা বাজার আগেই বের হয়ে এসেছে সেখান থেকে। সায়িদ রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাচ্ছে। সাহানা তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দাঁড়িয়ে গেল। টানা চোখ মেলে তাকাল তার দিকে। সায়িদ অপ্রস্তুত হয়ে গেল যেন।

আপনার চিঠি আমি পেয়েছি।

আর দাঁড়াল না সাহানা। দ্রুত পদক্ষেপে চলে গেল একদিকে। তার বুক কেন যেন কাঁপছে। চেয়ারে বসেও অনেকক্ষণ তার স্পন্দন শুনতে পেল।

তারপর লুকিয়ে লুকিয়ে সাহানা পালিয়ে যেত ক্লাস থেকে। সে সময়ে সে যেত রমনা গার্ডেনে বা কোন রেস্টুরেন্টে। তার পাশে পাশে আর একটা ছায়া চলত। বেশ দ্রুত গতিতে। শাড়ি খস্‌খস্ করত ঘাসের সঙ্গে প্রতিহত হয়ে।

একটু আগেও টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছিল। এখন সম্পূর্ণ থেমে গেছে। বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল সাহানা। আর বারে বারে দরজার দিকে তাকাচ্ছিল। সময় যেন

কিছুতেই কাটতে চায় না। তিনটে বাজতে এখনো দেরি। প্রতি মিনিটে সে হাঁপিয়ে ওঠে। সে সময় ঘরে গিয়ে বসে। শ্বাস নেয় অনেক্ষণ ধরে। মিনিটের কাঁটা এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তেজনাও ক্রমশ: বাড়তে থাকে। জানালার দিকে তাকাতেই দেখে সেখানে মানুষের ছোট ছায়া পড়ছে। সাহানা বাইরে ছুটে এসেই থমকে দাঁড়ায়। খালেদ হাসান এসেছেন। হঠাৎ তার সারা মুখ ঘেমে ওঠে।

আপনি–মানে এ সময়ে? এখন ত আসেন না?

খালেদ হাসান ঘরে ঢুকে পড়লেন।

ঘামছ কেন আমাকে দেখে? এ-সময়ে না হয় পড়াশোনা বাদই দিলে। গল্প করেও নিশ্চয় আনন্দ পাওয়া যায়।

তাঁর কথার কী উত্তর দিবে খুঁজে পায় না সাহানা। তার পা দুটো তখন কাঁপছে। অসহায়ের মত চৌকির ওপর বসে পড়ল সে।

কী ব্যাপার বল ত? এমন করছ কেন তুমি? অন্যদিন ত এমন কর না?

না, না, ও এমনি। বড় গরম পড়েছে কিনা?

গরম?

খালেদ হাসান অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকালেন।

ফাল্গুন মাসে ভীষণ গরম লাগে নাকি?

ও এমনি।

খালেদ হাসান নীরবে সিগারেট খেতে থাকেন। তিনটে বাজল দেখছি। চল, খানিকক্ষণ বেড়িয়ে আসি।

তিনটে!

সাহানা চমকে ওঠে। তার দৃষ্টি তখন পড়েছে জানালার দিকে। সেখান দিয়ে বাইরের দরজা পর্যন্ত দেখা যায়। হাতে একটা বই নিয়ে সায়িদ ঢুকছে। সাহানা সোজা হয়ে দাঁড়াল। পাশের ঘরে চেয়ে দেখল ছোট চৌকিতে মা ঘুমুচ্ছে। পাশে ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো। সায়িদ তখন অনেক দূর এসে পৌঁছেছে। সাহানা হঠাৎ এগিয়ে যায় খালেদ হাসানের দিকে। তারপর তাঁকে বিস্মিত করে দু'হাত দিয়ে কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরে বলে,

আপনি এখন আসবেন তা আমি জানতামই না। সত্যি ভাল হল। এত চমৎকার লাগছে আমার। বড় হালকা মনে হচ্ছে।

সাহানার চোখ দুটো বন্ধ। কেমন যেন ফুলে ফুলে উঠতে চাইছে ক্রমাগত।

সায়িদ জানালার কাছে এসেছিল। সেখানে বইটা রেখে সে বেরিয়ে গেল আস্তে আস্তে। যাওয়ার সময় নীরবে। কাগজের চিঠিটা বের করে নিল। সাহানা তা দেখল। এবং পরক্ষণে আরও জোরে খালেদ হাসানের গলা জড়িয়ে ধরল।■

নয়া পত্তন

অবাক লাগে বৈকি ফুলঝুরির! তা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন সে তার একজোড়া কালো চোখ বিস্ফারিত করে তাকিয়ে থাকে ইঞ্জিনের দিকে। ওর চোখের পলক পড়ে না। হাতের ছোট ঝুড়িটা অনেকক্ষণ ধরে আগের জায়গাতেই স্থির হয়ে থাকে। ফুলঝুরি দেখে কী সুন্দর ইঞ্জিন! সম্পূর্ণ ঢাকা। ঝক্‌ঝকে রঙ। সবুজ আর হলদে। আর সামনের দিকটা অত্যন্ত সুদৃশ্য। শহরের সাহেবদের মটর গাড়ির মত। আগেকার ইঞ্জিনগুলো লাগে বেঢপ। লম্বা সুড়ঙ্গের মত সামনেটা। দেখতে যেন দৈত্যের মত। আর যখন সিটি বাজাত তখন কানে তালা ধরে যেত। কয়লা কুড়োনোর সময় সে-ও কানে হাত দিত। কান দুটো যেন কালা হওয়া যোগাড়। আর এগুলো সিটি দেয় বাঁশীর মত প্রথম প্রথম শুনলে মনে হ'ত তার মরদ-ই যেন বাঁশী বাজাচ্ছে। সেদিনকার কথা এখনো স্পষ্ট মনে আছে তার।

প্রতিদিনের মত সেদিনও তাদের ছোট দলটা কয়লা কুড়াচ্ছিল। ট্রেন আসার সময় হয়ে এসেছিল। সে সময়ের জন্য ওরা সতর্ক হয়ে যায়। কেননা, দৈত্যের মত ইঞ্জিনটা তখন হাঁসফাঁস করতে করতে তাদের দিকে এগিয়ে আসে। তারপর কলের পানি খায় গোগ্রাসে। আর ভুক্ত পোড়া কয়লা নিজের বিরাট পেট গহ্বর থেকে বের করে দেয়। সে সময় সেখান থেকে তাদের সরে যেতে হয়। কয়লা কুড়োতে পারে না—-।

ট্রেন আসার সময় হলে রোদের দাগ ঠিক কলের নীচে সরে আসে। তখন তারা বুঝতে পারে এবার ট্রেন আসবে। ঝুড়ি নিয়ে একে একে কলের খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে , ফোরম্যানের কাজ দেখে।

'ই রে খালা, ইঞ্জিল আইয়া পড়বে যে, চাইয়া দেখ রোদ কদ্দুর আইয়া পড়ছে!'

কয়লা কুড়োতে কুড়োতে সবাই তন্ময় হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য সেদিন হওয়ার কথাও ছিল। রাহেলা খালা নিজের বিয়ের রাতের গল্প বলছিল। সবাই তা শুনছিল তন্ময় হয়ে। ফুলঝুরির কথায় তাদের চমক ভাঙল।

দূর থেকে তখন ট্রেন আসার শব্দ শোনা যাচ্ছে। ফুলঝুরি কান পেতে আওয়াজ শোনে। তার ভঙ্গী দেখে রাহেলা খালা পান মুখে দিয়ে হাসতে থাকে। কি লা? কান পাইত্যা অমুন কর‍্যা শুনতাছিস কী?

হোন, খালা। শব্দডা কেমুন লতুন লতুন লাগত্যাছে না?'

'তুর কেমন কথা? লতুন হবে কুতা থিকরে?

এমন সময় শব্দ করতে করতে ট্রেন এসে পড়ে স্টেশনে। সেদিকে তাকিয়ে সবাই রীতিমত অবাক হয়ে যায়। বিস্ময়ে সবার চোখ আলোক দৃষ্টিতে ইঞ্জিনের দিকে তাকিয়ে থাকে। কেউ কোন কথা বলতে পারে না। প্রথমে।

'ইডা ক্যামুন ইঞ্জিল?'

ফুলঝুরি নৈশব্দে ঢিল মেরে জিজ্ঞেস করে।

'তাই ত ভাবতাছি। এমুন টেরেন আর ইঞ্জিল ইয়ার আগে দেখি নাই। আইজই পরথম দ্যাখলাম।'

'ইডা এমুন ক্যান?'

'কে জানে?'

কারুর মুখে নতুন কথা জোগায় না। নতুন ট্রেন আর নতুন ইঞ্জিন সবাইকে বিস্ময় বিমুগ্ধ করে ভাষা কেড়ে নিয়েছে। এমনিভাবে কতক্ষণ তারা দাঁড়িয়েছিল জ্ঞান ছিল না। তাদের চমক ভাঙ্গল তখন ট্রেনটা যখন তাদের পাশ দিয়ে শব্দ করতে করতে চলে গেল আস্তে আস্তে।

'ইডা কেমুন হ'ল?'

প্রশ্ন করল ফুলমোতিয়া।

'কুনডা?'

'ই যে টেরেনটা চইল্যা গেল আমাগো পাশ দিয়া ইঞ্জিল ত আইল না এহানে কয়লা ঢালতে। ই কেমুন ধারা কতা?'

সবই বিস্মিত হ'ল। সত্যি ত! এদিকে এতক্ষণ তারা কেউই লক্ষ্য করেনি। কেবল ইঞ্জিন আর ট্রেনের নতুনত্বের চিন্তাতেই আত্মস্থ ছিল। এবার চমক ভাঙ্গল কিন্তু কেউ কোন কথা না বলে পরস্পরের দিকে তাকাল। কেননা এর অর্থ কেউ জানে না। নিঃশব্দে কয়লা বাছতে লাগল ছোট দলটি। আগের মনোযোগ অন্তর্হিত হয়েছে সবার মধ্যে থেকেই। অভ্যস্তের মত তাদের দু'হাত খেলা করে চললেও তার ক্রিয়া হ'ল অত্যন্ত মৃদু। সবাই যেন কেমন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে নতুন এক ভাবনায়।

বাড়িতে গিয়েও চঞ্চল হয়ে উঠল ফুলঝুরি। একটা নতুন জিজ্ঞাসা তাকে ঘিরে চঞ্চল করে তুলল। রইস ফিরল সন্ধ্যের পর। তাকে ভাত খাইয়ে সে সোজা বিছানায় গিয়ে পাশে শুয়ে পড়ল। তারপর আদর করে দু'হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে শক্ত বুকে মাথা রেখে বলল, 'একডা কথা জিগাইতে চাই।'

রইস আমেজ করে বিড়ি টানছিল। জোর করে শেষ টান মেরে সেটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে তাকে আরও কাছে টেনে নিল। মনে হ'ল ক্লান্ত দেহ এক মুহূর্তে শীতল হয়ে পড়ল।

ফুলঝুরি তার দিকে চেয়ে বলল, 'কইব?'

'কও না? বাধা দিতাছে কে?'

আজ একডা নতুন জিনিস দেইখ্যাছি।'

রইসের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

কোন রঙিন চুড়ি না সুন্দর পুরুষ মানুষ?

ফুলঝুরি তার মুখে হাত দিয়ে ঠোঁট উল্টে রাগ করল।

'বেসরম পুরুষ মানুষ। কিছুই আটকায় না তোমাগো বেহুদা মুখে।'

কৌতূকে রইসের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ফুলঝুরির চুলের বিস্রস্ত অন্ধকারে হাত বুলিয়ে দিতে বলে 'কও, আর কিছু কমুনা।'

'না।'

'আহা, কও না।'

ফুলঝুরি রইসের নাকে চিমটি কেটে বললে, 'আজ ইষ্টিশনে নতুন একডা টেরেন আইছে। নতুন ইঞ্জিল।'

ফুলঝুরি তার অভিজ্ঞতার কথা খুলে বলে। কৌতূহলের আবেগে দু' চোখ মাঝে মাঝে অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যে চিক্‌চিক্ করতে থাকে। রইসের ভাল লাগে তার কথা শুনতে।

'ইঞ্জিলডা অমুন ক্যান? কও না?'

শেষে জিজ্ঞেস করল ফুলঝুরি।

ওডারে কয় ডিজিল ইঞ্জিল। ওডা কয়লায় চলে না, বুঝলা। জাপান বইল্যা নাহি একডা চ্যাপ্টা নাকওয়ালা মানুষের দ্যাশ আছে। সেইহ্যান থাইক্যা আমাগো সরকার কিইন্যা আনছে।'

ফুলঝুরির চোখ বড় বড় হয়ে উঠ্‌ল আবার। রইস এ-সব জানল কোথা থেকে?

'ক্যামুন কইর‍্যা জানুম? ইষ্টিশনের বড় সাহেবের জিগাইয়া জানছি।'

রইস স্টেশনে কুলির কাজ করে। তার পক্ষে এ-সব জানা অস্বাভাবিক নয় মোটেই। বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে সে স্বামীকে অবলোকন করে। সত্যি তার স্বামী কত জানে! কত!

পরদিন কয়লা কুড়োতে গিয়ে ফুলঝুরি তার সহকর্মিনীদের সবকথা খুলে বলল। সব শুনে তারা ত অবাক। রইস এত খবর সংগ্রহ করে এনেছে তার জন্যে? কেউ ভাবল, আহা, তাদের স্বামীগুলোও যদি এমন হত? আর রাতভরে

আদর করে বুকের কাছে টেনে নিয়ে এমন বিস্ময়কর গল্প করত। একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে তাদের নীরব কণ্ঠ থেকে।

রাহেলা খালা তাদের দিকে চেয়ে বলল, 'অমুন হা পিতোশ করতাছিস ক্যান? আমাগো কোন অসুবিধা অইব না।'

ট্রেনটা তখন পর্যন্ত দাঁড়িয়েই ছিল। অনেক লোক ওঠানামা করল। কিন্তু সে-সব লক্ষ্য করল না ফুলঝুরি। তার অবাক লাগছে অতীতের সঙ্গে আজকের মিলিয়ে দেখে। কত পার্থক্য। ক'দিনের ব্যবধানে ট্রেন লাইনের ওপর কি রূপান্তরই না হ'ল! পুরনো রেলগাড়ির জায়গায় এল ঝক্‌মকে এক গাড়ি। শুধু ঝকমকেই নয়– সম্পূর্ণ নতুন। যা এর আগে ওরা কোনদিন দেখেনি, ভাবতে ত পারেইনি। সে তাদের কল্পনার বাইরে। আরও না জানি কত কি হবে যা তারা আজ কল্পনা করতে পারছে না।

অমন ভাবতেছিস কি?'

রাহেলা খালা ঠেলা দিয়ে বলল ফুলঝুরিকে। ফুলঝুরি অবাক হয়ে তাকাল তার দিকে। সত্যি, ট্রেনখানা নিয়ে তার মধ্যে অদ্ভুত এক রূপান্তর দেখা দিয়েছে। যার সম্পর্কে সে নিজেও সম্পূর্ণ জানে না।

কি আর ভাববার আছে খালা! আমার কেবল অবাক লাগত্যাছে।'

'ব ব তাইলে আরও অবাক হওয়ার কথা কই তোদের।'

রাহেলা খালার চারদিকে তারা কয়লা বাছতে বসে। হাত তাদের কাজ করতে থাকে এক মনে, কেবল কান দুটো খাড়া হয়ে থাকে একজনের কথা শোনার প্রতি।

রাহেলা খালা বলতে থাকে চঞ্চল থেকে একটা পান মুখে পুরে দিয়ে।

ডিজেল ইঞ্জিন যতই সুন্দর হোক না, নতুন হোক না কেন, তাদের কাছে তা আজ অভিশাপ বহন করে এনেছে। যার কথা ভাবলে সবার কপালই কুঁচকে উঠবে। সবাই হয়ত মনে মনে এই ক'দিনেই সেই সর্বনাশের আন্দাজ করতে পেরেছে।

সবাই উৎকর্ণ হয়। আপনা আপনিই কর্মরত হাত থেমে যায়।

রাহেলা খালা মুখ থেকে পানের পিক ফেলে বলতে থাকে।

'তোরা হয়ত দ্যাখছিস ডিজিল ইঞ্জিল পুরনো ইঞ্জিলগুলোর মত কয়লাই না খাইল তাইলে পুড়ো কয়লা প্যাট থিক্যা বার করব ক্যামনে। আর এতেই অইছে আমাগো চরম সর্বনাশ। কয়লা না বার করলে আমাগো কুড়া[illegible] আমাগো সকলকেই বাড়ি ফিইরা যাইতে অইব শুধু হাতে। কয়লা কুড়ানো ব্যবসা বন্দ অইয়া যাইব।'

তাই ত! একথা একবারও ভাবেনি। নতুন যান্ত্রিক সভ্যতা মোহাবিষ্ট করে তাদের একপাশে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। সেখানে তারা অবহেলিত অপাংক্তেয়। অথচ করারই বা কি আছে তাদের?

সবাই শুনতে থাকে একমনে রাহেলা খালার কথা। কি যে আশ্চর্য লাগছে!

অবিশ্যি এহনও সেদিন আয় নাই। সব টেরেন গুলাই ত ইদিকে ডিজিল ইন্জিলের নয়–তাই আমাগো রক্ষা। হেইসব ইঞ্জিলের কয়লা নিতে হবে বাইছা বাইছা। হেইগুলাও যেদিন অচল অইব, আমাগো হাত-পাও অবশ হইয়া পড়ব।'

'তাই বল।'

রাহেলা খালার প্রথম কথায় সবাই বিবশ হয়ে পড়েছিল, কিন্তু শেষের কথা শুনে খানিকটা আশ্বাস পায়। না, সেদিন এখনো আসেনি।

কিন্তু–

ফুলঝুরির মনে পড়ে গেল ক'দিন থেকে আর আগের মত কয়লা কুড়াতে পারে না। মাত্রা বেশ কমে গেছে। আর কমারই কথা। দুটো ট্রেন ডিজেল ইঞ্জিনে চলে। দুটো কয়লার ইঞ্জিন থেকে অনেক কয়লা পাওয়া যেত।

ফুলঝুরি কয়লা বিক্রীর পয়সা এনে জমিয়ে রাখত ছোট একটা বাঁশের ঠোঙ্গার মধ্যে। একদিন গুণে দেখল বেশ কম। রইসকে দিয়ে যা থাকার কথা তা নেই। কি ব্যাপার? বুঝতে পারে না সে। কিন্তু বুঝতে পারল সেদিন রাতেই। মাঝ রাতে একটা ট্রেন আসত তখন রইস স্টেশনে যেত মাল বইতে। রাতে বেশ পয়সা পাওয়া যায়। সেদিন রইস যাওয়ার আগে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে ততক্ষণ জামা গায়ে দিয়ে ফুলঝুরির দিকে একবার তাকিয়ে বাঁশের ঠোঙ্গা উপুড় করে পয়সাগুলো ঢেলে নিয়ে বাইরে চলে গেল পা টিপে টিপে। তার ব্যবহারে আশ্চর্য হল সে। পা টিপে টিপে গেল কেন রইস? শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল ফুলঝুরি। কিন্তু তার রহস্যময় ব্যবহারের কোন পশ্চাদপট আবিষ্কার করতে পারে না। শুয়ে শুয়েই সে ট্রেনের শব্দ শুনল। ট্রেন স্টেশনে এসে আবার চলে গেল। তারপরও অনেকক্ষণ কেটে গেল। কিন্তু রইসের আসার কোন লক্ষণ নেই। এমনি করে রাত কেটে গেল নিঃশব্দে। ফুলঝুরি বিছানা থেকে উঠল না।

কয়লা কুড়োতে যাওয়ার আগে ফুলমোতিয়া রোজ তাকে ডেকে যেত। আজও যাওয়ার আগে তাকে ডাকতে এল।

'ওরে, ফুলঝুরি?'

ফুলঝুরির কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে ফুলমোতিয়া ঘরে ঢুকে তাকে শুয়ে থাকতে দেখে বেশ অবাক হয়ে গেল।

'কিরে? এত বেলায় শুইয়া ক্যান? কয়লা কুড়াতে যাবিনে?'

'শরীর ভাল নেই যে আইজ। তুই যা।'

কি অইল আবার? বকছে নাহি তিনি?'

'নারে, না। এমনি। তুই যা।'

ফুলমোতিয়া বেশী পীড়াপীড়ি না করে চলে গেল। একজন কমলে তাদের ভাগে কয়লা কিছু বেশী পড়বে। তাতে ক্ষতি নেই।

রইস ফিরল বিকেল বেলায়। জামা পরা পরিপাটি করে। পানের লাল রঙে ঠোঁট দুটো টুকটুক করছে। ঘরে ঢুকেই ফুলঝুরিকে দেখে কেমন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠ্‌ল। মুহূর্তমধ্যে নিজের সে ভাব দমন করে ফুলঝুরির পাশে বসে তার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরল।

'চেহারাডা এত কাহিল লাগত্যাছে ক্যান, ফুলঝুরি?

ফুলঝুরি তার হাত থেকে নিজের হাত মুক্ত করে উঠে বসল বিছানা থেকে। অপাঙ্গে দেখে নিল তাকে একবার। তারপর প্রশ্ন করল চোখের দিকে তাকিয়ে।

'হারাদিন কোথায় ছিলা?'

'ক্যান ইস্টিশানে কাম কইর‍্যা বাড়ি থিক্যা ভাত খাইয়া আবার গেছি কামে। এহন আইত্যাছি।'

'ভাত খাইলে কুতায়?'

'বাড়ি।'

'ঝুট।'

ফুলঝুরির চোখ দুটো রক্তবর্ণ হয়ে উঠ্‌ল।

'মিছা কথা কইবার যায়গা পাওনা, তুমি। কাইল মাঝরাতে আমার কয়লা বেচার পয়সা নিয়া বাইর অইয়া গেছ, আর আইলে এহন।'

'হ-হ। মানে–'

রইস তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরতে উদ্যত হতেই ফুলঝুরি এক ঝটকায় তাকে পাশে সরিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কয়লা কুড়োচ্ছিল সবাই। এখন আর ডিজেল ইঞ্জিনের গাড়ি এলে এখান থেকে সরে যায় না তার প্রয়োজন পড়ে না বলে। ডিজেল ইঞ্জিনও তেমন কৌতূহলের বস্তু নয়–কেবল পাশ দিয়ে শব্দ করে যাওয়ার সময় মুখ তুলে একবার মাত্র তাকায়।

ফুলঝুরির কাজে মন বসছিল না। গত কালের ঘটনায় বেশ মুষড়ে পড়েছে সে। আর যেন পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে পারছে না রইসকে। দিন দিন কেমন যেন রহস্যময় হয়ে উঠছে। আগেই টের পেয়েছিল কিন্তু সন্দেহ করবার সুযোগ পায়নি। কাজ করতে গিয়ে বাঁ দিকে চোখ পড়তেই অবাক হয়ে গেল সে।

সেই লোকটা!

ডিজেল ইঞ্জিনের ড্রাইভার। নীল পোশাক পরা। তার দিকে বিশ্রীভাবে তাকিয়ে সিগারেট টানছে। তাকে দেখে দেহের কাপড় ঠিক করে বসে। ক'দিন থেকেই লোকটা তার দিকে এ-ভাবে তাকাতে শুরু করেছে। ভাল করেই দেখেছে ফুলঝুরি! কি চায় লোকটা? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে তার দিকে তাকায় কেন?

ফুলঝুরি রাহেলা খালাকে গুঁতো দিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'খালা সেই ডিরাইভারটা আইজও আইছে।'

রাহেলা খালা বার কয়েক তাকিয়ে তাকে দেখল। লোকটা মোটেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠ্‌ল না। আগের মতই নির্লিপ্ত হয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। রাহেলা খালা এবার হাতের কাজ ফেলে রেখে উঠে দাঁড়াল। তারপর এক পা এক পা করে তার দিকে এগিয়ে গেল। 'এহানে কি দরকার তুমার?'

'দরকার?'

লোকটা হাসল।

'এমনিই দাঁড়াইয়া আছি। সব সময়েই দরকারের জন্য মান্‌ষে কি দাঁড়াইয়া রয়।'

'তাইলে কাইটায় পড় এহান থিক্যা।'

'ক্যান?'

'এহানে জেনানারা কাম করত্যাছে দ্যাখতেছ না। বেশী বাড়াবাড়ি করলে লোক ডাকুম। সাবধান কইরা দিলাম।'

রাহেলা খালা নিজের জায়গায় ফিরে আসতেই লোকটা চলে গেল সিগারেটটা ফেলে দিয়ে। এল ঠিক আবার পরের দিন। হাতে ছোট একটা ঝোলা। এসে রাহেলা খালার পাশে বসে পড়ল। তার আচরণ দেখে সবাই বিস্মিত হয়ে গেল। লোকটার সাহস কম নয় ত!

কিন্তু লোকটা তাদের দৃষ্টিতে ঘাবড়াল না। নিজের থলি খুলে ভালো পাথুরে কয়লা রাহেলা খালার ঝুড়িতে ঢেলে দিল।

'তুমি বুড়ি মানুষ, এহনও কাম কর ক্যান নানী এত ধকল কি সইব শরীরে? তার চাইয়া আমি মাঝে মাঝে কয়লা আনুম তোমার জইন্যে। আমরা রেলের মানুষ কোন অসুবিধা অইব না।'

রাহেলা খালা তার আচরণে গদগদ হয়ে তার দু'হাত নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরল।

'এত ভাল মানুষ, তুমি ভাই! হেইদিন বড় অন্যায় করছিলাম। মাফ কইরা দিও তুমার বুড়া নানীরে। যে কও! তুমি আবার অপরাধটা করলা!

লোকটা হাসতে থাকে। পকেট থেকে সিগারেট নিয়ে সবার দিকে একবার তাকায়। রাহেলার গল্প মেতে ওঠে। আর কোন বাধা থাকে না পরিচয়ের

তার পরদিন থেকে নিয়মিত আসতে থাকে লোকটা। প্রথম মেয়েদের খারাপ লাগত এখন গা সওয়া হয়ে গিয়েছে। তাদেরও মাঝে মাঝে কয়লা এনে দেয়। তারাও খুশী।

কেবল ফুলঝুরিই তাকে আমল দিত না। কয়লাও নেয়নি। একদিন সে রাহেলা খালাকে স্পষ্টই তার অসন্তোষের কথা জানিয়ে দিল।

লোকডারে আমার বড় ভাল ঠেকে না। ক্যামন ভাব ড্যাব কইরা চাইয়া রয় আমার দিকে। মাইয়া মানুষ কোন্ সময় গায়ে কাপড় থাকে না থাকে ঠিক নাই আমার বড় ভাল লাগে না। ওডা আয় ক্যান এহানে?

'তোর খালি অবিশ্বাস!'

'হ খালা। রহমান ভাইরে ত ভালই লাগে আমাগো।' দলের মেয়েরা তাকে 'লোকটা' বলে না নাম ধরে সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেছে। তাদের কথা শুনে ফুলঝুরি কোন কথা বলে না। কেবল রহমান এলেই সতর্ক হয়ে যায়।

কিছুদিন পর কয়লার ইঞ্জিন আরও দুটো কমে গেল। এখন কেবল মালগাড়ির ইঞ্জিনগুলো থেকে কয়লা পাওয়া যায়। তার ফলে কয়লা কুড়ানী মেয়েদের মধ্যে ভীষণ প্রতিযোগিতা লেগে যায় এবং সেই ধরে পূর্বের আয় কমে যায় অনেক পরিমাণে।

তারা গালাগাল করে ডিজেল ইঞ্জিনকে।

একদিন তারা কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল ডিজেল ইঞ্জিন দেখে, এখন পেছন ফিরে থাকে।

'থু, থু।'

চলন্ত গাড়ি উদ্দেশ্যে খানিকটা থুথু ছড়িয়ে দেয় ফুলঝুরি।

সর্বনাশ হোক ডিজেল ইঞ্জিলের। ফাইটা যাউক মাঝ পথে।'

করিমন বলে হাতের চুড়ি নেড়ে।

'ওটা আমাগো শত্তুর। পরম শত্তুর।'

ফুলমোতিয়া হাতের ঝুড়ি কাঁখে তুলতে তুলতে বলে, এখন তাকে বাড়ি ফিরতে হবে। আজকাল বেশী কাজ করতে পারে না। সেদিন কয়লা বাছতে বাছতে বমিই করেছিল। তাই নিয়ে সবাই হেসে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল তাকে। ওর সোয়ামীর কোন মায়া দয়া নেই। সাত মাসেও বউটাকে বাইরে কয়লা কুড়োতে পাঠায়।

ডিজেল ইঞ্জিন সবচেয়ে ক্ষতি করল ফুলঝুরির। আগের মত কয়লা হয় না বলে আয়ও কমে গেছে বহুলাংসে। অথচ এর জন্যে বাড়িতে রইসের বিশ্রী বকুনী এবং সন্দেহ।

সোদিন পয়সা নিয়ে বাড়ি যেতেই গালাগাল দিয়ে উঠল।

'এহন সাত আনা অয় ক্যান'? আগে দেড় ট্যাহা অইত ক্যামনে'? কার সাথে বেড়াইতে যাস?'

ফুলঝুরি সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'এই কথা বলবার মুখে বাধল না তুমার? এত নীচ তুমি?'

'কি কইলি? আমি নীচ? এত আস্পর্ধা তোর'? রইস ক্রুদ্ধ হয়ে হিড়হিড় করে ঘরে টেনে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। বাইরে থেকে একটা অস্পষ্ট গোঙ্গানির শব্দ শোনা যায়। আশেপাশের বাড়ির বেড়ার ছিদ্রগুলো হঠাৎ সকর্ণ হয়ে ওঠে।

তিনদিন পর আবার কয়লা কুড়োতে গেল ফুলঝুরি। অন্যান্য মেয়েরা তার দিকে একবার চাইল মাত্র আর কোন কথা বলতে সাহস করল না। এতক্ষণ করে তারা যে গল্প করছিল হেসে হেসে তা হঠাৎ থেমে গেল তাকে দেখে। ফুলঝুরি কারুর দিকে না তাকিয়ে একমনে কাজ করতে লাগল। আজ তাকে এদের তুলনায় অত্যন্ত ছোট মনে হতে লাগল।

হিস্ হিস্ শব্দ করতে করতে ডিজেল ইঞ্জিন চালিত বিরাট ট্রেনখানা স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ার খানিকক্ষণ পরেই রহমান থলি ভর্তি কয়লা নিয়ে এগিয়ে এল কয়লা কুড়ানীর ছোট দলটির দিকে।

'রহমান ভাই যে! আও আও! বও এহানে।'

সবাইকে সচকিত এবং বিস্মিত করে দিয়ে সবার আগে ফুলঝুরি অভ্যর্থনা করল তাকে। রহমানের মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সে তার থলি থেকে কয়লা ঢেলে দিল ফুলঝুরির চুপড়িতে।

'কাইল দু' থলি আইন্যা তোমাগো দিব। ফুলঝুরিরে এই পরথম দিলাম কিনা–এতদিন ত নেয় নাই ও–তাই আইজ সবই দিলাম ওরে।'

মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল রহমান। তাদের চোখের চাহনিতে অসন্তোষের চিহ্ন থাকলেও মৃদু হেসে তার কথার সমর্থন করল।

রহমান ফুলঝুরির পাশে বসে গল্প করতে লাগল তন্ময় হয়ে। তার খেয়াল হ'ল ট্রেনের হুইসেলের কাছে থেকে বিদায় নিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে ছুটে গেল ইঞ্জিনের দিকে।

কয়লা বেচার পর ফুলঝুরি পয়সা গুণে দেখল আড়াই টাকা। এক টাকা হাতে রেখে বাকীটা সে আঁচলে বেঁধে কোমরে গুঁজে রাখল। এবার থেকে সে পয়সা

লুকিয়ে রাখবে। রইসকে জানতেও দেবে না। বাজার থেকে বাড়িতে ঢুকে দেখল রইস ঘরের দাওয়ায় বসে বিড়ি খাচ্ছে। তাকে একবার অপাঙ্গে দেখে ফুলঝুরি ঘরে ঢুকে পড়ল। কোমরে গোঁজা পয়সাগুলো বিছানার নীচে লুকিয়ে রাখতে গিয়েই সে অবাক হয়ে গেল। সেখানে একটা নতুন লাল শাড়ি আর ব্লাউজ। হঠাৎ তার চোখের সামনে প্রতিবেশীদের সন্দেহের কথা মনে পড়ে গেল। নলাপাড়ায় কোন এক মেয়ের বাড়িতে নিয়মিত যায় রইস। সেখানে রাতও কাটায় অনেক সময়। একথা শুনে প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেনি। ভেবেছিল, প্রতিবেশীরা তাদের সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরাতে চেষ্টা করছে। আজ আর অবিশ্বাস করতে মন চাইল না। বিছানা নামিয়ে রেখে সে সেখানেই বসে রইল চুপ করে। ওঠার শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলেছে।

কয়লা বিক্রী করে বাড়ি ফিরছিল ফুলঝুরি। বাজারের মোড় ঘুরতেই দেখা হল রহমানের সঙ্গে। থমকে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে।

'তুমি?'

'হ। তোমার লগেই যাচ্ছিলাম। এহানে দেখা অইয়া ভালই অইল। লও দেহি, এই ফুলেল তেলের বোতল তোমার জইন্যে আন্যাছি। খুব নামকরা কোম্পানির তেল। এমন সুন্দর চেহারায় মাথা উস্কোখুস্কো থাকলে দ্যাখতে ভাল লাগে না। তেল দিয়া খোঁপা বাঁইধো।'

ফুলঝুরি কিছু বলার আগেই রহমান তেলের বোতল তার হাতে গুঁজে দিল। তারপর চারদিকে তাকিয়ে থুতনিটা একবার নেড়ে দিয়ে হন হন করে চলে গেল একদিকে। ফুলঝুরি তন্দ্রাগ্রস্তের মত বোতলটা হাতে নিয়ে বাড়ি ঢুকে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল। নিজের কাছেই নিজেকে কেমন যেন তার অস্বাভাবিক লাগছে। বোতলটা দুর্বল হাতে তুলে একবার দেখল। তারপর কি মনে করে সেটারে একপাশে ছুড়ে ফেলে দিল। চারদিকে তেল ছড়িয়ে পড়ে গন্ধ ছড়াতে লাগল। সে গন্ধে যেন মাথা ধরতে লাগল ফুলঝুরির। ঘরে ঢুকে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে সেখানেই বসে পড়ল তন্দ্রাগ্রস্তের মত।

রইস বাড়ি ফিরল দু দিন পর। তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল ফুলঝুরি। এ যেন আগের রইস নয়– সম্পূর্ণ নতুন মানুষ। কোনক্রমেই চেনা যায় না। চুল পরিপাটি করে ছাঁটা। পরণে নতুন জামা কাপড়। দেখলে সাহেব সাহেব মনে হয়। তার ঘরে ঢুকতে দেখে খাড়া হয়ে উঠল। নিজের সব দুর্বলতা এক মুহূর্তে বর্জন করে সরল হয়ে দাঁড়াল।

দাঁড়াও।'

তার কথার ঢঙে রইস রীতিমত বিস্মিত হয়ে গেল। এ যেন ফুলঝুরির কণ্ঠস্বরই নয়। সর্পিনীর নিশ্বাস। রইস দাঁড়িয়ে পড়ল।

'কোথায় ছিলে দু'দিন'?'

'কি? তার জইন্যে তোমাবে কৈফিয়ৎ দিতে অইব নাহি?

'হ। আমি তোমার বউ। তুমি আমার সোয়ামী। এ কথাডা ভুলত্যাছ কেন? তোমারে জিগাবার অধিকার আছে আমার। আমার কথাডার জবাব দাও।'

রইস অবাক হল না–নিজের সমস্ত শক্তি যেন খানিকক্ষণের জন্যে হারিয়ে ফেলল। তার কাজের জন্যে ফুলঝুরি কোনদিন কৈফিয়ৎ চাইবে এ ছিল তার কল্পনার বাইরে।

চমক ভাঙতেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠ্ল রইস। বিকৃত কণ্ঠে বলল, তোর তাতে কি কোথায় আমি থাহি আর না থাহি।'

একবার ভেবে নিল ফুলঝুরি।

'আরও একডা কথা জিগাইবার আছে তোমারে। হেইদিন যে শাড়ি আর জামা দেখছিলাম সেগুলোও কি তারে দিয়া আইছ?'

রইস নিজকে আর সামলাতে পারল না। এক ধাক্কা দিয়ে মেঝেতে ফেলে দিল ফুলঝুরিকে। তার বুকের ওপর উঠে বসে বলল, 'হ, তারেই দিছি। আরও শোন, তারে কাইল আমি শাদী করছি। আর কি হুনতে চাস, ক?'

আর কিছু শোনার ছিল না ফুলঝুরির। তার চোখ দুটো ভারাক্রান্ত হয়ে উঠ্ল এবং সেই সঙ্গে সারা মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল ছাইয়ের মত। বিবর্ণ চোখের প্রান্ত বেয়ে দু' ফোটা তপ্ত পানি গড়িয়ে পড়ল দু' পাশে।

রইস তাকে পা দিয়ে একবার ধাক্কা মেরে বের হয়ে গেল ঘর থেকে।

ফুলঝুরি চোখ মেলে তাকিয়েছিল খোলা আকাশের দিকে। কয়েক খণ্ড নীল মেঘ ভেসে যাচ্ছে দূর দূরান্তরে। সেদিকে চেয়ে তার মনে পড়ে গেল এ-বাড়িতে প্রথম প্রবেশের কথা। লাল চেলি পরে রইসের পাশে পাশে ভীরু পদক্ষেপ ফেলে সে এসেছিল। তারপর এখানে কেটে গেছে সাত বছরের দীর্ঘ জীবন। রইসের কাছে নিজেকে সে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত করে দিয়েছিল। কিন্তু তার বদলে আজ কি পেয়েছে? যে স্বামীকে সে এত বিশ্বাস করেছে তার কাছ থেকেই পেয়েছে চরম অবিশ্বাসের তীক্ষ্ণ অস্ত্র। তার মর্যাদা হয়েছে অস্বীকৃত। জীবনের মূল্য স্বীকৃত হয়নি। ফুলঝুরির চোখ ঝাপসা হয়ে যায়। কিন্তু সে কাঁদে না। হঠাৎ দুর্বলতা পরিহার করে উঠে বসে।

উঠতেই তার দৃষ্টি পড়ে দরজার দিকে। রহমান ঢুকছে বাড়িতে। ফুলঝুরি তার দিকে তাকিয়ে থাকে অনিমেষ নয়নে। রহমান সোজা এসে ঢোকে ঘরের মধ্যে। ফুলঝুরির মাথায় নিজের একটা হাত রেখে বলে, 'আমি সব হুনছি ফুলঝুরি। হেই জন্যেই আইছি তোমার কাছে। এহানে থাইক্যা অইব কি? তার চাইয়া চল আমার সাথে। সুখে সংসার করব দুজনায়। কি কও?'

ফুলঝুরি তার মুখের দিকে তাকাল—কোন কথা বলতে পারল না।

রহমান তাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দেয়। শেষে যাওয়ার আগে তার কানে কানে পরামর্শ দেয়। আজ সন্ধ্যের পর যে ট্রেন আসবে তার মধ্যে থাকবে সে। সেই ট্রেনেই নিয়ে যাবে ফুলঝুরিকে। ফুলঝুরি যেন কয়লা কুড়ানোর জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। কোন ভুল হলে সমস্ত পরিকল্পনা নষ্ট হবে। নিজের কর্তব্য মনে থাকে যেন তার।

সন্ধ্যের আগেই ঠিক হয়ে নিয়েছে ফুলঝুরি। নিজের মনকে শক্ত করেছে নানা যুক্তি দিয়ে। এখানে থেকে কোন লাভ নেই। তার মূল্য যেখানে নেই সেখানে অবহেলিত হয়ে থাকবে না কিছুতেই। হোক না সে বিবাহিতা। স্বামী তা তার প্রতিশ্রুতির দায়িত্ব পালন করেনি। বাইরের দিকে চেয়ে ফুলঝুরি দেখল সন্ধ্যের অন্ধকার আস্তে আস্তে প্রসারিত হচ্ছে পৃথিবীর ওপর। পৃথিবীর বর্ণ ক্রমশ হয়ে উঠেছে তামার মত বিবর্ণ।

সন্ধ্যের পরই বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল ফুলঝুরি। বাড়ির দিকে একবার তাকাল মাত্র। তারপর হনহন করে হাঁটতে লাগল যেখানে তারা কয়লা কুড়োত সেই দিকে। মনে পড়ল একটু পরেই রইস নিজের নব-বিবাহিত স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ি আসবে। তাকে না দেখে আশ্বস্তই হবে। তাড়াতাড়ি চলতে গিয়ে কয়েকবার হোঁচট খেল সে। তবুও থামল না কিংবা পায়ের দিকে একবার চেয়েও দেখল না।

কলের কাছে রহমান দাঁড়িয়ে ছিল। অস্থিরভাবে সিগারেট টানছিল। তাকে দেখে জ্বলন্ত সিগারেটটা একদিকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে তার হাত ধরল। ফুলঝুরি তখন কাঁপছে। রহমান তাকে একরকম পাঁজাকোলা করেই ইঞ্জিনের দিকে নিয়ে যেতে লাগল।

ট্রেন ছাড়ার সিগন্যাল পড়ে গিয়েছিল। পেছনে থেকে গার্ড তাঁর হুইসেল বাজিয়ে হাতের বাতি দেখাচ্ছিলেন। ফুলঝুরিকে নিয়ে রহমান এক লাফে ইঞ্জিনের ভেতরে গিয়ে উঠল। সে তখনও কাঁপছে ওপরে উঠে অবাক হয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল। মনে হল সে একবারও ভাবেনি ডিজেল ইঞ্জিনের চড়েই তাকে অন্য দেশে যেতে হবে। তার নিবিড় জায়গায় আর কয়লা কুড়োতে হবে না।

ট্রেন তখন চলতে শুরু করে দিয়েছে। চারদিকে পরিচিত বস্তুগুলো ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ফুলঝুরি বসেছিল, হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। রহমান তাড়াতাড়ি তার কাছে সরে এসে তাকে দু' হাত দিয়ে ধরে ফেলল।

'উঠতাছ ক্যান? পইড়া যাবে যে।'

'তোমাগো ইঞ্জিলে বড় কয়লা উড়ত্যাছে। আর চোখ দুডা ঝাপসা অইয়া গেল। কিছুই যে দ্যাখতে পারতাছি না।'■

বৃত্ত

এতক্ষণ ঘরের চারদিকে অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল লায়লা। কেন যে সে এমন করছে তা নিজের কাছেই স্পষ্ট ছিল না। হঠাৎ মনে পড়ায় হাঁটা থামিয়ে চেয়ারে বসে পড়ে একটা ম্যাগাজিন টেনে নিল। খানিকক্ষণ আগেই এটা এসেছে। অন্যদিন হলে ততক্ষণ পত্রিকার মধ্যে ডুবে যেত। কিন্তু এখন পর্যন্ত ওটা খোলাই হয়নি। লায়লা সেদিকে তাকিয়ে পত্রিকাটা খুলে সূচীপত্র দেখতে লাগল। দু' তিনবার দেখেও সম্পূর্ণ সূচী পড়তে পারল না। প্রতিবারেই অন্যমনস্কতা এসে তার দৃষ্টিকে ভারাক্রান্ত করে তুলল। পত্রিকাটা টেবিলের ওপর রেখে চেয়ার থেকে উঠে পড়ল সে। র‍্যাকের অবিন্যস্ত বইগুলো দেখতে গেল—আর তখনই অন্য ইচ্ছা এসে ওকে আবার অন্যদিকে টেনে নিয়ে গেল। লায়লা জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বাইরের ছোট বাগানের দিকে তাকাল। নিজের হাতে রচনা করা বাগান। অনেকগুলো গোলাপ গাছে ফুল ধরেছে। অথচ আজ ওব ইচ্ছাই হল না সেগুলোর মধ্যে থেকে একটা তুলে খোঁপায় গুঁজে আয়নার দিকে চেয়ে থাকুক এক দৃষ্টিতে। ততক্ষণ পর্যন্ত সে আয়নার সামনে থেকে উঠবে না যতক্ষণ না ওর চোখ দু'টো আস্তে আস্তে নিমীলিত হয়ে আসবে। নিমীলিত হবে আরক্তিম লজ্জায়। কারণ অবশ্য সবসময় মনে মনেই বিশ্লেষণ করলো লায়লা। গোলাপগুলোর দিকে তাকিয়ে আজ গত বিশ্লেষণ-মুখর মনের অস্পষ্ট একটা চিত্র তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। কিন্তু তার প্রতি সে বিশেষ গুরুত্ব দিল না। আজ সে এলোমেলো যুক্তি বা ভাবনা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

গোলাপ ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে লায়লার মনে হল এগুলো পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়নি। অনেকটা যেন ক্লান্ত? কথাটা মনে হতেই সে জানালার পাশ থেকে সরে এল ঘরের মধ্যে। বাইরে থেকে বাতাস আসছিল, তবু মনে হল ঘরের আবহাওয়া অত্যন্ত ঝাপসা। ফ্যানের রেগুলেটর ঘুরিয়ে চেয়ারে মাথা দিয়ে ও বসে রইল চুপ করে। সেখানে ক্লান্তির বারিপাত হচ্ছে বিন্দু বিন্দু।

কখন যে ওর চোখ আপনা আপনিই খুলে গিয়েছিল তা জানে না। উৎকর্ণ হয়ে উঠল পাশের ঘরের ঘড়িতে চারটে বাজার শব্দে। গুণে গুণে দেখল হাঁ, চারটেই বেজেছে। তাহলে সত্যি সত্যিই চারটে বাজল? তার মনে হয়েছিল আজ কোন সময়েই চারটে বাজবে না অনন্তকালের সীমায় চারটের রেখা হারিয়ে গেছে। তাই প্রথম সে অনেকক্ষণ চোখ দু'টো উঁচু করে তুলে রইল ঘরের সিলিং-এর দিকে।

মাকড়সার জালে একটা মাকড়সা বোধহয় শিকারের আশায় ওৎ পেতেছিল। একটা মাছি ভন্ ভন্ করে উড়ে সেদিকে যেতেই জালে পা আটকে গেল। মাছিটা প্রাণপণে নড়তে লাগল মুক্তির জন্যে। আর অপেক্ষমান মাকড়সা আস্তে আস্তে এগোতে লাগল সেদিকে প্রায় কাছে এসে পড়ল সে। হঠাৎ চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠল লায়লা। ঘরের একপাশে ঝুলঝাড়া লগাটা নিয়ে মাকড়সার জাল থেকে মাছিটাকে ছাড়িয়ে দিয়ে চেয়ারে বসে হাঁপাতে লাগল।

নিজের কথা মনে করে নিজেই প্রচণ্ডভাবে বিস্মিত হল। হঠাৎ ছোট একটা ঘটনায় সে এমন উত্তেজিত হয়ে উঠল কেন? কতদিন ত সে দেখেছে মাছিরা উড়তে যাওয়ার সময় মাকড়সার জালে আটকে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে। কোনদিন সে বিচলিত হয়নি। অথচ আজ? এখনো তার বুক কাঁপছে! লায়লা তার বিস্মিত দৃষ্টি একপাশে ফেরাতেই প্রবলভাবে দ্বিতীয়বারের জন্যে চমকে উঠল। ওর দৃষ্টি তখন গিয়ে পড়ছে ছোট শো-কেসটার দিকে। সেখান থেকে নাজমুলের ফটো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এখনো সে ওটা সরায়নি? সে ত নাজমুলের সমস্ত স্মৃতি গতকাল নষ্ট করেছে! ওটাই একমাত্র দৃষ্টির অন্তরালে থেকে গেছে! লায়লার সমস্ত দেহ কেঁপে উঠল। স্খলিত পদে সেদিকে এগিয়ে গিয়ে ফটোটা স্ট্যান্ডশুদ্ধ বের করে এনে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। এখান থেকে নীচে ফেলে দিলে ফটোর আর কোন অস্তিত্ব থাকবে না। চূর্ণ-বিচূর্ণ কাচের সঙ্গে বিকৃত মুখ তখন চেনা যাবে না। লাযলা নিজের সমস্ত ক্রোধ একসঙ্গে করে ফটোটা ফেলতে গেল। কিন্তু ও পারল না। নিজের দিকে চেয়ে দেখল তার হাত ওপরে ওঠেনি বরং দু' হাত দিয়ে সে ফটোটা আরও জোরে চেপে ধরে রয়েছে। এবার কেঁদে ফেলল লায়লা। এতক্ষণের সমস্ত পুঞ্জীভূত বেদনা একসঙ্গে ফটোর ওপর বিন্দু বিন্দু জমা হতে লাগল মেঘলা আকাশের কোণে রোদ-হাসির মত।

লায়লা ফটোটা হাতে করে বিছানায় এসে শুয়ে তার ওপর মুখ রেখে কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। গতকাল পর্যন্ত ফটোর সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল কিন্তু আজ আর নেই। নকল চূণকামের তলাকার প্রকৃত পরিচয় সে প্রকাশ করে দিয়েছে। এতক্ষণ হয়ত সে চিঠি নাজমুলের হাতে পড়েছে। চিঠি খোলার পর তার উজ্জ্বল মুখখানা হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। কী করবে বুঝতে পারছে না সে। নাজমুলের বর্তমান মূর্তি নিজের চোখের সামনে বিছিয়ে ধরে লায়লা। ওর মন হঠাৎ যেন খুশিতে আত্মহারা হয়ে ওঠে। তার ত দুঃখ করার কোন অর্থ নেই, তাকে একজন পুরুষ বিনাদোষে যেভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল, সেও সেইভাবে তার নতুন পট তৈরী করেছে মাত্র। লায়লা ত তাই চেয়েছিল এতদিন ধরে। তার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে। যে মুহূর্তে একজন পুরুষ তাকে গভীরভাবে ভালবেসেছে তখনই তাকে জানিয়ে দিয়েছে এতদিন ধরে সে ভালবাসার অভিনয় করেছিল—গত অভিনয়ের উত্তর দিতে। লায়লা হাসল। মনে মনে।

একথা সে ফারুকের চিঠি পাওয়ার আগ পর্যন্ত বোঝেনি। বোঝা অস্বাভাবিক ছিল বলেই বোঝার প্রয়োজন মনে করেনি। অথচ তাকে বুঝতে হয়েছিল। তাকে একজন সরল যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল। নিজের কোন যুক্তি ছিল না বলে অন্যের যুক্তিকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। প্রথমে সে অবাক হয়েছিল, পরে বিস্মিত ভাব কেটে গিয়েছিল ঘোলাটে আকাশ পরিষ্কার হওয়ার মত।

তারা দু'জনেই ছিল কল্পনা-বিলাসী। বোধহয় এখানে লায়লা সবচেয়ে বেশী ভুল করেছিল। তাদের মধ্যে একজনের কল্পনার মাত্রা কম হলে সম্পর্কের ভেতরে ফাটল সৃষ্টি হত না। হয়েছিল, কেননা বাস্তবের চেয়ে কল্পনা বেশী প্রশ্রয় পেয়েছিল। তবু প্রথমে কেউই বুঝতে পারেনি তাদের সম্পর্ক মিথ্যে হবে। দু'জন মাঝখানে দু' দিকে মুখ ফিরে দাঁড়াবে।

লায়লা নিজেকে তখন সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করেছিল ফারুকের কাছে। তার মধ্যে ও নিজের সত্তা পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা দেখেছিল। তাই সঙ্কোচ কাটাতে দ্বিধাবোধ করেনি। ফারুকের বুকে মাথা রেখে ও চোখ বন্ধ করে রইত। ফারুক তার নরম হাত পীড়ন করতে করতে এক সময় ওর কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে কথা বলত।হ্রস্ব শব্দ শুনে লায়লা লজ্জায় একদিকে মুখ ফিরিয়ে রইত। আর সে সময় ফারুক ওর ঠোঁট দুটো পীড়ন করত। লায়লা নিজের হাত ওর পিঠে মেলে অল্প অল্প নাড়ত তখন।

শেষে দু'জন পাশাপাশি বসত। কখনও লায়লা তার ডান হাত ফারুকের এক হাঁটুর ওপর রাখত। কোন সময়ে বা ফারুক ওর বেনীটা আধভাঙা করে নিজের ঘাড়ে টেনে আনত। তারপর কথা বলত ওরা।

সে সময়ে ওরা দু'জনেই ছাত্র।

'পরীক্ষা ত এসে গেল।'

'বেশ, তাতে ক্ষতি কী? এরপর তুমি চাকরী করবে আর আমি বি-টি-টা শেষ করে নেব। তাহলে আর কোন অসুবিধে হবে না। তারপর—'

'তারপর আমি জানি। কিন্তু তারপরের আগের সমস্যাই প্রধান।' দু'জন তখন চুপ করে থাকত। ভবিষ্যৎ নিয়ে এই রকম টুকরো টুকরো কথা হ'ত তাদের।

এর পরের ঘটনা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। ফারুক লায়লাকে অস্বীকার করে চিঠি লিখল।

তোমাকে আমি আগামী ভবিষ্যতের জন্যে গ্রহণ করতে পারব না। এর কারণ হয়ত জানতে চাইবে। কিন্তু তা অনুল্লিখিতই থাকুক। কেননা, তাতে তুমি কষ্ট পাবে।'

চিঠি পেয়ে লায়লা প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেনি। সোজা এসে দাঁড়িয়েছিল ফারুকের সামনে। চিঠিতে যতই স্পষ্টবাদী হোক না কেন লায়লাকে সামনে দেখে একটা অস্বস্তি অনুভব করেছিল। তাকে সহজভাবে এড়ানোর জন্যে বলেছিল, আমি ত চিঠিতে সবকথা লিখেছি।'

'আমি বিশ্বাস করতে পারছিনে এগুলো সত্যি করে বলো চিঠির কথা কী সত্যি লিখেছ?'

'হ্যাঁ।'

'তার মানে এতদিন পর আমাকে অস্বীকার করতে চাইছ তুমি? কিন্তু আমরা যে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছি! সেখান থেকে যে ফেরা যায় না।

ফারুক কোন উত্তর দেয়নি। দেওয়ার মত উত্তর তার ছিল না। তাই ছদ্ম আবরণে নিজেকে ঢাকতে চেয়েছে নীরবতা দিয়ে তার উদ্দত পৌরুষ মাথা নীচু করে থেকেছে।

লায়লা শেষে চলে গিয়েছিল নিঃশব্দে। তার সব জানা হয়ে গিয়েছিল। পুরুষ জাতির প্রকৃত সত্তা তার কাছে ধরা পড়েছিল সেদিন। যাওয়ার সময় তার মনে হয়েছিল এ-বাড়ী যেন তার কত অপরিচিত, কোনদিন সে আসেনি এর আগে। গল্প করেনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা নির্জন একটি ঘরে।

পাশে পড়ে থাকা ফটোর দিকে একবার চাইল লায়লা। সারা মুখে কেমন একটা সরলতার হাসি ছড়ান। কিন্তু এও ত মিথ্যে হতে পারে, যেমন হয়েছিল এক বছর আগে। ঘড়িতে সাড়ে চারটে বাজার শব্দ হল। ঘণ্টার শব্দে আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল সে। অন্যদিন হলে সে এখন প্রসাধন করে প্রস্তুত হয়ে থাকত ঘরে। তারপর ঘড়ির কাঁটা পাঁচটার ঘরে যাওয়া মাত্র সে সিঁড়ি ভেঙে নীচে যেত। ছোট একতলা বাড়ীর সামনে গিয়ে নেমে পড়ত। জানালার দিকে তাকালেই দেখা যেত তোমার সিগারেটের ধোঁয়া ভরে গেছে। লায়লা বাড়ীতে বা ভেতর থেকে নাজমুল বলত, 'এস।'

লায়লা প্রত্যেকবারই অবাক হয়েছে। সে পা টিপে টিপে চললেও টের পেত নাজমুল। এর কোন ব্যতিক্রম হয়নি।

ঘরে ঢোকার আগে কোনদিন বাড়ীর ভেতরে নজর পড়ত। নাজমুলের ছোট বোন হাসনা মুখ টিপে হাসত তাকে দেখে। তারপর হেসে ছোট একটা কিল তুলে নাজমুলের ঘরে অবস্থানের খবর দিত যদিও তার কোন প্রয়োজন হত না। ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসে জুতোর ফিতে খুলতে লেগে যেত লায়লা।

আমার জুতো পায়ে রাখলে পা বড় ঘামে বিরক্তি লাগে বলে কোন কিছু মনে করো না।'

বরং আনন্দিত হওয়ারই কথা। কেননা, তাতে আমার খরচ বাঁচবে।'

হেসে বলত নাজমুল।

'সেটা তখনই বিবেচনা করা যাবে।'

'বেশ। কিন্তু অতদূরে থাকছ কেন? ভয় করে থাকি?'

'খুবই স্বাভাবিক। কোন কিছু শেষ হওয়ার আগে তোমাদের বিশ্বাস নেই। তোমরা ব্যবসায়ীর জাত।'

'অভিজ্ঞতা প্রচুর দেখছি।'

'এ বয়সে এতখানি না হলে ছেলে মানুষের পর্যায়ে পড়ে যেতাম। সেটা তোমার পক্ষেও শোভন বলে মনে হত না। ভাবতে, একজন শিশুর সঙ্গে কথা বলছ। যেন ভাল লাগত না।'

'চমৎকার। যে কোন তার্কিককে হারাতে পার।'

সে ইচ্ছা নেই।'

'একজনকে হারালেই খুশী, কী বল?'

তার কোন উত্তর দিত না সে।

একটু পরেই হাসনা চা আর মিষ্টি নিয়ে আসত।

'কী ব্যাপার বলত, প্রত্যেকদিন এ-সব কেন? আমার ভাল লাগে না।'

লায়লা প্রত্যেকদিনই অনুযোগ করত। অবশ্য কেউ তার কথা কোনদিন শোনেনি।

চায়ের পেয়ালা টেনে নিয়ে নাজমুল তাকাত লায়লার দিকে।

'অমন করে তাকাচ্ছে কেন আমার দিকে?'

তোমাকে দেখছি।'

সে বুঝেছি। কিন্তু প্রত্যেকদিনই ত দেখি এমনি যে তাকিয়ে দেখ। আশা কী মেটে না, নাকি?'

'না। রূপ-দর্শনের নেশার শেষ নেই।'

নাজমুলের কথা শুনে খানিকক্ষণ চিন্তা করত লায়লা। রূপ-দর্শনের ব্যাখ্যা খুঁজত অতীতের দিকে তাকিয়ে।

'হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেলে যে?'

ও-ভাবে আমার দিকে তাকালে লজ্জা লাগে।'

বেশ। তাহলে লুকিয়ে দেখব। আমাদের বাড়ীর সবাই তোমার সম্পর্কে কী বলে জান? স্নিগ্ধ আর শান্ত মেয়ে।'

তারপর নিজেই খানিকক্ষণ হাসত নাজমুল।

লায়লা গম্ভীর হয়ে যেত।

'তোমাকে মাঝে মাঝে আমার বড় অদ্ভুত লাগে। যেন সম্পূর্ণভাবে ধরা দিতে চাও না খানিকটা ইচ্ছা করেই।'

নির্জন ঘরে লায়লার হাত চেপে ধরে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল নাজমুল।

নাজমুলের স্পর্শে কেঁপে উঠেছিল লায়লা। নিজেকে দূরে সরিয়ে এনেছিল সঙ্গে সঙ্গে।

'কেউ এসে পড়বে, তখন ভাববে কী বলত? ছিঃ! দূরে যাও তুমি।'

নাজমুল লজ্জিতভাবে নিজের জায়গায় ফিরে গিয়েছিল।

'আমার প্রশ্নের উত্তর?'

'কাছে আসার এখনও ত সময় হয়নি! সেদিন তোমাকে কোন অনুযোগ করতে হবে না এজন্যে। নিজেই ধরা দেব আমি।'

ঘরে ঢুকতেই সেদিন নাজমুল লায়লাকে দু'হাত দিয়ে কাছে টেনে নিয়েছিল। লায়লা নিজেকে সরিয়ে নিয়ে বলে, কী ছেলেমানুষের মত যা তা করছ'?

যা তা নয়। শোন আজ বাড়ীতে তোমার বিয়ের সম্পর্কে প্রায় সব ঠিক করে ফেলেছি। এখন তোমার সম্মতি পেলে তোমাদের বাড়ীতে প্রস্তাব করতে পারি।'

লায়লার সারামুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল নাজমুলের কথা শুনে।

না, না তা যে কোন মতেই হতে পারে না। সে তার প্রেমে পড়েনি–প্রেমের অভিনয় করেছে এতদিন। শুধু প্রতারণা মাত্র।

মুখে কোন কথা বলতে পারল না লায়লা। তার অবস্থা দেখে নাজমুলের উৎসাহ নিভে গেল মুহূর্তে।

'কী হয়েছে তোমার? অমন করছ কেন?'

'আমার শরীর ভাল নেই। একটা রিক্সা ডেকে দাও তাড়াতাড়ি করে।'

রিক্সায় বাড়ী এসে বিছানায় এলিয়ে পড়েছিল লায়লা। ঘামে সারা দেহ ভিজে গিয়েছিল। কিন্তু ততক্ষণ স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে সে, আর দেরী করবে না, কালই জানিয়ে দেবে নাজমুলকে সব কথা। তারপর দেখবে ব্যথার আগুনে কেমন করে সে দগ্ধ হয়, যে ভাবে সে এক বছর আগে দগ্ধ হয়েছিল। যার জ্বালা এখনও নিঃশেষ হয়নি।

নিজের অলক্ষিতে আবার কখন নাজমুলের ফটো হাত দিয়ে ধরেছে তার প্রতি খেয়াল ছিল না লায়লার। সমস্ত স্বাভাবিক চেতনা যেন সে হারিয়ে ফেলেছে। ফটোর দিকে তাকাতে তাকাতে তার ক্লান্ত মাথা আপনিই তার ওপর নত হয়ে পড়ে। যেমন করে নত হয়ে পড়েছিল তার সামনে। সেকথা ভাবলে আজ কম বিস্মিত হয় না।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রথম পরিচয় হয় নাজমুলের সঙ্গে। লায়লা চা খাচ্ছিল গান গাওয়ার পর। নাজমুল এসে দাঁড়িয়েছিল ওর সামনে।

'আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছি সুন্দর গানের জন্যে।'

'না, না, এতে ধন্যবাদের কী দরকার!'

নাজমুলের চোখের দিকে দৃষ্টি পড়তেই ওর মাথা আপনা আপনিই নত হয়ে এসেছিল। চোখ দুটো কেমন স্নিগ্ধ। কিন্তু এক মুহূর্তে নিজের দুর্বলতাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেয়নি।

'বসুন না, দাঁড়িয়ে কেন।'

দু'জনের মধ্যে আলাপ জমে উঠেছিল। তারপর ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে তারা। প্রায়ই কোন পিকনিক, সিনেমা অথবা জলসায় যেত।

'চলুন, আজ 'এল্-সিড দেখে আসি। অনেকদিন ধরে প্রতীক্ষা করছিলাম বইটার।'

'বেশ ত। ভাল বই যখন।'

সিনেমা হলের একপ্রান্তে বসে তারা। পর্দার বুকে অভিনয়ের ক্রীড়া চলে। নাজমুল আলো-আবছার মধ্যে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে লায়লার দিকে। লায়লা তা স্পষ্ট অনুভব করে কিন্তু বুঝতে দেয় না তাকে।

'মাঝে মাঝে আমার কী মনে হয় জানেন?'

লায়লা তার মুখের দিকে তাকায়।

'চার্লস হেস্টনের মত হারিয়ে যেতে। অতবড় যোদ্ধা তারও প্রয়োজন হয় সোফিয়াকে।'

'অদ্ভুত কল্পনাবিলাসী দেখছি আপনি।'

নাজমুল আহত হয়। কল্পনাবিলাসী শব্দ সে মোটেই পছন্দ করে না।

চেয়ারের হাতলের ওপর দু'জনের হাত মাঝে মাঝে স্পর্শ করে। লায়লা ইচ্ছা করেই সরিয়ে নেয় না। ওর অকারণে হাসি পায়। তার অর্থ ও জানে, মনে করতে চায় না বলেই হাসতে চায়।

'মেয়েরা কী আপনার মতই দুর্বোধ্য নাকি বলুন ত? একদিন প্রশ্ন করেছিল নাজমুল।

'দুর্বোধ্য কি-না জানিনে, তবে হওয়াটাই ভাল বলে মনে হয়। নয়তো তাড়াতাড়ি তাদের জয় করে নিল মেয়েদের সম্ভ্রমে বাধে। আপনাদের পৌরুষত্ব যা ঠুন্‌কো জিনিস মেয়েদের রহস্য তাড়াতাড়ি আবিষ্কার করে ফেললে তাতে হয়ত আর নতুনত্ব খুঁজে পাবে না। এ ক্ষেত্রে দুর্বোধ্য হলে দু'পক্ষেরই লাভ।'

আপনারও এই মত নাকি?'

'সেটার উত্তর তেমন প্রয়োজনীয় নয়।'

পাশের ঘরের ঘড়িতে পাঁচটা বাজার শব্দ হল। লায়লা তন্দ্রাগ্রস্তের মত বিছানা ছেড়ে উঠল। ফটোটা তখনও তার হাতের দু'মুঠো দিয়ে ধরা। অশ্রুর দাগ পড়েছে পরিষ্কার কাচের ওপর। সেদিকে তাকিয়ে ও শাড়ির আঁচল দিয়ে দাগগুলো মুছল। হঠাৎ তার মনে দ্বিধা জাগল, সে কী সত্যি অভিনয় করে এসেছে এতদিন ধরে? সে কী তা পেয়েছে? নিজের দিকে তাকিয়ে ভীষণভাবে চমকে উঠল লায়লা। প্রচণ্ড স্বরে তার বলতে ইচ্ছা হল হ্যাঁ, সে তা পেরেছে, সে জয়ী হয়েছে, সে জয়ী হয়েছে। লায়লা বিছানা থেকে উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

তখন পাঁচটা বাজল। নাজমুল নিশ্চয়ই বাড়ীতে ফিরেছে! তার চিঠি পড়ে কী ভাবছে সে? তার মুখের অভিব্যক্তি মনে করতেই তার সারা মুখ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ওঠে। নাজমুল যখন যা করে লায়লা তাতে কথা করেছে তখন সে কী ভাবে।

লায়লার মাথা ঘুরে উঠল। টেবিলের ওপর মাথা রেখে প্রকৃতিস্থ হতে চাইল সে। তারপর স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে প্রতিদিনের অভ্যেস মত নীচে নেমে গিয়ে রিক্সার জন্যে দাঁড়িয়ে রইল গেটের পাশে।■

নায়িকার মন

আলোটা তখন থেকেই জ্বলছে। নেভানো হয়নি অথবা কেউ নেভায়নি। তা এখন কারুর মনে নেই। এই নির্জন রাতে আলো না নেভানোর ত্রুটি ধরিয়ে দেওয়ার কেউ নেই। যারা পরস্পর পরস্পরের ত্রুটি ধরতে পারত তারা এখন গভীর সুপ্তিত মগ্ন। জেগে থাকলেও তা তারা করত না। একই ঘরের মধ্যে দু'জন দু'জায়গায় নিজেদের স্থান করে নিয়েছে। খাটের একদিকে মাথার বালিশটা দুমড়ান। সুরমার মাথা বালিশ থেকে খানিক দূরে বক্রভাবে স্থাপিত। হাত দু'টো সমান্তরাল ভাবে কোলের কাছে টানা। তাকে কেউ দেখলে অবাক হতো। কেননা, এমন করে সে শোয় না। সুরমাও তা জানত। তাই বোধ হয়।

ইচ্ছা করেই বালিশটাকে একপাশে সরিয়ে রেখেছিল। মাথার নীচে ওটাকে রাখতে ইচ্ছা করেনি। বরং পাশের আর একটি বালিশের দিকে ক্রুদ্ধ ভাবে চেয়েছিল। ইচ্ছা হয়েছিল, ওটাকে সামনের দিকে ছুড়ে দিতে, যেখানে একটি শয়তানরূপী ভদ্র মানুষ একমনে কাজ করে চলেছে, অথবা ভান করছে কাজ করার! কিন্তু সে করেনি। তাহলে নিজে অনেকখানি হালকা হয়ে যাবে। শোয়ার সময় তার মনে আর কোন প্রশ্ন উঁকি দেয়নি? নিজেকে জিজ্ঞেস করেনি সাহস করে সুরমা। মনকে সে জানে। মনের অদ্ভুত প্রকৃতিকে জানে বলেই গতকালের স্মৃতিও রোমন্থন করতে চায়নি নিজের দিক থেকে। কিন্তু—কিন্তু শোয়ার পর অবাক হয়েছে সে। নিজের মন তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ছোট বালিশটা, যা সে অযত্নে একদিকে ফেলে রেখেছে তার কথাই মনে পড়েছে। ওখানে কী দু'জনের মাথার এক হওয়া চুলের সোঁদা গন্ধ নেই? অথবা রাতে দু'জনের একসঙ্গে মাথা রাখার দৃশ্য। না, না, না—প্রচণ্ড স্বরে তার বিবেক চীৎকার করে উঠেছে। সে এসব চিন্তা করবে না—জোর করে অবরুদ্ধ করবে স্মৃতির রোমন্থন। এ স্মৃতি মিথ্যে, ভুল, ছলনায় পরিপূর্ণ। বিকৃত। যে লোকটি শোওয়ার পর তার বালিশে নিজের মাথা আস্তে আস্তে নিয়ে এসে তার কানের কাছে মুখ রাখত সে প্রতারক। সুরমা স্পষ্ট বিরক্তি ঢাকতে চোখ বন্ধ করে। তার দৃষ্টির সামনে থেকে বালিশটা অবলুপ্ত হয়ে যাক।

সুরমা চোখ বন্ধ করে ঘুমুতে চেষ্টা করে। তন্দ্রা আসছে কি-না তা অনুভব করার আগে সে একবার নিজের দৃষ্টি ঘরের এককোণে প্রসারিত করে। টেবিল ল্যাম্পের সামনে ঝুঁকে ইসলাম কী যেন লিখছে। হাত নড়া স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে এখান থেকে। লোকটা কী সারা রাত এমনি করেই কাটাবে নাকি? কিন্তু তাতে তার

কী? তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। স্থূল পার্থিব সম্পর্ক থাকলেও মানসিক কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না তাই তাদের সম্পর্ক মিথ্যে। সুরমা ভাবে। এবং ভাবার সঙ্গে তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ে ঘরের মধ্যে দুটি লাইটের দিকে। একটা টেবিল ল্যাম্প আর অন্যটা ঘরের মাঝখানে টাঙ্গান বাতি। শত্রুতা করে ফেলবে নাকি মাঝখানের বাল্বটা? না, তার দরকার নেই। বরং অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ঘুমুবে সে। নিশ্চিন্তে ঘুমুবে। জানিয়ে দেবে, আলোর মধ্যেও তার ঘুম আসে। সে ঘুমাতে পারে।

আলো দু'টো তখনও জলছিল। কেননা, তাদের নেভানোর কেউ ছিল না। একজন অন্যজনের কথা ভেবেছিল তাদের দু'জনের কেউ আসেনি। তাই সেগুলো নেভানো হয়নি। তাই তখনো তারা জ্বলছিল। সারা ঘর আলোকিত হয়েছিল। কিন্তু সত্যি কী ঘরে কোন আলো ছিল? সমস্ত ঘরটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল? কোন কিছু আবছা ছিল না? সারা ঘর যেন এই প্রশ্নই নীরবে করে চলেছিল। কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কেউ ছিল না।

শেষ রাতে ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি এল। কতক্ষণ ধরে বৃষ্টি পড়ছিল তা ঘরের কেউ জানতে পারেনি। একজন মশারির মধ্যে ঘুমুচ্ছিল অন্যজন টেবিলে মাথা রেখে শুয়ে পড়েছিল। এখান থেকে উঠতে মন চায়নি। ঘরের বাতিটা তখনো জ্বলছিল। সেদিকে একবার তাকিয়ে নিভিয়ে দিয়ে আসতে চেয়েছিল। মাসের শেষে যে বিল উঠবে তার ভার পড়ছে নিজের ওপরেই। এ-কথা মনে পড়ার পরই উঠতে ইচ্ছা হয়েছিল। অথচ পারল না। ওঠার পূর্ব মুহূর্তে মনে হল লাইট নেভাতে গেলে একজনের পাশ দিয়ে যেতে হবে। সে দেখে নেবে। কাজেই সে টেবিল ল্যাম্পের হুডটা কাত করে বসে টেবিলে মাথা রেখে পড়তে লাগল। পড়তে পড়তে একবার হঠাৎ সচকিত হয়ে ভাবল এতক্ষণ সে কতখানি পড়েছে? চেয়ে দেখল, প্রথমে যে পৃষ্ঠা খুলেছিল সেটাই তখন পর্যন্ত ধরা। নিজেকে ভর্ৎসনা করার প্রবৃত্তি হল তার। এতক্ষণ ধরে তাকেই সে ভাবছে। সেই মেয়েটি। যে তার স্ত্রী। এবং একদিন হল তার সঙ্গে কথা বন্ধ সাধারণ ঘটনা হলে সে এ-সব গায়ে মাখত না। সুরমাকে দেখে মেয়েদের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। মেয়েদের মন এত ঠুনকো তা বিশ্বাস করত না। তার বিশ্বাসের মূলে আঘাত পড়েছে বলেই সচকিত। মনের মধ্যেকার সচকিত ভাব চিন্তা করতে করতে এক সময় তার তন্দ্রা এসেছিল। তারপর এই বৃষ্টি।

বৃষ্টির কথা তারা বোধ হয় কেউ টের পেত না। অথচ টের পেল দুজনেই। প্রথমে ইসলাম। পরে সুরমা। খোলা জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস আসছিল। ইসলাম কাঁপছিল। এতেই তার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। অথচ সে উঠল না। জেদ করেই উঠে গিয়ে অদূরের জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে এল না। মাথাটা তুলে সে একবার মশারির ভেতরে কোন বস্তুকে দেখতে চেষ্টা করল।

সে-ও তখন জেগে উঠেছে। তারও শীত শীত ভাব করছিল। বাতাসে মশারির দেহ কাঁপছিল। মশারির পাড়গুলো তার দেহের ওপর উড়ে উড়ে আসছিল। দেবে না-কি সে জানালাটা বন্ধ করে। তারপর নিভিয়ে দেবে ঘরের বাতিটা? শেষে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াবে? অসম্ভব। দৃঢ় চেতনায় শক্ত করে নিল নিজেকে। সে উঠবে না। জানালা বন্ধ করবে না। বাতিও নেভাবে না। সারা রাত বাতি জ্বলুক, ঝড়-বৃষ্টিতে সারা ঘর ভেসে যাক, লুপ্ত হয়ে যাক সমস্ত স্মৃতি। একজন শাস্তি পাক। নিজের ভেতরটা একবার দেখুক। পুরুষগুলো কী হীন? কী ভীষণ হয়?

ইসলামের ভীষণ শীত করছিল। সে বইগুলো ঠিক করে সরিয়ে রাখল এক পাশে। পাশ ফিরে আর একবার তাকাল মশারির দিকে। সুরমার দেহটা মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। অথচ চেষ্টা করছে নিজেকে ধরে রাখতে। পারছে না। যেমন করে সেদিন নিজের ক্রোধ দমন করতে পারেনি। তাকে ভুল বুঝেছিল সে। এবং তারই মর্মান্তিক পরিণতি আজকের সম্পর্ক। অথচ তা কোন মতেই স্বাভাবিক ছিল না। সমস্ত দৃশ্যটা একবার ভাবতে চেষ্টা করল ইসলাম।

ড্রইং রুমে বসে খবরের কাগজ পড়ছিল ইসলাম। রবিবার। কাজের একঘেঁয়েমি থেকে মুক্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হবে না। প্রশান্ত মনে কাগজ দেখলেও বারবার আনমনা হয়ে যাচ্ছিল। মুখ তুলে একবার করে তাকাচ্ছিল চারদিকে সুরমা ওর এক বান্ধবীর সঙ্গে বাইরে গেছে। তাকে জোর করেই ধরে নিয়ে গেছে। ইসলাম তাই ছুটির দিনে বেশ নিঃসঙ্গতা বোধ করে। খবরের কাগজে সম্পূর্ণ তৃপ্তি পায় না। এক একবার জানালা দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে। নির্জন দুপুরে বাইরেটাও থমথম করছে বলে মনে হ'ল। বহুদূর বাড়ির এক ছাদে একটি বৌ চুল শুকোচ্ছে রোদে। সেদিকে একবার তাকিয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিজ্ঞাপনগুলো পর্যন্ত শেষ করল সে। তারপর খবরের কাগজটা টেবিলের ওপর রাখল। এই সময়ে বাইরে মেয়েদের জুতোর শব্দ হতে লাগল। ইসলাম উঠে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। পর্দা তুলতেই থতমত খেয়ে গেল। সুরমা নয়। অপরিচিতা এক ভদ্র মহিলা। বেশ বিস্মিত হয়েই তার দিকে তাকাল সে। পরক্ষণে চোখ নামিয়ে নিয়ে বসতে বলল তাকে।

ভদ্র মহিলা বসে ইসলামের দিকে চেয়ে হাসলেন। 'অবাক হচ্ছেন বুঝি খুব?'

ইসলাম তখনও তাকে দেখছিল। অত্যন্ত সাজসজ্জা করে এসেছেন তিনি। একেই সুন্দরী তার ওপর সুসজ্জায় আরো সুন্দর লাগছে। সুরমাও এত সুন্দরী নয় বোধ হয়।

ইসলাম দ্রুত চিন্তা করছিল। কে হতে পারেন ভদ্র মহিলা। অথচ তার মনে পড়ল না।

তার বিহ্বল ভাব তিনি টের পেয়ে আরেকবার হাসলেন, 'চিনতে পারছেন না? কী আশ্চর্য, আমি নাঈমা।'

'ও।'

এতক্ষণ পরে ইসলামের মনে পড়ল। ভদ্র মহিলা তাদের সঙ্গে পড়তেন কলেজে। দীর্ঘদিনের কথা। তেমন আলাপ ছিল না। চেহারাও স্পষ্ট মনে ছিল না। অথচ দু'বছর এক সঙ্গে পড়েছে। তাই লজ্জিত হল।

'আপনি! সেজন্যেই চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। অনেকদিন পর দেখলাম।'

আবার হাসলেন নাঈমা, 'অনেকদিন পরেই ত। প্রায় বারো বছরের মত হ'ল। এখানে আছি অনেকদিন থেকে আপনার কথা শুনলাম। ভাবলাম একবার দেখে আসি। চিনতে পারবেন বোধ হয়।'

'না-চেনার কোন কারণই নেই।'

ইসলাম নিশ্বাস ছাড়ল তৃপ্তির! নিঃসঙ্গ দুপুরে একা থাকার ক্লান্তিকর বেদনা থেকে মুক্তি পেল সে। সুরমা না-আসা পর্যন্ত অনায়াসে কাটিয়ে দেবে গল্প করে। নাঈমাও গল্পের মধ্যে ডুবে গেলেন। অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে কথা বলতে লাগলেন তিনি। ছাত্র-জীবনের বিভিন্ন স্মৃতিকথা।

গল্পের মধ্যে ওরা তন্ময় হয়ে পড়েছিল। সেই সময় আবার বারান্দায় জুতোর শব্দ শোনা গেল। সুরমা হাতে অনেকগুলো ফুল নিয়ে ঢুকল। কিন্তু ঘরের মধ্যে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল। নাঈমাকে দেখল একবার। তাকে দেখে ইসলাম উঠে দাঁড়াল।

'এত দেরী হ'ল যে।'

'ও এমনি।'

হঠাৎ ইসলাম নাঈমার অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যে দু'জনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। নাঈমাও উঠে পড়লেন। দু'জন দু'জনকে অভিবাদন করল।

'বসুন। আমি আসছি।'

সুমরা ফুলগুলো নিয়ে চলে গেল ভেতরে। ওর মুখটা হঠাৎ অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। ফুলগুলো বিছানায় রেখে ও শুয়ে পড়ল। বান্ধবীর সঙ্গে সকাল থেকে ঘুরে বেড়িয়েছে। সারা শরীর অবসন্ন। এখন সে চায় নিশ্চিত বিশ্রাম। আর উঠে কাপড় বদলাতে ইচ্ছা হ'ল না তার। বড় পরিশ্রান্ত সে। অত্যন্ত ক্লান্ত। চোখ দু'টো তার আপনা আপনিই বন্ধ হয়ে এল।

কখন ঘুম এসেছিল সুরমা নিজেই টের পায়নি। ইসলামের স্পর্শে ঘুম ভেঙে গেল। তার দেহের ওপর ভর দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে মুখের দিকে। চুলগুলো সরিয়ে দিচ্ছে কপালের ওপর থেকে।

'শরীর খারাপ লাগছে নাকি?' জিজ্ঞেস করল ইসলাম।

কোন কথা বলল না সুরমা।

'তখনই বলেছিলাম এ-শরীর নিয়ে এতক্ষণ বাইরে থেকো না।'

'আমি কী করব। কতদিন পর সুলতানা এসেছিল।'

দু'জনেই খানিকক্ষণ চুপ করে রইল।

'সরো তুমি।'

ইসলাম হাসল। ওর গালে একটা খোঁচা দিল। তারপর সরে বসল। সুরমা উঠে খাটের বাজুতে বালিশ রেখে হেলান দিয়ে বসল।

'ফুলগুলো কেমন?'

'বলার অপেক্ষা রাখে না।'

এবার হাসল সুরমা।

'ভদ্র মহিলা চলে গেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমি আর যেতে পারলাম না।'

'উনি বুঝেছেন সে কথা। চেন না বোধ হয় ওঁকে। আমাদের সঙ্গে পড়তেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত পড়েননি।

'বাল্য বান্ধবী।'

'বলতে পার।'

ইসলাম সুরমাকে কাছে টেনে নিল। সুরমাও বাঁধা দিল না। সারা দুপুরেই আজ একটি নিবিড় সান্নিধ্যের কথা চিন্তা করে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে উঠেছিল।

সেদিন দুপুরে চিন্তা করতে করতে ইসলামের মনে পড়ে গিয়েছিল শিকারের সময়কার একটি ঘটনার কথা। চাকরী-জীবনের পূর্বে বন্ধুদের সঙ্গে একবার শিকারে গিয়েছিল সে। শিকারের শেষে ক্লান্ত হয়ে যখন গাছের তলায় বিশ্রাম করছিল তখন একটি দৃশ্যের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। দু'জোড়া ঘুঘু চরে বেড়াচ্ছিল মাঠের মধ্যে। হঠাৎ চিল এসে ঘুঘুকে মেরে ফেলে। ক্রুদ্ধ ঘুঘু চিলের কিছু করতে না পেরে অন্য জোড়ার একটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আক্রমণ করে। শেষে পরাজিত হয়ে পড়ে যায়। ঘুঘু দু'টোও তার পেছন পেছন উড়তে থাকে। বন্ধুদের মধ্যে শওকত ছিল সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। সে ঘটনার বিশ্লেষণ করে সবাইকে চমৎকৃত করেছিল। প্রথম ঘুঘু স্বামীর মৃত্যু থেকে অন্য জোড়ার স্ত্রী ঘুঘুকে আক্রমণ করেছিল তাকে জোড়চ্যুত করার জন্যে। প্রাণীদের এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে।

'এ-ব্যাপারে দেখছি মানুষদের সঙ্গে কোন পার্থক্য নেই। প্রেমের ক্ষেত্রে পাখীরাও তাহলে ঈর্ষাপরায়ণ।' সুলতানের কথায় সবাই হেসেছিল।

ঘটনাটা ইসলামের অনেক দিন মনে ছিল। ছোট ঘটনাটা নিয়ে প্রায়ই বিশ্লেষণ করত। মনে পড়ত আলকাত্রাজ জেলের সেই কয়েদীর কথা। সে চুয়ান্ন বছর জেলে থেকে পাখীদের সম্বন্ধে গবেষণা করেছিল। অথচ লোকটা ছিল সামান্য কয়েদী। সে প্রথমে দেখেছিল চড় ই আর তারা ঘুঘু। অবশ্য আজকে সেদিনের ঘটনাটা মনে পড়ার কারণ ছিল। সে কারণ অবশ্য অসামান্য নয়। তবুও সেদিনের ঘটনাটা একবার ভাবল সে। আর মনে পড়ল নাঈমার মুখটা। সুদর্শনা। ইসলাম দেখল তার সামনে মুখটা ভাসছে। তার দিকে চেয়ে সে হাসছে। অদ্ভুত কমনীয় হাসি। যে-কোন পুরুষের প্রার্থনীয়। কিন্তু কি চান তিনি? ইসলাম সে-কথাই ভাবতে চেষ্টা করল সুদীর্ঘ সময় ধরে। নাঈমাকে স্পষ্ট বুঝতে পারল না সে। সামান্য পরিচয়ের সূত্র ধরে চেষ্টাকৃত আন্তরিকতা তার চোখে পড়ে যায়। খানিক আগেই নাঈমা চলে গেছেন এখান থেকে। বাইরের ঘরে বসে সে সেদিনকার আসা চিঠিপত্র দেখছিল। সুরমা ভেতরের ঘরে শুয়ে। নাঈমা এসে ঢুকে ছিলেন ঘরে। কোন ভূমিকা না করেই বললেন, 'মার্কেটে গিয়েছিলাম—ভাবলাম আপনাদের এখান থেকে ঘুরে যাই একবার। দেখুন ত ফুলগুলো কেমন?'

নাঈমা তার সামনে এসে কতগুলো রক্ত গোলাপ বাড়িয়ে দিল। ইসলাম হাতে নিয়ে দেখল, সেদিন সুরমা যে ফুল এনেছিল সেগুলোই। ঘ্রাণ নিয়ে বলল, চমৎকার। এই রং-এর গোলাপ আমার প্রিয়।'

'আপনার পছন্দ। যাক, ঠিকমত আনতে পেরেছি জেনে আনন্দিত হচ্ছি। দিন, ওগুলো ফ্লাওয়ার ভেসে রেখে দিই।'

টেবিলের ওপর থেকে বাসি ফুলগুলো ফেলে দিয়ে নিজের ফুলগুলো ফ্লাওয়ার ভেসে সাজিয়ে রাখলেন নাঈমা।

'চমৎকার মানাচ্ছে।' নিজেই বললেন তিনি, কারুর সম্মতি না রেখেই। 'সুরমা কোথায়?'

ইসলাম অবাক হ'ল। সে স্ত্রীর নাম তাকে বলেনি।

'নামও জানেন দেখছি।'

'সেদিন এসে আলাপ করে গেছি অনেকক্ষণ।'

'ও!'

ইসলাম এ খবর জানত না। সুরমা বলেনি, অথবা প্রয়োজন নেই বলে উল্লেখ করেনি বোধ হয়। সে কথা স্বীকার করল না সে।

নাঈমা বসলেন। 'চমৎকার আপনাদের সংসার। দেখলে হিংসে হয়। এত সাজানো গোছানো।'

'সুরমাই সব করে। ইদানীং শরীরটা খারাপ যাচ্ছে বলে ঠিকমত করতে পারছে না। বেশী হাঁটতে দিইনে ইচ্ছা করেই। শুয়ে আছে এখন।'

'মেয়েদের এ সময় সাবধানে থাকাই প্রয়োজন।' নাঈমা বললেন ইসলামের দিকে তাকিয়ে।

ইসলাম লক্ষ্য করল তার চোখ দু'টো হাসছে। এই চোখ দেখেই অনেক ছেলে তার প্রেমে পড়েছিল। কিন্তু অত সহজে কারুর কাছে ধরা দেয়নি নাঈমা। এখানে আসার পর শুনেছিল এক্সিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। অথচ এখন ভদ্রতার জন্যে সে কথা জিজ্ঞেস করতে পারছে না। নারীদের মত কৌতূহল তার নেই। কাজেই চুপ করে থাকে। নাঈমা বোধহয় তার মনের কথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এক সময় ফস্ করে প্রশ্ন করে বসলেন, 'কই আমার কথা ত কিছু জিজ্ঞেস করলেন না?'

'আপনি কিছু বলেননি। ওটা আপনার কাছ থেকেই আশা করেছিলাম।' ইসলাম নিজের কথার মধ্যে সঙ্গতি খুঁজতে চেষ্টা করে।

'কিন্তু—কেমন বিষণ্নভাবে তার দিকে তাকালেন তিনি। শেষে ধীরে ধীরে বললেন, 'আপনার মত আমার বলার নেই বলেই নিজে কিছু বলিনি।' তিনি থামলেন। বোধ হল শক্তি সঞ্চয় করলেন। পিঙ্গল মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল। এক মুহূর্তের জড়তা জয় করে ফেললেন তিনি, আমাদের মধ্যে ডাইভোর্স হয়ে গেছে।'

'ডাইভোর্স!'

ইসলাম যেন আঁৎকে উঠল। এমন অস্বাভাবিক সম্পর্ক সে কামনা করেনি। অনেকক্ষণ সে কথা বলতে পারল না। চুপ করে বসে রইল। শেষে স্বগতোক্তির মতই বলল, 'আমি সত্যি দুঃখিত। এ-কথা ভাবিনি।'

'না, না, আপনার অপরাধ নেই জিজ্ঞেস করায় বা শোনার ক্ষেত্রে। ঘটনা ঘটবেই। তাকে আটকানো যাবে না। আপনার অনুশোচনা নিরর্থক।'

ইসলামের মনে হল পর্দার ওপার থেকে সুরমার মুখ সরে গেল। ও কি সব শুনছিল?

ইসলাম ভাবতে চেষ্টা করল। তখনই তার রতনপুরের ঘুঘুর গল্পটা মনে পড়েছিল। কেন পড়েছিল তা সে জানে না। কিন্তু মনে পড়েছিল, এইটুকুই সে শুধু জানে। এর অতিরিক্ত কোন কারণ নির্দেশ করতে পারবে না। নাঈমা চলে যাওয়ার পরও সে অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিল সেখানে। তার পা দু'টো যেন স্থানুর মত নিশ্চল। পা টেনে ওঠার বিন্দুমাত্র শক্তি নেই।

শোওয়ার ঘরে ঢুকে ইসলাম বেশ বিস্মিতই হয়েছিল। তখনো সুরমা শুয়ে। তার দিকে পেছন ফেরান। অথচ এতক্ষণ এভাবে শুয়ে থাকে না। তাকে এসে বিরক্ত করে। রাগ করে। বিছানায় গিয়ে শোয় তারপর আবার তার কাছে এসে কোল থেকে কাগজপত্র কেড়ে নেয়। খাটের কাছে যেতেই তাকে বিস্মিত করে সুরমা বলে উঠ্ল, 'তোমার বান্ধবী চলে গেলেন?'

'হাঁ।'

ইসলাম সুরমার কথার মধ্যে যেন ব্যঙ্গর স্পর্শ পেল। উত্তপ্ত স্বর।

'ফ্লাওয়ার ভাসে তাঁর দেওয়া ফুল দেখলাম।'

'হুঁ। উনি এনেছিলেন। কিন্তু তুমি এ-ধরনের কথাবার্তা বলছ কেন, সুরমা।'

ইসলাম সুরমাকে তার দিকে ফেরাতে চেষ্টা করে। সুরমা প্রাণপণে নিজেকে শক্ত করে রাখে। শেষে আত্মসমর্পণ করে হাঁপাতে থাকে। ইসলাম তার মাথা কোলে রেখে হাত দু'টো নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে সস্নেহে ওর দিকে তাকায়, 'কি হয়েছে তোমার?'

সুরমার দীর্ঘ নিশ্বাস পড়তে লাগল। কোন কথা বলতে পারল না।

'আমার ওপর রাগ করেছ তুমি?'

হঠাৎ সুরমা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে বসল। ইসলামের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'উনি এত ঘন ঘন তোমার কাছে আসেন কেন?'

'তার মানে?' ইসলাম সুরমার সন্দিগ্ধ সুরে অবাক হয়ে গেল। সুরমা তাকে এ কথা বলবে এ যেন তার বিশ্বাসেরও বাইরে। তাই অবাক হয় অনেকক্ষণ ওপর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, 'তুমি আমাকে সন্দেহ করছ?'

'তুমি কি মনে কর নিজে সমস্ত সন্দেহের বাইরে?' সুরমা স্পষ্ট করে কথাগুলো বলল। তার চোখ দু'টো জ্বলছে। উত্তেজনায় সে তখন কাঁপছিল।

'তুমি কি বলতে চাও?' সংযত হয়ে প্রশ্ন করে ইসলাম।

'ছাত্র-জীবনে তোমাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক ছিল। সে কথা কোন দিন ত বলনি আমাকে? উনি নিজে তখনকার গল্প বলেছেন আমাকে।' হঠাৎ ফুঁফিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল সুরমা।

'মিথ্যে কথা। উনি ভুল বলছেন। তুমিও হয়ত রাগের মাথায় আমার ওপর অবিচার করেছ।'

সুরমা কোন কথা শুনতে চাইল না। সে বালিশে মুখ রেখে কাঁদতে লাগল।

ইসলাম সরে এসে ওকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করল, 'শোন। শুধু শুধু মিথ্যে সন্দেহকে মনে স্থান দিয়ে মনকে বিষাক্ত করো না। আমাদের মধ্যে তেমন কোন সম্পর্ক ছিল না।'

'আমি জানি তুমি অস্বীকার করতে চাইছ।'

সুরমা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। ইসলাম স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। সে কোন ব্যাপারে লিপ্ত হওয়ার আগেই তা ঘোলাটে হয়ে গিয়েছে। এখানে অনেকবার এসেছেন নাঈমা? তার অগোচরে। এবং প্রকৃত ঘটনার অপব্যাখ্যা করেছেন। সেই অপব্যাখ্যায় নিজেকে ভীষণভাবে জড়িয়ে ফেলেছে সুরমা। ইসলামের আর একবার মনে পড়ল রতনপুরের মাদী ঘুঘুটার কথা। সে তার স্বামী হারিয়ে অন্য একটি দম্পতিকে আক্রমণ করেছিল।

অন্ধকার রাত যেন সারা ঘরকে গ্রাস করতে চাইছে। নৈশব্দ অন্ধকারকে আরো কালো করেছে। সেদিকে তাকিয়ে ইসলামের মনে হয়, অন্ধকার ভ্রূকুটি মেরে তাকে যেন গ্রাস করতে আসছে। অন্ধকারের মধ্যে দু'টো চোখ দপ্‌ দপ্‌

করে জ্বলছে। এখনি কি সে ওর মধ্যে হারিয়ে যাবে? অবলুপ্ত হয়ে যাবে তার সমস্ত চেতনা? অদম্য সাহসে ভর দিয়ে উঠে অন্ধকারের দিকে তাকাল ইসলাম। তারপর উঠে গেল দেওয়ালের দিকে। সুইচ টিপতেই সারা ঘর আলোতে ভরে উঠল। বিছানায় কুঁকড়ে পড়ে রয়েছে সুরমা। ইসলাম বালিশটা ওর মাথার নীচে গুঁজে দিল।

'চল ভাত খাবে। এ-সময় শরীরের উপর অত্যাচার করো না, আমার ওপর রাগ করে।'

সুরমা, কোন কথা বলল না।

'চল।'

ইসলাম ওর হাত ধরতেই অন্য হাত দিয়ে সে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল, আমার খিদে নেই।'

'তার মানে খাবে না।'

'না।'

অনেকটা রাগ করেই সেখান থেকে চলে গেল ইসলাম। সুরমা টেবিল ল্যাম্পের সুইজ জ্বালার শব্দ পেল। একবার তাকিয়ে দেখল, অনেকগুলো বই নিয়ে পড়তে বসেছে। মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিল। তারপর মাথার নীচ থেকে বালিশটা একদিকে ঠেলে দিয়ে আগের মত খালি মাথায় শুয়ে রইল।

তারপর শেষ রাতে ঝড় উঠেছিল। ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শে দু' জনেই দু' দিকে জেগে উঠেছিল। দু' জনেই টের পেয়েছিল দু'জন জেগেছে, অথচ কেউ কাউকে নিজদের একক উপলব্ধির কথা অন্য জনকে জানতে দিতে ইচ্ছা করল না। শুধু দু' দিকে দু'টো দেহ শীতল বাতাসে মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

ইসলাম ভাবল সে উঠে গিয়ে কি জানালা বন্ধ করে আসবে? সুরমার শীত করেছে নিশ্চয়। কষ্ট হচ্ছে ওর। তারই ঠাণ্ডা লাগছে। অথচ ও কোন মতেই উঠতে পারল না। সাহস করে উঠে গিয়ে জানালা বন্ধ করার শক্তি তখন ওর ছিল না। সুরমার দিকে চেয়ে দেখল, শীতে ও নড়ছে। উঠবে নাকি ইসলাম?

সুরমার সত্যি শীত করছিল। তার চেয়েও ওর বেশী খারাপ লাগছিল ইসলামের জন্য। সন্ধ্যের পর থেকে চেয়ারে বসে রয়েছে একভাবে। ক'দিন থেকেই অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করেছে ও। ওর জন্য তার মায়া হল। এবং সে তখনি অনুভব করল ওর আগের রাগ অনেক কমে এসেছে। গ্লানিটুকুও হ্রাস পাচ্ছে ধীরে ধীরে। ইসলামের দিকে চেয়ে দেখল ওর চুলগুলো বাতাসে উড়ছে এবং নিজকে ঠিক রাখার জন্যে অনবরত এপাশ ওপাশ করছে।

নিজের অজান্তেই সুরমা বসল বিছানা থেকে। এক-পা এক-পা করে জানালার দিকে এগিয়ে গেল। সেই সময়ে ইসলামের দৃষ্টি গেল জানালার দিকে। ও নিজেই

উঠতে যাচ্ছিল। সুরমাকে দেখে তাড়াতাড়ি ছুটে গেল সেদিকে। সুরমা তখন জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বাতাসে ওর শাড়ি উঠে যাচ্ছে। কিছুতেই নিজেকে যেন ঠিক রাখতে পারছিল না। ইস্‌লাম গিয়ে ওর কম্পমান দেহটা ধরে ফেলল দু'হাত দিয়ে। তারপর জানালা বন্ধ করে দিল।

সুরমা তখন হাঁপাচ্ছে উত্তেজনায়। ওর মুখ এসে পড়েছে ইসলামের বুকের ওপর।

'আমাকে ভুল বুঝ না, সুরমা। এখানেই তোমার অসন্তোষের সমাধি হয়ে যাক। মনের মধ্যে যত চেপে রাখবে ততই নিজে ক্লান্ত হয়ে পড়বে।'

'আমি আমি—সুরমা কী বলতে চায়, কিন্তু উত্তেজনায় বলতে পারে না।

ইসলাম ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে, তোমাকে কিছু বলতে হবে না। কোথায় তোমার অসন্তোষ তা আমি জানি। কিন্তু একটা কথা ভুলে যেও না, সুরমা—তোমাকে পাওয়ার জন্য আমার কামনাকে একটা নির্দিষ্ট গতিমুখী করতে হয়েছে। কি যে ছেলেমানুষ হচ্ছ দিন দিন। মনে করেছ তোমার এ ভাগ্যবান স্বামীর পেছনে রাজ্যের মেয়ের ঝোঁক আর আমারও সেই মনোভাব। এতদিন ভালবেসে তোমাকে পেয়েছি সে কী শুধু অবহেলা করার জন্য? তা নয়, সুরমা। আর এ-কথা ভেবেই তুমি নিজকে অপরাধী করে তুলেছো।'

সুরমা কোন কথা বলতে পারে না। ইসলামকে আরো জোরে আঁকড়ে ধরে।

'নাঈমা এখানে এমন ভূমিকা কেন করেছেন সুস্থভাবে চিন্তা করলে তুমিও তা বুঝতে পারবে। তবে তোমাকে একটা ঘটনার কথা বলিনি। সামান্য বলেই। একবার ক্লাশের ছেলেরা আমাদের নিয়ে হ্যান্ডবিল বিলি করেছিল। আমার মনে হয়, এ থেকেই নাঈমার সন্দেহ হয়েছে, তার প্রতি আমার দুর্বলতা ছিল। আর কেউ না জানলেও তুমি জান তা কতখানি অসত্য। অযথা তুমি ভুল বুঝে অভিমান করেছ। লক্ষ্মীটি, ভুল বুঝো না আমাকে।'

সুরমা একবার সজোরে ইসলামকে চেপে ধরল। বাইরে যে ঝড়ের তাণ্ডব-লীলা ভেতরে তখন তার স্পর্শ ছিল না। নিজের ওপর প্রচণ্ড ধিক্কার হল তার। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড লজ্জা ইসলামের বুকে মাথা রেখে সে কেঁদে ফেলে। ইসলাম তাকে কাঁদতে বাধা দেয় না। ও কাঁদুক কিছুক্ষণ। কান্নার মধ্যে দিয়ে ভুল বোঝার পরিসমাপ্তি হোক। ও নিজকে চিনতে পারুক—যে চেনার মধ্যে থাকবে না সন্দেহের অবকাশ।

ইসলাম নীরবে ওর বিস্রস্ত চুলে হাত বুলাতে থাকে। বাইরে তখন তার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আর সেই ঘুঘুটা। তাকে কী একজোড়া ঘুঘু তাড়া করেছে? সে প্রাণপণে উড়ে পালাচ্ছে?■

দোলনা

আশঙ্কার রূপ বোধ হয় কালো।

অন্যের কাছে কেমন তা কোনদিন জিজ্ঞেস করে দেখেনি সুলতান, নিজের কাছে সে সে-রূপই দেখল। প্রথমে দেখল, তারপর অনুভব করল। এবং অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ কেঁপে উঠ্‌ল একবার। শুধু অন্ধকার নয়, মনে হল, অন্ধকারের মধ্যে বিভীষিকার মূর্তি উঁকি দিচ্ছে। আর তাতেই শঙ্কা বেড়ে গেছে। নিজেকে দুশ্চিন্তা-মুক্ত করবার জন্যে সে বাইরের দিকে তাকাল।

সে যেখানে বসে আছে তার চারপাশেই খোলা। একদিকে কতকগুলো গাঁদা ফুল। কতকগুলো ছোট ছোট পতঙ্গ হলদে ফুলগুলোকে অনবরত নাড়া দিচ্ছে এবং উড়ে উড়ে ছোট ডালের চারপাশে ঘুরছে।

চমৎকার ফুলগুলো! হলদে রঙ-এর। শীত-মৌসুমের সকাল বেলার রোদে ফুলগুলো অত্যন্ত নীচু উজ্জ্বল লাগছে। সে উড়ন্ত পতঙ্গের খেলা দেখতে লাগল।

কিন্তু এভাবে কতক্ষণই বা দেখা যায়। সারাদিন একভাবে বসে থাকা যায় না, কোন কিছু দেখাও সম্ভব নয়। তাই খানিকক্ষণ পরে সে উঠে এসে বারান্দার চৌকিতে বসে দেওয়ালে হেলান দিয়ে পত্রিকার স্তূপ থেকে একটা পত্রিকা টেনে নিল।

এগুলো সেই এনেছে। নিজের সময় কাটানোর জন্যে। সারাদিন বসে থাকা সম্ভব নয়, উৎকণ্ঠা সত্ত্বেও, একথা জানত বলে পত্রিকা নিয়ে এসেছিল। এখন সেগুলো কাজে লাগছে। তিন দিন ক্রমান্বয়ে পত্রিকা পড়েছে। কোন কোন পত্রিকা একাধিকবারও পড়েছে। ছবি দেখেছে অনেকক্ষণ ধরে। ক্যাপসান পড়েছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তবুও সময় কাটতে চায় না। সময়ের এই দীর্ঘসূত্রতার কথা ভাবতে গিয়ে ছোটবেলার স্কুলে পড়ার সময় জ্যামিতির কথা মনে পড়ল। প্রব্লেম সে ভাল পারত। কিন্তু এক্সট্রা দেখলে মাথা ঘুলিয়ে যেত। অথচ প্রত্যেক প্রব্লেমের সঙ্গে এক্সট্রা নামে একটা লেজ থাকত। সময়ও যেন খানিকটা তাই। কোনক্রমেই ঘণ্টাগুলোর সঙ্গে শেষ হতে চায় না খানিকটা হাঁপয় দম নেয়। তারপর আবার চলে।

পত্রিকা দেখতে দেখতে সাইপ্রিটদের ছবি দেখল সুলতান। অসংখ্যা শিশু রাজপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে গ্রীকদের সঙ্গে তুর্কীদের সংঘর্ষের পর। এক একজনকে তার অত্যন্ত ভাল লাগল। বোধহয় মাথা নীচু করে অনেক্ষণ দেখল সে। যখন মনে পড়ল, সে ছবি অনেকক্ষণ দেখছে, তখন হাসি পেল। মাথাটা সরিয়ে নিল।

হাতছানি দিয়ে ঘরের ভেতর থেকে ডাকল সাঈদাকে।

'এক কাপ চা খাওয়াও না?'

'ক কাপ হল?'

'হিসেব করিনি।'

'ছেলে-হওয়ার আনন্দে বে-হিসাবী নাকি?'

এ-কথার কোন উত্তর দিল না সুলতান। সাঈদাও চলে গেল ঘরের মধ্যে চা করতে।

ওখানে রাশেদা আছে। তিন দিন আগে এসেছে নার্সিংহোমে। প্রথম ছেলে হবে বলেই উৎকণ্ঠা তার উৎকণ্ঠা যেন সঞ্চারিত হয়েছে সুলতানের মধ্যেও। তিন দিন থেকে সে একবারও বাইরে যায়নি। বের হাতে পারেনি।

মাঝে মাঝে ঘরে গিয়ে বসেছে খানিকক্ষণ। অকারণে ঘরে উঁকি মেরেছে। তার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে রাশেদার। চোখে-মুখে হাসি খেলে গিয়েছে। হাসির মধ্যে দিয়ে বলে উঠেছে, এখন বাইরে যাও, সবাই ভাববে কী? সুলতান তার মনের ভাব বুঝে নিজেও হেসেছে। স্ত্রী-রা কোন কোন সময়ে স্বামীর স্ত্রৈণত্ব আশা করে। দেখে আনন্দিত হয়। সুলতান এ-কথা উপলব্ধি করার পর ইচ্ছা করে অসতর্ক হয়েছে।

হাসল সে। আপনা আপনিই হাসি পেল তার।

'হাসছেন যেন!'

সাঈদা চায়ের পেয়ালা নিয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করছিল। এবার প্রশ্ন করল সকৌতুকে।

সুলতান তার কথার কৌতুক বোধ করল। মগ্ন চৈতন্যের কথা ভেবে আনন্দিত হল।

'হেসেছি?'

'তাই তা দেখছি। পিতৃত্বের কথা ভেবে নিশ্চয়ই পরিবেশের অস্তিত্ব ভুলে গিয়েছিলেন?'

'তুমিও বুঝবে একদিন মাতৃত্বের কথা ভেবে।'

'কেমন করে বলি? ভবিষ্যতের কথা কল্পনা করে তর্ক করা অন্ততঃ চলে না। বর্তমানকে চোখের সামনে দেখেছি, তাকে বিচার করা চলে।'

সুলতান চায়ের পেয়ালায় তৃপ্তিজনক একটা চুমুক দিল। যেন সাঈদার কথায় সে তৃপ্তি অনুভব করেছে। এ কথা কোনদিন যেন শোনেনি সে।

চা খেতে খেতে ওর দৃষ্টি গেল নবজাতকের জন্যে তৈরী দোলনার দিকে। প্রত্যেক ঘরের সঙ্গে এ-রকম একটা করে দোলনা দেখেছে সে একা একা ঘোরার সময়। দক্ষিণ দিকের ঘরে পরশু সকালে একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছে। আজ বারান্দা দিয়ে ঘোরার সময় ওইদিকে গিয়েছিল। নার্স পরিচর্যা করছিল শিশুর। মাঝে মাঝে

চীৎকার করে উঠছিল সে। তার কান্না শুনতেই ভাল লাগছিল সুলতানের। কান্নাও যেন শোনার জিনিস। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখেছিল। তারপর এদিকে চলে এসেছে সে। দোলনার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আস্তে আস্তে দোলনা দুলিয়েছে। মনে হয়েছে, কেবল একটা মাদকতা রয়েছে দোলনা দোলানোর মধ্যে। অদ্ভুত ভাল লাগছে তার। মনে হয়নি, দোলনার মধ্যে কেউ নেই। ওটা একেবারে ফাঁকা।

বারান্দার অপ্রশস্ত কার্নিশে বসে আরাম করে সিগারেট বের করে ধরিয়েছে। রিং করে ছুড়ে দিয়েছে আকাশের দিকে। ঘরের দরজার পর্দাটা এক এক সময় বাতাসে আন্দোলিত হওয়ার সময় রাশেদার মাথাটা চোখে পড়েছে। নজরে পড়েছে পা দুটো তার চাদরে ঢাকা দেইনি। যা আসন্ন মাতৃত্বের সম্ভাবনায় উজ্জ্বল। সেদিক থেকে ঘাড় ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে হেসেছে। কয়েকদিন আগে রাতে এমনিভাবেই না শুয়ে ছিল রাশেদা। আর কনুই এ ভর দিয়ে তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল সে, যেন।

নতুন করে দেখছে তাকে।

রাশেদা তার দৃষ্টিতে লজ্জা পেয়েছিল।

'অমন করে দেখছ কী?'

'তোমাকে।'

'তার মানে? আমাকে এর আগে আর কোনদিন দেখনি নাকি?'

'তাই ত মনে হচ্ছে। কেননা, সে তুমির সঙ্গে আজকের তুমির মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। তাই নতুন করে দেখছি। না দেখে উপায় নেই বলে।'

'চমৎকার কতা শিখেছ দেখছি আজকাল।'

হেসেছিল দু'জনেই।

এক সময় সিগারেট বের করে ঠোঁটে চেপে ধরেছিল সুলতান। তার দকিে চেয়ে দেশলাইটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে রাশেদা বলে উঠেছিল, 'এস, আমি ধরিয়ে দিই।'

সুলতান তার মুখ রাশেদার ঠোঁটের ওপর রেখে হেসে বলেছিল, এবার ধরিয়ে দাও।'

সে ধরিয়ে দিয়েছিল।

'আমি কিন্তু মেয়ে চাই।'

সুলতান বলেছিল ধোঁয়া ছেড়ে, কুণ্ডলী পাকিয়ে।

'আমি ছেলে।'

নিজের মতামত জানিয়েছিল রাশেদা।

'তা হয় না।'

'কেন?'

'মেয়েরা বেশি মিষ্টি।'

'ছেলেরা চমৎকার।'

আবার হেসে উঠেছিল দু'জনে।

'তাহলে যমজ হওয়ার দরকার। তাহলে আমাদের সমস্যা আর থাকে না।

টেনে টেনে বলেছিল সেদিন সুলতান।

আজ দরজা দিয়ে রাশেদার দিকে তাকিযে তার কথাগুলো মনে পড়ল। এবং সঙ্গে সঙ্গে হাসল। যেন সম্প্রতি কোন কৌতুকের ঘটনা ঘটেছে।

সাঈদা দোলনার পাশে বসে সেটা দোলাচ্ছিল একমনে। হঠাৎ সুলতানকে ডাকল হাত নেড়ে। সিগারেটটা ফেলে সে তার পাশে বসল।

'দোলনাটা দেখেছেন।'

'হ্যাঁ।'

'এখানে বাচ্চা রেখে আমি একটা ঘুমপাড়ানি গান গাইব রাতে। তখন কেউ আপত্তি করতে পারবেন না।'

সুলতান কৌতুক অনুভব করল তার কথায়।

'বেশ।'

'চমৎকার দোলনাটা, তাই না?'

সুলতান ঘাড় নাড়ল। তারপর নিজের অজ্ঞাতেই সেটা সে দোলাতে লাগল। মনে পড়ল, কত নবজাত শিশুর স্পর্শ এটায় লেগে আছে। কচিমুখের হাসি, কচিমুখের কান্নার। সবার দেহের গন্ধ যেন লেগে রয়েছে দোলনায়। সুলতান দোলনার ওপর নাক দিয়ে গন্ধ শুকতে চাইল।

'কি শুকছেন?'

আচমকা প্রশ্ন শুনে বিহ্বল হয়ে পড়েই পর মুহূর্তে নিজেকে সামলিয়ে নিল সে।

'মুখ রাখছিলাম—ঘুম আসছে।'

'না শিশুদের গন্ধ শুঁকবার জন্যে?'

সাঈদা জোর করেই কথাটা বলেছিল। লজ্জা পেয়ে সে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

খানিক্ষণ এলোমেলোভাবে বাইরে ঘোরার পর ঘরের কাছে ফিরে সুলতান দেখল সেখানে বেশ সন্ত্রস্তভাব। রোগিনী ব্যাথায় কুঁকড়ে উঠছে। তার চীৎকার ভাঙ্গা কাচের মত চড়িয়ে পড়েছে বাইরে। যন্ত্রণার অভিব্যক্তি সহ্য করতে না পেরে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে সাঈদা। মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও যে কাতরোক্তি সহ্য করতে পারছে না। তার সারা মুখে শঙ্কা ফুটে উঠেছে।

'কি হল?'

তার দিকে চেয়ে বোকার মত জিজ্ঞেস করল সে।

'যন্ত্রণা উঠেছে।'

'ডাক্তার এসেছেন?'

'আসবেন এখুনি। তাঁকে খবর দেওয়া হয়েছে।'

তার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গেই ভেতর বাড়ি থেকে ডক্টর সুলতানা হোসেন ষ্টেথিসকোপ হাতে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। পরীক্ষা করে তিনি ইনজেকশন দিলেন। এখনো সময় হয়নি প্রসবের। কিছুক্ষণ থাকলেন তিনি। তারপর বেরিয়ে এলেন।

'কেমন অবস্থা ওর?'

তাঁর দিকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল সে।

'এখন ভালই।'

'কখন প্রসব করতে পারে?'

'সন্ধ্যের পর ফাইনাল বলব—।'

ডাক্তার বললেন।

দোলনায় হাত দিয়ে দাঁড়াল সুলতান। হাত লেগে সেটা নড়ে উঠ্ল। যেন হেসে উঠ্ল। ঘরের মধ্যে থেকে রাশেদার কাতরোক্তি ক্রমশঃ থেমে আসছে।

ঘুরে ঢুকল সে।

তাকে দেখে সবাই বাইরে এসে দাঁড়াল।

তার পাশে বসে আস্তে আস্তে মাথায় হাত বোলাতে লাগল।

'কষ্ট হচ্ছে?'

'না।'

মৃদু মাতা দুলিয়ে বলল রাশেদা।

সুলতান ওর যন্ত্রণা-কাতর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ওর দিকে তাকিয়ে তার নিজেরও কষ্ট লাগল। তিন দিন থেকে একভাবে বিছানায় শুয়ে আছে মেয়েটা!

বারান্দায় চেয়ারে বসে চা খাচ্ছিল সুলতান। ডাক্তার এসে ঢুকলেন ঘরের মধ্যে। উৎকণ্ঠায় দাঁড়িয়ে পড়ল সে। বাকি চা-টুকু খাওয়া হ'ল না তার। খবর শোনার জন্যে তার ভেতরটা ছটফট করতে লাগল। ছোট বারান্দার ওপর সে পায়চারি করতে লাগল। কতক্ষণ এইভাবে কেটে গিয়েছিল, খেয়াল ছিল না। কেননা, সে ঘড়ি দেখেনি—ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ কানে আসেনি। হঠাৎ সে সচকিত হয়ে উঠল। ঘর থেকে একে একে বেরিয়ে এল সবাই। সাঈদা, তার আম্মা, শ্বাশুড়ি—তারপর বারান্দার একপাশে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। তাদের দিকে তাকিয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল সুলতান।

কী হয়েছে? কোন দুর্ঘটনা? এরা সবাই কাঁদছে কেন? বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—কিন্তু কোন প্রশ্ন করতে পারল না। সবার অতর্কিত ব্যবহার রহস্যের মত মনে হতে লাগল। একটু পরে ডাক্তার এসে তাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন।

'একটা দুঃসংবাদ শোনাচ্ছি আপনাকে মিঃ হোসেন। এখন রোগিণীকে পরীক্ষা করে আশ্চর্য হয়ে গেছি। বাচ্চার কোন হার্ট-বিট্ শোনা যাচ্ছে না। অথচ সকালে এ-রকম ছিল না। কেন যে এমন হল ঠিক বুঝতে পারছিনে। তবু কালকের জন্য অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। প্রসবের সময় যদি—'

তিনি মাঝপথে থেমে গেলেন। বোধ হয় সুলতানের মুখের দিকে তাকিয়েই, তার মুখ মড়ার মত ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

'ডোন্ট বি নার্ভাস।'

সান্ত্বনা দিয়ে ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলেন তিনি। পরক্ষণে সে বিহ্বলের মত চেয়ারে বসে টেবিলে মাথা রেখে বসে পড়ল। সে ভাবতে পারছে না কোন কিছু। সে দু' চোখে স্পষ্ট দেখছে না কোন কিছু। ধীরে ধীরে একটা অন্ধকার তাকে আচ্ছন্ন করছে। অন্ধকার দেখে প্রচণ্ড ভয়ে চীৎকার করে উঠতে চাইল। কিন্তু সে পারল না। গলা দিয়ে একটা ঘর ঘর আওয়াজ বেরুল মাত্র। আর কোন শব্দ হ'ল না।

সুলতান বোধ হয় অনেকক্ষণ অন্ধকারের দিকে তাকিয়েছিল। এক সময় তার মনে হল, অন্ধকার ছাড়া তার চোখ আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। চোখের চতুর্দিক থেকে অন্য সমস্ত পরিবেশ মুছে গেছে, বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সেদিকে তাকানোর ফলে তার সমস্ত গা শির শির করে উঠ্ল। তার হঠাৎ মনে পড়ল, এখান থেকে উঠে সে ঘরে যাবে কেমন করে? সে তা কোন কিছু দেখতে পাচ্ছে না? তাহলে এখানেই কী সারা রাত বসে কাটিয়ে দেবে? এ-কথা মনে হওয়ার পর তার দেহটি আর একবার কেঁপে উঠ্ল। শঙ্কা দূর করবার জন্যে সে দেশলাই জ্বালাতে চাইল। তাহলে চারদিক দেখা যাবে ভাল করে। এই ভেবে সে পকেটে হাত দিল। কিন্তু দেয়াশলাই খুঁজে পেল না। আশ্চর্য, দু' পকেটের কোথাও দেশলাই নেই। অথচ শেষ সিগাটের খাওয়ার সময় এখানেই দেশলাই রেখেছিল। তার মনে হল, হয় ভুলক্রমে তার পাশেও রাখতে পারে। এই ভেবে সে তার চারপাশটাও খুঁজল একবার। না, ওটা কোথাও নেই। যাকগে। সুলতান নিজের মনের শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্যে আর একবার ভাল করে বাইরে তাকাল। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হল, অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ যেন দেশলাই-এর কাঠি জ্বলে উঠ্ল। সেদিকে তাকানোর পর সে বুঝতে পারল, এটা তারই হারান দেশলাই-এর কাটি। কেননা, ওই কালো এবং বারুদের গন্ধ তার চেনা। ওখানে কেমন করে তার দেশলাই গেল সে কিছুতেই বুঝতে পারল না। এবং তার পরেই সে ভীত হয়ে উঠল। তার মনে হল, কে যেন দেশলাই-এর কাঠি তার চোখের সামনে নাড়ছে। কাঠির তাত লাগছে তার মুখে। সুলতান চমকে উঠল। এবার সত্যি সত্যি সে ভয় পেয়েছে।

সত্যিই সে ভয় পেয়েছিল। কখন এবং কিভাবে ভয় পেয়েছিল—তা অনেকক্ষণ চিন্তা করার পরও মনে পড়ল না। শুধু দেখল, তার চোখ দু'টো জ্বালা

করছে এবং সে টেবিলের ওপর মাথা রেখে বসে রয়েছে। সারা রাতই এমনভাবে ছিল সে। এখানেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। কেউ তাকে ডাকেনি, অন্যদিন যেমন ডেকে ঘরে শোওয়ার জন্যে বলে। নিজের অজান্তেই সে পকেটে হাত দিয়ে দেখল, পকেটের একপাশে দেশলাইটা পড়ে আছে। চাপ পড়ে সিগারেটের প্যাকেটটার একদিক বেঁকে গেছে। প্যাকেট বের করে সে দুমড়ান সিগারেট ধরাল। এবং তারপর বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

সকাল হয়ে আসছে। পাখিদের কিচির মিচির অবিশ্রান্তভাবে শোনা যাচ্ছে। মাঠের গাছগুলোতে শিশির পড়ে তাদের দেহ ভিজিয়ে দিয়েছে। কেমন যেন নেতিয়ে পড়েছে তারা। রাশেদার দরজার পাশে এসে সে দাঁড়াল। হাত দিতেই ভেজান দরজা ভুলে গেল। অল্প ফাঁক করে ভেতরে দৃষ্টি দিতেই দেখতে পেল রাশেদার বিষণ্ন মুখ। শবের মত নির্জীব। ওর জন্যে কেমন তার মায়া হল। দুঃখ পেল। তাই পরক্ষণে দরজটা আগের মত ভেজিয়ে দিল বাইরে থেকে। ও ঘুমুক। শান্তিতে ঘুমুক। প্রার্থিত দুঃসংবাদ যেন পরেই শুনুক। ওর বিষণ্ন মুখের ওপর সে সংবাদ যেন নতুন করে কোন দুশ্চিন্তার শিশির না ছড়ায়।

সুলতান ঘরের মধ্যে থেকে একটা চেয়ার টেনে এনে বসল। আর ও আশ্চর্য হয়ে গেল বসার পরক্ষণেই। ওর দৃষ্টি গেল দোলনার ওপর। ওটাও যেন শিশিরে ভিজে গিয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে সে এক পা এক পা করে দোলনার দিকে এগিয়ে গিয়ে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখল। তারপর সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে মুছিয়ে দিল দোলনাটা। শার্টের এক কোন দিয়ে শিশির-মুক্ত করল। যেন, ওটা তার কোন প্রিয় বস্তু। একথা মনে হওয়ার পরক্ষণে তার চোখে পানি এসে পড়ল। তাড়াতাড়ি করে সেখান থেকে সরে এসে সে দোলনাটার দিকে পেছন করে দাঁড়াল।

এবং সে পেছন ফিরেই সেখান থেকেই সরে এসেছিল আস্তে আস্তে। বাড়ির সামনের দিকে গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। সকাল হয়েছে তিন ঘণ্টা আগে-এর মধ্যে সে স্থির করতে পারেনি। শেষ সংবাদ শোনার জন্যে অধীর হয়ে উঠেছে। ডাক্তার এসেছেন এক সময়। তাঁর প্রতি চোখ পড়তেই সুলতান চলে গিয়েছে সেখান থেকে। এখন কী হবে তা সে জানে। পিতৃত্বের গৌরব কল্পনা করেছে অনেকদিন আগে থেকেই, রোমাঞ্চ অনুভব করেছে, কিন্তু এখন দেখল তা মিথ্যে, দুঃস্বপ্নে পূর্ণ। দুঃস্বপ্নের বৃত্ত পেরিয়ে তবে তা অর্জন করতে হয়।

সুলতান সিগারেট ধরাল। সিগারেট খেল অনেকগুলো। কোনটাই সম্পূর্ণ খায়নি। যখন সে চীৎকার আর আর্তধ্বনির শব্দে সেদিকে ছুটে গেল, তখন তার পায়ের ধাক্কায় অনেকগুলো অর্ধদগ্ধ সিগারেট ছিটকে পড়ল। সুলতান গিয়ে দেখল, ডাক্তার বিমর্ষ-মুখে বেরিয়ে আসছেন রোগিণীর ঘর থেকে।

'গত কাল যা বলেছিলাম তাই ঠিক হয়েছে। মরা ছেলে হয়েছে। আমি অত্যন্ত দুঃখিত।'

তার দিকে চেয়ে বললেন তিনি। তারপর চলে গেলেন ভেতরের দরজা দিয়ে।

সুলতান সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল। সে কী করবে বুঝতে পারল না। তার কানে একটানা কান্নার শব্দ ছাড়া আর কোন কিছু আসছে না। বারান্দার এক পাশে দাঁড়িয়ে সাঈদা এবং তার আম্মা কাঁদছেন। তাদের চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে পানি পড়ছে। নাক লাল। ঘরের ভেতরে অন্যান্য সবাই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। হঠাৎ তার কাঁদতে ইচ্ছা হল। কিন্তু সে পারল না। অসহায়ের মত সবার দিকে তাকাতে লাগল। সে একথা কোনদিন ভাবতে পারেনি, তাই স্তব্ধ হয়ে গেছে। নির্জীব হয়ে পড়েছে।

বারান্দার ছোট পাঁচিলের ওপর নিজের দেহ বিছিয়ে দিয়ে আকাশের দিকে আনমনা হয়ে ছিল সুলতান। একটা চিল উড়ছে। বড় বড় ডানা মেলে ঝাপটা দিচ্ছে। একদিক থেকে আর একদিকে উড়ে যাচ্ছে ক্রমাগত। আস্তে আস্তে বাইরের উঠোনের রোদ তার দেহের ওপর এসে পড়ল। শীতকালের রোদ। খারাপ লাগল না। অথবা অন্যমনস্কের জন্যে চেয়ে দেখল না। কিংবা দেখার পরও ভ্রুক্ষেপ করল না।

'ঘরে যাবেন?'

পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল সাঈদা। এখন সে নিজেকে সামলিয়ে নিয়েছে। প্রশমিত করেছে সবচেয়ে আগে।

সুলতান পাশ ফিরে তার দিকে তাকাল। ওর চোখ দু'টো লাল হয়ে গেছে ক্রমাগত কাঁদার ফলে।

'না ভাল লাগছে না।'

'মেয়েটা খুব বড় হয়েছিল। আর সুন্দর।'

'তাই নাকি?'

যেন বিশ্বাস করতে চাইল না সুলতান। কিংবা নির্লিপ্ত ভাব দেখাল।

'হ্যাঁ।'

'থাকগে। আমি আর দেখব না আমার মনটা খারাপ করবে।'

সাঈদা সব বুঝাল। যেমন এসেছিল তেমনি সন্তর্পণে চলে গেল ঘরের মধ্যে।

পাতলা হয়ে অন্ধকার নামছিল সারা বাড়ি ঘিরে। একটু পরে অন্ধকার হয়ে যাবে। দেখা যাবে না কোন কিছু স্পষ্ট করে। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে গত কালের কথা মনে পড়ল সুলতানের। অন্ধকারকে দেখে সে ভয় পেয়েছিল। কিন্তু আজ পেল না। অন্ধকারকে সহজ এবং চিরন্তন মনে হ'ল। এবং পরক্ষণে সে হাসল। এর মধ্যে নতুনত্ব নেই। এ অতি স্বচ্ছ। একথা ভাবার পর বিস্ময়ে লক্ষ্য করল সে দোলনাটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সাঈদা দোলনার পাশে দাঁড়িয়ে অন্যমনস্কভাবে সেটা দোলা দিচ্ছে। সেদিকে তাকাতেই তার বিস্ময় বেড়ে গেল। কেননা, সে স্পষ্ট দেখতে পেল, দোলনার মধ্যে একটি শিশু হাত পা নাড়ছে। তার মুখটা অত্যন্ত পেলব। অত্যন্ত কোমল। অত্যন্ত সুন্দর।■

শুধু তার মতো

আকাশের দিকে ধোঁয়ার রিং ছুড়ে দিল শওকত। বাতাসের মধ্যে খানিক দূরে গিয়েই রিংটা ভেঙে গেল। সেটা মিলিয়ে যাওয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত সেদিকে তাকিয়ে থাকল সে। কেমন নির্বিকারভাবে। তার ইচ্ছা হল রিংটার মত মিলিয়ে যেতে। কিন্তু তা যে হয় না। কেননা সে বায়বীয় পদার্থ নয়। নিজের পরিকল্পনার কথা ভেবে সে হাসল। এখন যেন সে অদ্ভুত ধরনের কথা ভাবছে, একথা তার মনে হল। তারপরেই সে সচেতন হয়ে উঠ্‌ল। কেন তার কী হয়েছে যে নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত ভুলে যেতে হবে! হঠাৎ নিজের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা জন্মাল শওকতের। অবসারের ভাব কাটিয়ে সোজা হয়ে বসল। পোশাকের দিকে তাকিয়ে মনে হল, জামা-কাপড়গুলো কেমন ময়লা হয়ে গেছে। এই ক'ঘণ্টার মধ্যে এগুলো এত ময়লা হয়ে গেল কেমন করে?

আসার সময় ত সে সদ্য ধোওয়া জামার ইস্ত্রি ভেঙ্গে পরে এসেছে। কিন্তু এরপর মধ্যবর্তী সময়ে দেহের যে ধকল হয়েছে তা ত কম নয়। কাজেই, এগুলো যদি ময়লা হয় তাহলে ধোপাকে দোষ দেওয়া যায় না, তাকেও না। কেননা, ধোপা ভাল করেই কেচেছিল, এবং সে ভুলে গিয়েছিল এগুলো ধোওয়া জামা-কাপড়।

শওকত হাতের ইশারা করে বয়টাকে ডাকল। বয়টা 'পাশে এসে দাঁড়াল।

'বলুন, স্যার।'

শওকত তাকে একবার দেখে নিল। তারপর সোজা মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'আমার জামা-কাপড় কী বেশী ময়লা মনে হচ্ছে?'

তার চাহনির ভঙ্গী দেখে ছেলেটা কেমন যেন থমমত খেয়ে গেল।

'না, না না– স্যার। বেশ ফর্সাই আছে।'

'ফর্সাই আছে–ঠিক বলছ ত?'

'হ্যা, স্যার?'

'আচ্ছা–তুমি বরং এক কাপ চা দিয়ে যাও।

বয় চলে গেল। খানিক বাদে চা দেওয়ার পর শওকতের দিকে একবার চেয়ে দেখল। কিন্তু সে তখন আত্মস্থ হয়ে ভাবছে।

'চা।'

'ও।'

শওকত চায়ের পেয়ালায় 'চমুক দিল। ভালই লাগছে চা। নতুন পাতার সোঁদা সোঁদা গন্ধ। সব সময় এ গন্ধ পাওয়া যায় না চায়ের পাতায় ভেজাল মেশায় বলে। চায়ের কাপ নামিয়ে রাখতেই তার একটা হাত পকেটের মধ্যেকার ভারি জিনিসকে স্পর্শ করল। পকেট থেকে সে একটা খাম বের করে বিজ্ঞের মত নাম দেখতে লাগল। তারই নামে চিঠিখানা এসেছে। তিনদিন আগে। আফরোজা লিখেছিল। নামটা মনে পড়তেই প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়েছিল। খানিক্‌ আগে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল আফরোজার নাম মুখে আনবে না। মেয়েদের ওপর তার ঘৃণা ধরে গেছে। ওদের বিশ্বাস নেই। ওরা ফুটো আনি। দূর থেকে ভাল মনে হয়, কাছে নিয়ে দেখো মাঝখানে ফুটো। সহজপ্রাপ্য উপমা ভাল লাগল তার। মনে মনে তৃপ্তির হাসি হেসে আবার উপমাটা আওড়াল! মেয়েজাত ফুটো আনি! ওদের বিশ্বাস নেই, ওদের বিশ্বাস করো না। ওরা ঘরের শত্রু বিভীষণ। তোমার ঘরে আসার পরে সিঁদ কাটবে। তুমি তা টেরও পাবে না। নিজের চোখে সে তার ভাবীকে দেখেছে। ভাই অফিসে যাওয়ার পর অন্য পুরুষের সঙ্গে ঘরে বসে গল্প করেছে। ভায়ের পয়সায় আড্ডা মেরেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তাদের ব্যবহার দেখে জ্বলে উঠেছে মনে মনে। এদের বিভীষণ বলবে না ত কাদের বলবে। হাতের কাছে নারীজাতি ছাড়া আর কাউকে খুঁজে পেল না শওকত। ভাবী আর আফরোজা দুজনকেই দেখেছে সে। দুজনেই সমান। কোন পার্থক্য নেই।

টেবিলের ওপর চিঠিটা খুলে ফেলল শওকত। লাইনগুলো পড়ল অনেকবার করে। গোল গোল হস্তাক্ষর। আয়তনে বড় নয়। পড়তে সময়ই লাগে একটু। যাতে কোন শব্দ বাদ না যায় তেমনি ভাবে পড়তে থাকে। সমস্ত চিঠি পড়ার পর চিঠিটা খামে ভরে রাখে। তিনদিন আগে এ-চিঠি আফরোজা লিখেছিল। ইনিয়ে বিনেয়ে প্রেমের কথা, ভালবাসার কথা, আরও কত সব। সব যেন মনে পড়ল না তার। কিন্তু এ-সব কী ওর মুখোস নয়? তিনদিন আগে লেখা চিঠির সঙ্গে আজকের ঘটনার কোন মিল আছে কী? বুঝতে চেষ্টা করল শওকত। না। না। অসম্ভব। কোন মিল নেই। কোন মিল নেই। সে ঠকিয়েছে। তার সঙ্গে অভিনয় করেছে। শওকতের ইচ্ছা হল টেবিলে প্রচণ্ড জোরে একটা কিল মেরে প্রতিবাদ করে। কিন্তু তা করল না, কেবল জোরে শ্বাস নিতে লাগল। তার নাকটা জ্বালা করছে।

সকাল সাতটার ট্রেনে এখানে এসেছিল সে। স্টেশনে নামার পরই শীত শীত করছিল। তখনো শীত একেবারে যায়নি। নিজেকে প্রকৃতিস্থ করার জন্যে শওকত ছোট একটা চায়ের দোকানে ঢুকল। সেখানে শুধু এক কাপ চায়েরই অর্ডার দিল। অন্য কিছু খেতে ইচ্ছা হল না তার। এখন বাজে পয়সা খরচ করার সময় নয়। পরে অনেক সময় পাবে যখন চায়ের সঙ্গে অন্য কিছু ভাল করে খেতে পারবে, শুধু চা খাওয়ার জন্যে মন উস্‌খুস্‌ করবে না। কাজেই আজ তার শুধু চা খেতেই যেন

ভাল লাগল। শওকত এক একবার করে চুমুক দিল আর সেই সঙ্গে তার মনে হতে লাগল সে যেন আফরোজার দেহের গন্ধ পাচ্ছে। চা খেতে তার ভাল লাগল। চা শেষ করার পর তার মনে হল সে আফরোজার সম্পূর্ণ দেহের স্বাদ পেয়েছে। একথা মনে হওয়ার পর খুশীতে তার মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বয়টাকে দু' আনা বখশিস দিয়ে দিল। এটা আর তেমন বাড়তি খরচ বলে মনে হল না। বয়টা খুশী হয়ে সালাম ঠুকল। পকেট থেকে কাঁচি সিগারেট বের করে আগুন ধরিয়ে পরম তৃপ্তিতে টান দিতে লাগল সে। এই অবসরে আফরোজা নিজেকে গুছিয়ে নিক। আর ত বেশী সময় নেই। খানিক পরেই তাকে আসতে হবে। ঠিক হয়েছে, 'আফরোজা বই-পত্র নিয়ে কলেজের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে, যাতে বাড়ির লোক তাকে সন্দেহ করতে না পারে। তারপর সেখানে গিয়ে মিলিত হবে শওকত। দু'জন রিক্সা নিয়ে কোর্টে যাবে। অন্যান্যরা সেখানেই থাকবে নটার সময়। সে ভাবল রিক্সার পরিবর্তে বরং একটা স্কুটারই নেবে। রিক্সায় যেতে সময় নেবে। স্কুটার ভাল। পকেটে হাত দিয়ে দেখল টাকাগুলো যথার্থ স্থানে আছে কিনা। তার টাকা ত বেশী নেই। এই টাকা এবং বন্ধুদের কাছ থেকে কিছু পাওনা টাকাই ত তার সম্বল। অল্প টাকা দিয়েই তাকে ক'দিন চালাতে হবে। হোটেলে থাকবে তিনদিন। টাকা বেশী থাকলে আরো কয়েকদিন থাকা যেতে পারে। তারপর কোন বন্ধুর বাড়ির একটা ঘর ঠিক করতে হবে। তার মনে হল, নতুন বিবাহিত জীবন কোন নির্জন বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও কাটান যায় না। কাটালে রোমাঞ্চ থাকে না। আনন্দের অনুভূতি ঠিকমত উপভোগ করা যায় না। কাজেই তাদের হোটেলেই থাকতে হবে বেশী দিন। এর মধ্যে সে একটা চাকরী খুঁজে নেবে। মেসার্স আহমেদ ব্রাদার্সের প্রোপাইটার কথা দিয়েছেন। চাকরী পেলে সে বাড়ি ভাড়া করবে। আফরোজা এবং সে তখন নতুন বাড়িতে গিয়ে উঠবে। আফরোজার অসুবিধে হবে অন্য কারুর বাড়িতে থাকা। তখন ও সহজ হতে পারবে না। তারচেয়ে ভাড়াটে বাড়িই ভাল। কটা বাজল? দেওয়ালে টাঙান ঘড়িটার দিকে তাকাল শওকত। আটটা। সিগারেটটা ফেলে সে লাফ দিয়ে উঠল। সময় হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি করে সে বেরিয়ে পড়ল রেস্টুরেন্ট থেকে।

কলেজের দূরত্ব বেশী নয়। তবু সেখানে হেঁটে যেতে তার অনেকক্ষণ লাগল। দ্রুতগতিতে হাঁটার পরও সেখানে পৌঁছাতে অনেকক্ষণ লাগল। হাঁটার সময় তার মনে হল, সবাই তাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। যেন সে অপরাধী। কোন হেয় কাজ করেছে কিংবা করতে যাচ্ছে। সবার দৃষ্টিতে কেন বিব্রত হয়ে ওঠে শওকত। সবার কৌতূহলী দৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্যে সে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিয়েছিল। তবুও এখানে পৌঁছাতে এত দেরী লাগল! কলেজের গেটের পাশে দাঁড়িয়ে সে সিগারেট ধরাল। তার রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল। এইটুকু হাঁটতে বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যেন! কটা বাজছে এখন? দেখবে নাকি কলেজে

ঢুকে? হঠাৎ যেন সে বোকা হয়ে গেল। নিজের হাতে যে ঘড়ি আছে তা ভুলেই গিয়েছে। এটা অবশ্য তার নিজস্ব নয়। শাহেদের কাছ থেকে এক সপ্তাহের জন্যে ধার করে নেওয়া। আট দিনের দিন ফিরিয়ে দিতে হবে। তবুও ত এটা এখন তারই ঘড়ি। একথা মনে করার পর ধার নেওয়ার বেদনা থেকে ভারমুক্ত হল। বাঁ হাতের শার্টের আস্তিনের খানিকটা অংশ সরিয়ে দেখল সোয়া আটটা। এখনো অনেক সময় আছে। নটার সময় আফরোজার আসার কথা এখানে। পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে এসে পড়বে। পায়চারি করে সিগারেট খেতে লাগল। অত্যন্ত তৃপ্তি অনুভব করল। অন্য সময় হলে বসে বসে সিগারেট না খেয়ে উঠত না সে। এখন সে-সব কথা মনে পড়ল না।

কলেজের পাশে বার কয়েক ঘোরার পর শওকত খানিক দূরের মোড়ে গিয়ে দাঁড়াল। এক কোণে চমৎকার করে সাজান একটি শাড়ির দোকান। শো-কেসের সামনে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে শাড়ি দেখতে লাগল সে। একটা শাড়ি তার পছন্দ হল। মনে মনে চিন্তা করে দেখল আফরোজার রঙের সঙ্গে শাড়িটা ম্যাচ করবে। কত দাম দেখবে নাকি? ঘাড় নীচু করে শাড়ির গায়ে দাম লেখা কাগজে চোখ বুলিয়ে দেখল পঁচাশি টাকা। বাপ্‌স্! সাধারণ শাড়ির এত দাম! না, এখন কেনা হবে না। চাকরী পাওয়ার পর কোন এক মাসে শাড়িটা কিনে দিলেই চলবে। শাড়ির দোকান থেকে আবার কলেজের গেটের পাশে এসে দাঁড়াল। সেখানে দাঁড়াতেই পরিচিত একজন ছাত্রীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাকে দেখে ছাত্রীটি দাঁড়িয়ে হাসল।

'কেমন আছেন?'

মেয়েটি জিজ্ঞেস করল ঠোঁটে হাসির ঢেউ খেলিয়ে।

'অত্যন্ত ভাল।'

হাসি মুখে উত্তর দিল শওকত।

শুনে সুখী হলাম। কী করছেন?'

'এই মানে—

কথাটা শেষ করতে পারল না, তার মুখে আটকে গেল। সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। তার বিহ্বল অবস্থা দেখে মেয়েটি হেসে ফেলল শব্দ করে।

'বেশ, বেশ। যাই কেমন।'

মেয়েটি কলেজে ঢোকার পর বিশ্রী লাগতে লাগল শওকতের। তার মুড খারাপ হয়ে গেল। কী দরকার এমন অভদ্র প্রশ্ন করার? এর জন্য সে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। কথার মধ্যে যেন ব্যাঙ্গের ছাপ। গেটের কাছ থেকে সরে এসে খানিকটা দূরে এসে দাঁড়াল এবার। হাতঘড়িটা বের করে দেখল।

দশটা।

দশটা! প্রায় চমকে উঠলো শওকত। এত বেজে গেছে এর মধ্যে? অথচ নটার সময় আফরোজার এখানে পৌছানোর কথা। তবে কী সে আবার ফিরে গেছে বাড়িতে। না ক্লাস করছে? দেখবে নাকি খুঁজে? কী দরকার ছিল তার কাপড়ের দোকানে যাওয়ার? এই সময় যদি এসে থাকে? তাকে না দেখে নিশ্চয় চলে গেছে!

কলেজের ভেতর গিয়ে একবার খুঁজে এল শওকত। না। ক্লাসে যায়নি আফরোজা। তবে, নিশ্চয় বাড়িতে ফিরে গেছে! একটা রিক্সা ডেকে সে ওদের বাড়ির দিকে চলল। ওদের বাড়ী থেকে খানিক দূরে রিক্সা থামিয়ে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে হাঁটতে লাগল। কী দরকার আবার রিক্সা নিয়ে গিয়ে, যদি অঘটন ঘটে? বাড়ির সামনে পৌছার দিন এখানে এসেছে কিন্তু এমন লাগেনি তার। কেমন যেন নতুন নতুন ঠেকছে বাড়িটা। চারধারে কাগজের নক্সা। ছোট রঙিন কাগজ আর তুলো দিয়ে গেট তৈরী। একদিকে একরাশ কলার পাতা। বোধ হয় উচ্ছিষ্ট। কেননা, সেখানে তখনো কতকগুলো কুকুর ভুক্তাবশেষ চেটে খাচ্ছে। তাছাড়া, সারা বাড়ী কেমন যেন থমথম করছে! এখানে কোন কিছু কী হয়েছে তা স্পষ্ট বুঝতে পারল না। এবং না ভাবতে পারার জন্যে তার মাথাটা ভোঁ ভোঁ করে উঠলো। স্থাণুর মত সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। এখন সে কী করবে? কেমন করে খবর পাঠাব আফরোজার কাছে?

এমন সময় মাঝ বয়সের একজন লোক বাড়ি থেকে আরেকজনকে সঙ্গে করে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তিনি সোজা সামিয়ানার একদিকে গিয়ে ওপর থেকে বালব খোলার জন্যে আরেকজনকে আদেশ দিলেন। অপর লোকটি মইয়ে চড়ে বালব খুলতে লাগল। 'ভদ্রলোকের দৃষ্টি হঠাৎ শওকতের ওপর গিয়ে পড়লে তিনি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন তার দিকে।

'কাকে চান?'

'মানে–মানে আ...'

ভদ্রলোক তার দিকে তাকালেন। পর্যবেক্ষণ করলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, আপনি শওকত হোসেন?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি জানলেন কী করে?

'আফরোজা বলেছে।'

'আফরোজা!'

'হ্যাঁ।'

ভদ্রলোক পকেট থেকে ছোট একটা কাগজ বের করে শওকতের দিকে এগিয়ে দিলেন। বললেন, 'নিন। আফরোজার চিঠি।'

শওকত কিছু বুঝতে পারল না। বিহ্বলের মত হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিল। কেমন করে তাঁকে বলবে, আফরোজাকে তার দরকার! খানিকটা চুপ করে থাকার পর সে প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠ্‌ল।

'ওকে আমার একটু দরকার ছিল। যদি—'।

'কিন্তু ও ত নেই।'

'নেই?'

'গতকাল ওর বিয়ে হয়ে গেছে।'

বিয়ে!'

হঠাৎ যেন চমকে উঠ্‌ল শওকত। যেন আঁতকে উঠ্‌ল। মনে হল, তার সামনে সে এতলোকের পরিবর্তে ভূত দেখছে। সে টলতে লাগল। আফরোজার বিয়ে হয়ে গেছে? বাড়িতে সামিয়ানা দেখেও কী সে বোঝেনি? না। কেমন করে বুঝবে? সে এমন একটা ঘটনা কল্পনা করতে পারেনি। তার বিয়ে হয়ে গেছে, সে এখানে নেই! তার বিয়ে হয়ে গেছে! হঠাৎ মনে হল, তা নয়–আফরোজা তাকে ফাঁকি দিয়েছে। তাকে ফাঁকি দিয়ে দূরে পালিয়ে গেছে! সে প্রতারক! সে বিশ্বাসঘাতক। ছোট চিঠিটা পকেটে চেপে কখন সে যে চায়ের দোকানে ঢুকেছিল মনে নেই। চায়ের জন্যে অর্ডার দিয়েছিল কি-না তাও মনে করতে পারে না। সম্বিত হওয়ার পর দেখল, সে চায়ের বসে আছে। তার সামনে চায়ের পেয়ালা এবং একগ্লাস পানি। শওকত গ্লাসটা টেনে নিয়ে ঢক ঢক করে সমস্ত পানি খেয়ে ফেলল। মনে হয়, তার শুকনো গলা ভিজে উঠ্‌ল। সে শান্ত হল। স্বস্তি পেল।

পকেটে আফরোজার চিঠিটা সে হাত দিয়ে ধরে ছিল তখনও। হাত বের করতেই সঙ্গে সঙ্গে চিঠিটাও বেরিয়ে এল সেই সঙ্গে। ছোট কাগজটা নিজের মুখের সামনে মেলে ধরল। দেখল আফরোজার গোটা গোটা সুন্দর অক্ষর। যে-হাতের লেখা সে প্রার্থনা করত, ভালবাসত তার চিঠি পড়তে। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকত লেখার দিকে। আজও সে তেমনি কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে রইল। মনে করতে পারল না আফরোজার বিয়ে হয়ে গেছে। তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক শেষ হয়ে গিয়েছে। চিঠিটা ছোট হলেও পড়তে তার কষ্ট হতে লাগল। মাঝে মাঝে থেমে পড়তে লাগল। আফরোজা বিয়ের আগে চিঠি লিখেছে। গতকাল তার বিয়ে হবে একথা সে জানত না। তার বাবার সম্মানের দিকে তাকিয়ে সে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে। শওকত তাকে যেন ভুল না বোঝে। চিঠি পড়ার পর শওকত গুম হয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ। ভাবতে চেষ্টা করল চিঠির গূঢ়ার্থ। বাবার সম্মানের দিকে তাকিয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে? প্রতারক। তার মুখে একটি শব্দই এল। প্রতারক, প্রবঞ্চক ছাড়া আর কোন শব্দ দিয়ে তাকে অভিহিত করা চলে না।

ভালবাসা সে মেপে বিচার করে। হঠাৎ যেন চীৎকার করার ইচ্ছা হল শওকতের। সে চীৎকার করে সবাইকে বলবে, আফরোজা ছদ্মবেশী প্রতারক। তার মুখের দিকে তাকালে যে কেউ ভাবত সে আফরোজাকে খুন করতে চাইছে। যদি কাছে থাকত তাহলে বিশ্রী একটা কাণ্ড ঘটে যেত।

চিঠির শেষে আফরোজার প্রার্থনার কথা মনে পড়ল। এবং তারপর আবার লাইনটা দু' তিনবার পড়ল। তোমার প্রতি আমার ভালবাসা বিন্দুমাত্র কমবে না কোনদিন—প্রতারক ছাড়া এ-কথা কোন মেয়ে বলতে পারে? যে-মেয়ের বিয়ে হয়েছে অন্যের সঙ্গে, সে যদি একথা বলে তাহলে তার প্রতি কী ধারণা জন্মাবে? ভণ্ড! কিন্তু এবার তার মুখে শব্দটা বেধে গেল। সে সম্পূর্ণ শব্দটা উচ্চারণ করতে পারল না। তার চোখের সামনে একটা ছবি ভেসে উঠল।

একবার সে স্বপ্ন দেখেছিল। স্বপ্ন দেখেছিল একটি মেয়েকে। তার চোখের দৃষ্টিতে ছিল অদ্ভুত মায়া আর কোমলতা, ঠোঁট দুটো ছিল ছবির মত। শেষদিকে অদ্ভুত টানা। ঘুম ভাঙার পর তার মনে মেয়েটির চিত্র আরেকবার ভেসে উঠেছিল। তারপর থেকে সে কোন মেয়ে দেখলেই তার চোখ আর ঠোঁটের দিকে তাকাত। তাকিয়ে দেখত। একবার কলেজ থেকে ফেরার সময় বাসস্ট্যাণ্ডে আফরোজাকে দেখে চমকে উঠেছিল। তার ঠোঁট আর ভুরু অবিকল স্বপ্নচারিণীর মত। তার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারেনি সে। নিজেই পরিচয় করেছিল তার সঙ্গে। বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে এসেছিল।

'আর এক কাপ চা দাও।'

বয়টার দিকে চেয়ে অর্ডার দিল শওকত।

'আগের চা ত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে! ছেলেটি বলল।

'ও।'

যেন জানতই না শওকত। বয়ের কথা শুনে যেন বিস্মিত হল। চায়ের পেয়ালার দিকে তাকিয়ে সেটা নিয়ে যেতে বলল সে।

সে নেই বলেই বোধহয় তার কথা বেশী করে মনে পড়ল। তার মুখটা অনবরত শওকতের চোখের সামনে ভাসতে লাগল। সুন্দর মুখচ্ছবি। কিন্তু মাঝে মাঝে শঙ্কার চাপে বিহ্বল। শঙ্কাকাতর মুখের একটি স্মৃতি সে ভাবল। একবার সে তার কাছে শহর থেকে দূরে যাওয়ার প্রস্তাব করেছিল। সারাদিন বেড়িয়ে বিকেলে ফিরে আসবে তারা। আফরোজা চমকে উঠে তার ঘাড়ে মাথা রেখে বলেছিল, 'আমার ভয় লাগে।'

'ভয়, কেন?' তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল সে।

'অত কাছাকাছি হতে ভয় পাই, যদি আমরা দূরে সরে যাই।'

'তোমার যত সব কল্পনা।'

'হয়ত।'

কেমন অদ্ভুত হেসেছিল আফরোজা। কিংবা তার শঙ্কাকাতর হাসিকে ভাল লেগেছিল তার। আজ আর তা মনে নেই। শুধু মনে আছে অতীতের একটি ভাষণ। একটি মুখ।

আফরোজাকে নতুন করে মনে পড়ল বলেই সে আবার পকেট থেকে পুরনো চিঠিটা খুলে পড়ল। তিনদিন আগে লেখা চিঠিতে তাদের লুকিয়ে বিয়ের সব কথা লেখা আছে। সে কখন বেরুবে বাড়ি থেকে, সেখান থেকে কলেজে যাবে, তারপর দু'জন কোর্টে যাবে সব একে একে মনে পড়ল। তখন তার খারাপ লাগতে লাগল। খারাপ লাগল তার কারণ আফরোজাকে অন্যরকম মনে হল বলে। তার বর্তমান চিত্র কোনদিন সে কল্পনা করেনি, তাই খারাপ লাগল। কিন্তু না লেগেই বা উপায় কী আছে? বিয়ের কথা জানার পর সে কী পালিয়ে আসতে পারত না শওকতের কাছে? তার ঠিকানা সে জানে। অথচ সহজ পথ মোটেই বেছে নেয়নি। প্রতারক! নতুন করে আবার শব্দটা মনে পড়ল শওকতের। তখন তাকে সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি করে উঠে পড়ল। এখন কী করবে?

বাইরে বেরুনোর পর একথাই প্রথম মনে পড়ল তার। পথের মধ্যে ইতস্তত: ঘুরল। অহেতুক কৌতূহল নিয়ে রাস্তায় মারা পোষ্টারগুলোর দিকে তাকাল। অথচ একটি অক্ষরও তার মাথায় ঢুকল না। সেখানে কী যে লেখা আছে তাও বুঝতে পারল না। পরক্ষণে চোখ নামিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা খুলে দেখল সিগারেট নেই। মোড়ের ছোট দোকান থেকে এক প্যাকেট কিং ষ্টর্ক সিগারেট কিনে আবার সে হাঁটতে লাগল। বোধহয় অন্যমনস্কভাবে হাঁটার জন্যে সে হোঁচট খেয়েছিল। তাই দাঁড়িয়ে পড়ল এবং সামনে চেয়ে দেখল ফৌজদারী কোর্ট–। কোর্ট দেখে সে যেন আঁৎকে উঠল! এখানেই ত সে আসতে চেয়েছিল খানিকক্ষণ আগে। তারপর হাসিমুখে আফরোজার হাত ধরে বেরিয়ে যেত–কিন্তু। ও থেমে গেল। ওর মনে পড়ল বন্ধুদের কথা। কিন্তু কী বলে তাদের কাছে মুখ দেখাবে? তার কালো মুখ। ব্যর্থতার গ্লানিতে পূর্ণ মুখ! না, না, সে এখানে যাবে না এবং তাদের কাউকে খুঁজবেও না। অথচ সে আশ্চর্য হয়ে গেল, খানিক দূরে গিয়ে কোর্টের যেখানে বন্ধুদের দাঁড়িয়ে থাকার কথা ছিল সেদিকে একবার তাকিয়ে দেখল। পরিচিত কাউকে দেখতে পেল না। তবে কী কেউ আসেনি, কিংবা তাদের দেরী দেখে চলে গেছে। তার মুখের ভাব দেখে মনে হল, সে একটা মহা দায়িত্বের হাত থেকে বেঁচেছে। এই প্রথম সে একটি নির্ভয়ের নিশ্বাস ছাড়ল দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে।

এলোমেলোভাবে শহরের চতুর্দিকে অনেকক্ষণ ঘুরল সে। শেষে স্টেডিয়ামে খেলার মাঠের পাশে গ্যালারিতে বসল পা ছড়িয়ে দিয়ে। নিজেকে ভারমুক্ত করার ইচ্ছা জাগল। জুতোর ফিতে খুলে জুতোটা একপাশে সরিয়ে রাখল। পায়ে বাতাস লাগল। সামনের দিকে তাকাতেই ওর চোখ পড়ল এক দম্পতির প্রতি। দোকান থেকে অনেক জিনিস কিনে চারপাশে হাঁটতে লাগল হেসে হেসে। তাদের দিকে তাকিয়ে তার হঠাৎ হিংসে হল। মনে হল, ছেলেটা সুখী। কেননা, সে একজন নারীর অধিকারী। একটি জীবনের অধিকর্তা। যে জীবন অত্যন্ত সুন্দর এবং প্রাণোচ্ছল। তার ইচ্ছা হতে লাগল ছুটে গিয়ে পুরুষটাকে মেরে ফেলে তার সঙ্গিনীকে কেড়ে নেয়। তারপর আফরোজার ঠিকানা খুঁজে বের করে তার কাছে গিয়ে দেখায়। বলে আমি তোমাকে না পেয়ে শূন্য নই। আর একজনকে পেয়েছি। একথা মনে হওয়ার পর শওকতের মনে হল সে ষ্টেডিয়ামের গ্যালারিতে বসে আছে, শূন্যে নয়। সে বড় অস্বাভাবিক কল্পনা করছে। মনে মনে নিজের কল্পনার কথা ভেবে হাসল। এক এক সময় মানুষ নিঃসহায় হয়ে কী অসম্ভব কল্পনাই না করে!

হাতে ওর সিগারেট ধরান ছিল। তা থেকে ধোয়া উড়ছে ওপরের দিকে। সিগারেটের পোড়া অংশে অনেকখানি ছাই লম্বা হয়ে রয়েছে। হয়ত এখনি তা ঝরে পড়বে। সেদিকে তাকাতে গিয়ে শওকতের দৃষ্টি পড়ল স্টেডিয়ামের এক পাশের রেস্টুরেন্টের দিকে। এবার শুধু রেস্টুরেন্টের দিকেই নয়–তার একটি কেবিনেও। ছোট একটি কেবিন। দরজার সামনে ভাবি পর্দা টাঙান। তার মধ্যে তারা দু'জন গল্প করছে পাশাপাশি বসে। টেবিলের ওপর প্লেটে মিষ্টি। পটে চা। ফ্লেভারের গন্ধ নাকে আসছে।

'খাচ্ছনা যে।'

আমার ভাল লাগছে না।'

'ভাল লাগবে না কেন, খাও।'

শওকত মিষ্টি ভেঙে চামচে তুলে তাকে খাওয়াতে গেল। আফরোজা তার হাত ধরে বললে, থাক, আমিই খাচ্ছি।'

সে লক্ষ্য করল, আফরোজার মুখ কেমন গম্ভীর। প্রকৃতিস্থ নয়। একসময় তার কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে তোমার? এমন অন্যমনস্ক লাগছে কেন?

'তুমি চাকরীর চেষ্টা কর।'

মুখ নীচু করে বলল আফরোজা।

'আমার ভয় করে, শেষে তোমাকে হারাই। বাড়িতে মাঝে মাঝে বিয়ের কথা হয়। তোমার কথা বলব কেমন করে?'

'চেষ্টা ত করছি।'

থেমে–গিয়েছিল শওকতও। আর কোনকিছু ভাল লাগেনি তার। নীরবে বেরিয়ে এসেছিল।

এখানে বসে বসে সেদিনকার ঘটনা শওকত আজ স্পষ্ট দেখতে পেল। মনে হল, তারা দু'জন রিক্সায় এসে বসল। হঠাৎ সে কেঁদে ফেলার উপক্রম করল। দু' হাতে মুখ ঢেকে হাঁটুর মধ্যে মাথাটা চেপে ধরল। তার গা কেঁপে কেঁপে উঠছে। কেন-এ প্রশ্ন সে করল না।

স্টেডিয়াম থেকে সে আবার পরিচিত চায়ের দোকানে গেল। ছেলেটাকে ডেকে চা দিতে বলল। গরম চা পেয়ে তার মন উৎফুল্ল হল। এক নিশ্বাসেই যেন চা শেষ করে ফেলল। পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখল, চিঠিটা ঠিক জায়গায় আছে। সেটা সে বের করে আনল। টেবিলের ওপর বিছিয়ে পড়তে লাগল। বিশ্বাস হলনা এটা আফরোজার চিঠি। একবার পড়ল, দু'বার, তিনবার–তারপর সে আর গুণতে পারল না। মনে হল, ক্রমাগত চিঠি পড়েই চলেছে সে। থামার লক্ষণ নেই, বিরামের প্রয়োজন নেই। তাই অনন্তকালের মত চিঠি পড়েই চলেছে।

আর কিছু খাবেন?'

চমকে উঠল শওকত। চেয়ে দেখল সামনে দোকানের ছেলেটা দাঁড়িয়ে। কিন্তু সে কী চাইছে তা বুঝতে পারল না। কেবল চিঠিটা ভাঁজ করে পকেটে রাখতে গেল। তার হাত দশ টাকার নোট স্পর্শ করল। নোটটা বের করতেই আরও কতকগুলো নোট বেরিয়ে এল। সেগুলো সে অনেকক্ষণ দেখল। এগুলোর কী প্রয়োজন এখন? নোটগুলো হাতের মুঠোয় রেখে জামার হাতা গুটিয়ে সে হাতের ঘড়ি দেখল। সেটা টিক্‌টিক্ শব্দে চলছে। হঠাৎ সে হেসে উঠল। মিথ্যে! মিথ্যে! সব মিথ্যে! পরের ঘড়ি সে নিয়ে এসেছে। আবার ফিরিয়ে দিতে হবে। ধার করে টাকা নিয়ে এসেছে। তা-ও শোধ দিতে হবে। একথা মনে হওয়ার পর তার চোখে পানি এল। সে হাতঘড়িটা খুলে পকেটে রাখল। তারপর টাকাগুলো তার ওপর রেখে দিল। ওর চোখ ঝাপসা হয়ে উঠেছে তখন।

হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেল শওকত। চেয়ে দেখল সে স্টেশনে এসে পৌছেছে। অন্যদিন যেমন সময়ে বাড়ি ফেরে চাকরি খোঁজার পর, আজও ঠিক তেমনি সময়ে এখানে এসেছে। একটুও নড়চড় হয়নি। সে টলতে টলতে ডাটন ট্রেনের থার্ড ক্লাসের কামরায় গিয়ে উঠল। হুইসেল বাজার পর ট্রেনটা চলতে লাগল। অনেকগুলো স্টেশন সে চেনে না। জানে না। জানে না কোথায় ট্রেনটা ছুটে চলেছে।■

উপসর্গ

বাতির আলোকে মোসলেমাকে আরও বিবর্ণ দেখাচ্ছিল। আসেক লাইটে সেড লাগিয়ে ঘুরিয়ে দিল তার দিকে।

গায়ের চাদর টানতে টানতে মোসলেমা বললে, 'কতদিন বলেছি, চোখে যেন আলো না আসে। তা যদি কেউ শোনে। হাজার চীৎকার করলেও কোনো কথা যেন কানে যায় না। উ:! দিনে দিনে বাড়ীটা যেন যমপুরী হয়ে উঠলো, এতটুকু শান্তি নেই!'

আসেক জামা খুলে বিছানায় এসে বসল।

'কাকে বকছো অমন করে? নিজেও তো জান, ওরা এ লাইট জালাতে পারে না। আমি না আসা পর্যন্ত—' মোসলেমা শীর্ণ কণ্ঠেই ঝংকার তুলে বললে, 'তাহলে আলো না জালালেই হয় যখন সহ্য করতে পারিনে। আমি তো আর মরছিনে যে, মরার আগে সারা বাড়ীতে এমন করে আলো জ্বালিয়ে ঘোষণা করতে হবে : এ বাড়ির বউ মরেছে।'

আসেক ক্ষুণ্ন হ'ল। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললে, 'ছি, অমন অভিমান করতে হয় না। সারাদিন এমন অভিমান করলেই কী অসুখ ছাড়বে তোমার? যেটুকু না পাও চুপ করে থেকো।'

মোসলেমা কেঁদে ফেলল, তবে দরকার কী এতসব ঔষধ-পত্রের। না আনলেই চলে। আমি যখন মরবই তখন এতসবের প্রয়োজন কী?'

আসেক স্ত্রীর চোখের পানি মুছিয়ে দিয়ে বললে, 'লক্ষ্মীটি আমার, চেষ্টার আর তো অন্ত করা হচ্ছে না। আমি একা কী করব বল? অফিসে না গেলে সবই বন্ধ। বাড়িতে চাকর বাকরের উপর নির্ভর করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। ওরাই বা আর কী করবে? সারাদিন তো পরিশ্রম করে-ই। ওদের দিকেও একটু তাকাতে হবে বৈকি?'

মোসলেমা কোনো কথা না বলে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। অব্যক্ত একটা ব্যথা যেন বুকের মাঝখানে ছন্দ পাকিয়ে ওঠে ছিঁড়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। ব্যথার মর্মরিত স্রোত পুঞ্জীভূত হয়ে মিলিয়ে গেল বাতাসের মধ্যে। একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন সর্বত্র প্রতিহত হতে লাগলো প্রতিনিয়ত।

'ওষুধ খেয়েছো আজ?'

'জানি না।'

'খোকা ঠিক মতো খেয়েছে?'

'জানি না।'

আসেক মোসলেমার দিকে ব্যথাতুর দৃষ্টি মেলে বলল, 'আমাকে দুঃখ দিতে খুব ভালো লাগে, না!'

মোসলেমা উত্তর দিল না। আসেক খোলা জানালার পাশে এসে দাঁড়াল। পাশেই তাদের দু'জনের হাতে তৈরী বাগান। দিনের অদৃষ্ট আলোতে এখনও সবকিছু প্রচ্ছন্নভাবে দেখা যাচ্ছে। ফুলের মৃদু সৌরভ ভেসে আসছে বাতাসে। আসেক ঘ্রাণ নিলো কয়েকবার মোসলেমার অসুখের পর নিয়মিত আর যত্ন নেওয়া হয় না। চারধারে জন্মেছে অনেক আগাছা। আগামী দিনের ব্যর্থতাময় জীবনের প্রতিচ্ছবির আভাস যেন এখানে। মোসলেমা সুস্থ থাকতে দু'জনে নিয়মিত সন্ধ্যের সময় বারান্দায় চেয়ারে বসতো মুখোমুখী। বাগান নিয়ে আলোচনা করতো। তর্কও বাঁধতো মাঝে মাঝে। শেষে হেরে গিয়ে মোসলেমার খোঁপা খুলে দিয়ে আসেক পালিয়ে আসতো ঘরে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে খোঁপা বাঁধতো নতুন করে মোসলেমা। যদি শিল্পী হতাম তা'হলে তোমার এই বিশেষ ভঙ্গীটি নিজের খাতায় বন্দী করে রাখতাম। আর যদি হতাম কবি, তাহলে.....'

মোসলেমা গ্রীবা বাঁকিয়ে হাসতো, 'ভারি কৃতিত্ব দেখাতে। কলম নিয়ে লিখতে বসতে ভারি একটা কবিতা। আকাশে চাঁদ উঠতো আর ছাদে বসে শোনাতে আমাকে। তোমার কোলে মাথা রেখে ফুলের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে একসময় ঘুমিয়ে পড়তাম।'

আসেক ঘুমন্ত খোকাকে জাগিয়ে বলতো উ:! কী কবিত্বের ঝর্ণাধারা! কিন্তু, তোমার ছেলে উঠে গেল।'

মোসলেমা রাগ করে খোকাকে কোলে তুলে নিত।

আজ মোসলেমার দিকে তাকালে আসেকের মন প্রবলভাবে মোচড় দিয়ে ওঠে। অসহায়তার কথা চিন্তা করতেই বুকটা টন টন করে ওঠে। নিজের মধ্যে শূন্যতা অনুভব করে তখন। মোসলেমার দিকে একবার তাকিয়ে আসেক আবার এসে বসলো বিছানার ওপর। মোসলেমার শীর্ণ হাতটা নিজের কোলে রেখে বললে, 'একটা কাজ করলে হয় না?'

মোসলেমা নিষ্প্রভ চোখে বললে, 'কী?'

'সুফিয়াকে কিছুদিনের জন্যে এখানে আনলে হয় না। ওর কোনো অসুবিধা হবে না এ সময়। আমি সব সময় থাকতে পারিনে তোমার কাছে, অথচ শুশ্রূষার জন্যে একজনের দরকার সব সময়। তোমার শরীর ভালো হলেই চলে যাবে।'

মোসলেমা তার দিকে তাকিয়ে রইলো। খানিকক্ষণ, 'আসতে চাইবে কী?'

‘এ সময় কী আর অস্বীকার করবে? আর যদি না আসতে চায় তা হলে একজন নার্স ঠিক করতে হবে।’

‘নার্সের দরকার নেই, এমনিতেই চলবে।’

‘তাহলে কালই একটা টেলিগ্রাম করে দিই?’

‘দিও।’

মোসলেমা পাশ পিরে শোয়। নিজের সংসার অন্যের হাতে তুলে দেওয়ার আসন্ন বেদনা তার গলা টিপে ধরল। ইচ্ছা হল চীৎকার করে প্রতিবাদ জানায়। গলা থেকে একটা ঘর্ঘর শব্দ ছাড়া আর কিছুই বেরোল না।

সুফিয়া এলো তিন দিন পর, দুপুরে। মোসলেমার চেহারা দেখে কেঁদে ফেললো, ‘একি চেহারা হয়েছে তোমার,আপা? এত দুর্বল হয়ে গেছ, ভাবতেই পারিনি।’

মোসলেমা ওর কোলে মাথা রেখে অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো। কেঁদে সান্ত্বনা পেল একটু।

‘কতদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা। বিয়ের পর সেই একবার মাত্র দেখেছিলাম তোকে। সে কতদিন আগে–মনে হয় অনেকগুলো যুগ চলে গেছে তারপর। সবকিছু অস্পষ্টতার কুহেলিকায় মিলিয়ে গেছে আস্তে আস্তে।’

সুফিয়া খোকাকে নিয়ে আদর করলো। খোকা অবাক হয়ে চেয়ে রইল তার দিকে। মোসলেমা ঝিকে ডেকে চা করতে বলল।

সুফিয়া বাঁধা দিয়ে বললে, ‘তোমার শরীর অসুস্থ, তোমাকে আর এত করতে হবে না। আমি সব দেখে নিচ্ছি। পরের বাড়ী তো আর নয়।’

সুফিয়ার সরলতায় মোসলেমা খুশী হ’ল মনে মনে, ‘তোকেই সবকিছু দেখে নিতে হবে। দেখাশুনার কেউ নেই। উনি থাকলে বরং সুবিধে হবে অনেকখানি।’

‘উনি’র কথায় সুফিয়া ফিরে তাকিয়ে হাসলো, ‘অফিসে গেছেন বুঝি?’

‘হ্যাঁ। সেই বিকেল ছাড়া আর উপায় নেই। তোর জন্যে সবকিছু ঠিক করে রেখে গেছেন। দেখে নে।’

সুফিয়া খোকাকে নিয়ে বের হয়ে গেল ঘর থেকে। অনেকদিন পর মোসলেমা শান্তির নিঃশ্বাস ফেললো। বুকের উপরে এতদিন থেকে যে বিরাট পাথরটা চেপে বসেছিল তা যেন আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছে।

আসেক অফিস থেকে ফিরেই ওপরে ওঠার সময় সিঁড়িতে দেখলো সুফিয়াকে। সুফিয়া নতমুখে নেমে যাচ্ছিল। হাতে ছোট পেয়ালা। আসেক ওর সামনে এসে পথ রোধ করে বললে, ‘আমি না চিনতে পারি, কিন্তু তোমার এমনভাবে পাশ কাটানো উচিত নয় মোটেই। যাক, কখন এলে?’

‘সকালে।’

'আমি ছিলাম না তখন?

সুফিয়া মুখ টিপে হেসে বললো, 'ভুল করে তখন বোধ হয় ফ্যানের নীচে মাথা রেখে কলম চালাচ্ছিলেন অনবরত।'

আসেক সুফিয়ার বেণী নাড়া দিয়ে বললে, 'চেনাই যে যায় না তোমাকে! কী বিরাট পরিবর্তন। তাড়াতাড়ি এসো নীচ থেকে, অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গেগিণীকে নিয়ে।'

আসেক হাতের জিনিসগুলো নিয়ে উপরে উঠে গেল। সুফিয়া নীচ থেকে একবার সেদিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি ঢুকে গেল রান্না ঘরে।

মোসলেমাকে সুফিয়ার হাতে সমর্পণ করে আজকাল অনেক নিশ্চিন্ত হয়েছে আসেক। দু'একবার দেখা ছাড়া তার আর কিছুই যেন কর্তব্য থাকে না। মোসলেমাও তার জন্যে স্বামীর বিরুদ্ধে অনুযোগ করে না। স্বামীর দিকে আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে। সুফিয়া মোসলেমাকে দেখা ছাড়াও আসেকের দিকেও লক্ষ্য রাখে। আসেক বাধা দেয় না। নারীর ভালবাসার কাছে নিজেকে অত্যন্ত ছেলেমানুষের মতো মনে হয়। ইচ্ছা করে, তার প্রান্ত স্পর্শ করে নিজের সর্বস্ব সমর্পণ করতে। খানিকটা পেলবতার নিজেও উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। অনুভব করে অলৌকিক সৌন্দর্যের মৃদু সুর! তার ঘরের সর্বত্র যেন তার মৃদু গুঞ্জনধ্বনি। সেই সুরের প্রবাহ আসেকের চোখে স্বাপ্নিক মায়ারাজ্যের অসীম দ্বার খুলে দেয়। ইচ্ছে হয় আসেকের, ডানা মেলে সেই রাজ্যে অভিসারের। মোসলেমার কথা সেই মুহূর্তে ভেবে ক্লান্তিকে জর্জরিত হয়ে ওঠে। নিঃশ্বাস ফেলতেও কষ্ট লাগে তখন, পরম প্রত্যাশা তখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে সূর্যরশ্মির মতো।

আসেক খবরের কাগজ পড়ছিল বিছানায় শুয়ে। এখনি সুফিয়া চা নিয়ে আসবে। তখন উঠবে কাগজ ছেড়ে।

সুফিয়া ভ্রুকুটি করে বললে, 'আপার অসুখ বলে আপনার সাহস বড় বেশ হয়ে গেছে, না?'

আসেক খবরের কাগজখানা পাশে রেখে উঠে বসলো। কৌতুক মাখিয়ে বললো, 'কেন, বলত?'

তার দিকে অবাক হয়ে তাকাল সুফিয়া, 'আবার জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে। নিজে যেন কিছুই বোঝেন না।'

'দেখো সুফিয়া এক ধরনের লোক আছে যারা সব কিছু দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না। চারপাশের তন্ময়তাই ব্যাঘাত ঘটায় শোনার আর দেখার। আমিও সেই দলের।'

সুফিয়া চেয়ার টেনে বসলো, 'অনেকটা লুকোলেন নিজেকে কিন্তু। যে কথা বললেন তার মধ্যে কী নিজের প্রতি একটা অবহেলার সুর নেই?'

আসেক কথা না বলে নীরবে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল।

'কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো কেন হবে এমন?'—আসেকের দিকে তাকিয়ে আর একবার মৃদু হাসলো সুফিয়া, 'পৃথিবীতে কী আর কারুর বউ-এর অসুখ হয় না? তাই বলে এমন নিরাশার ভাব কেন? আপনি তো আর কম চেষ্টা করেন না। আপাও সে কথা বলেন।'

'আমার কাছে কি কথা বলে জান? বলে, আমি ওর দিকে একেবারেই লক্ষ্য করিনে। শোন অবুঝ মেয়ের কথা!'

'সেটা অভিমান। পুরুষদের একটা দোষ, মেয়েরা কখন রাগ করে আর কখন অভিমান করে তা বুঝতে না পেরে রাগকে অভিমান বলে ধরে আর অভিমানের সময় মনে করে রাগ করেছে। তার ফলে যা হবার তা-ই হয়। মেয়েদের ঠোঁট ওল্টান, আর ছেলেদের—'

আসেকের দিকে তাকিয়ে সুফিয়া বললে, 'সে নিজের চোখেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তো।'

আসেক উজ্জ্বল চোখে বললে, 'হয়ত তোমার কথাই সত্যি। তবে কি জান সুফিয়া, ভালোবাসার যেখানে বাড়াবাড়ি সেখানে হিসেব করে চলা যায় না বলেই এমন ভুল ঘটে।'

দু'জনে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। মুখোমুখি বসে পরস্পরের দিকে চেয়ে আবার অবনতমুখী হল।

আসেক পেয়ালা টেবিলে রেখে বললে, 'আমার একটা অভিযোগ আছে তোমার বিরুদ্ধে।'

সুফিয়া মুখ তুললো, 'আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ?'

'ঘাবড়াবার অবশ্য কিছু নেই। অভিযোগটা সামান্য। মোসলেমার সেবা করছো সেজন্যে আমার অনুযোগের কোনো কারণ নেই। কিন্তু আমার প্রতি শক্রতা দেখে মনে হচ্ছে খুব শিগগীর বোধ হয় বিছানাকে আশ্রয় করতে হবে আমাকে।'

সুফিয়া চায়ের শূন্য পেয়ালা নিয়ে যাওয়ার সময় ঘরের দিকে তাকিয়ে বললে, 'যারা নিজেদের দিকে তাকাবার কোনো সুযোগ পায় না, তাদের এমন-অত্যাচার মাঝে মাঝে সহ্য করতে হয়।'

অবসর সময়ে মোসলেমা আসেককে একান্তে ডেকে বললে, 'ওর দিকে একটু লক্ষ্য দিও তুমি।'

আসেক বুঝতে না পেরে বললে, 'কার দিকে?'

মোসলেমা রাগ করলো তার অবহেলায়।

'সুফিয়ার কথা বলছি। সারাদিন ও আমার কাছে থাকে। অন্য কেউ এত সেবা করতো না আমার। এই কদিনেই শরীর বড় খারাপ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে ওকে বাইরে নিয়ে যেও।'

'সে-কথা ও নিজে বলে না কেন?'

'তুমি কি অদ্ভুত মানুষ! নিজে কেউ কোনোদিন এ-সব বলতে পারে! তাছাড়া নতুন এসেছে এখানে। লজ্জা করে সবকথা হয়তো বলতে পারে না তোমাকে। আর তুমিও তো সেই রকম। অন্যের দিকে লক্ষ্য করার অবসর পাও না একটু।'

আসেকের উত্তর দেয়ার আগেই সুফিয়া ঘরে ঢুকে তার দিকে চেয়ে বললে, 'খোকাকে কিছুতেই থামাতে পারছিনে। ভীষণ কান্না জুড়ে দিয়েছে।'

আসেক গিয়ে দেখলো খোকা রান্নাঘরে দুধ ছড়িয়ে তুমুল কাণ্ড জুড়ে দিয়েছে। তাকে দেখে আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো তার দিকে। কোলে তুলে নিয়ে আসেক বললে, 'এত দুষ্টুমী করছিস কেন?'

খোকা কেঁদে সুফিয়াকে দেখিয়ে বললে, 'আমাকে শুধু জোর করে সব খাওয়ায়। পেটে ধরে না এত।'

খোকা নিজের পেটের পরিমাণ দেখালো হাত দিয়ে। আসেক হেসে বললে, 'ভারি অন্যায় তো তোমার সুফিয়া। ওকে জোর করা তোমার মোটেই ভাল কাজ করা হয়নি।'

সুফিয়া মুখে আঁচল দিয়ে বললে, 'আপনি না এলে কিছুতেই থামাতে পারতাম না।'

'এখানেই তোমাদের পরাজয়।'

'বেশ।'

সঞ্চরমান সুফিয়ার হাত ধরে আসেক ফিসফিস করে বললে, 'পরের ছেলেকে যে থামাতে পারে না, নিজের ছেলেকেও সে কোনোদিন শান্ত করতে পারবে না।'

সুফিয়া আসেকের মুখে হাত চাপা দিয়ে বললে, 'আ: কী বাজে বকা হচ্ছে আপনার। আমি চললাম।' ছুটে সেখান থেকে পালিয়ে গেল সুফিয়া।

ডাক্তার মোসলেমার ব্যাপারে অনেকটা হতাশ হয়ে পড়েছেন। যাওয়ার আগে আসেককে মৃদু স্বরে বলে গেলেন, 'দেখুন, শেষ পর্যন্ত উনি বাঁচেন কিনা সন্দেহ! দিনে দিনে অবনতির দিকেই যাচ্ছে। উন্নতির কোনো লক্ষণই দেখতে পাচ্ছিনে। একেবারে হোপলেস। বাঁচানোর কোনো ক্ষমতাই নেই ডাক্তারী-শাস্ত্রের। আসেক কোনো কথা না বলে নীরবে বসে রইল। আজ তিন মাস থেকে শয্যাশায়ী মোসলেমা। অসুখের আর সংসারের মধ্যে পড়ে তার অবস্থা শাঁখের করাতের মতো শোচনীয়। দিনে দিনে ঋণের মাত্রা বেড়েই চলেছে। অথচ যার জন্য এতো পরিশ্রম—তার জীবনের আশা নেই। এতো পরিশ্রম সবই অপচয়ের খাতায় জমা

হচ্ছে প্রতিনিয়ত। সুদ শুদ্ধ আসল তোলার কোনোই উপায়ই নেই। সবই ব্যর্থতায় ম্রিয়মান? কেউ কী এখানে আশার রেণুকণা বিছিয়ে ব্যর্থতা নিয়ে যেতে পারে না। অসহনীয় দুঃখে মুখে হাত চাপা দিয়ে কেঁদে উঠল সে। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল ঘরে একা। সম্পূর্ণ একা।

সুফিয়া ফুলের তোড়া নিয়ে ঘরে ঢুকল। টেবিলের ওপর ফুলদানীতে সযত্নে রেখে তার দিকে ঘুরে তাকাল, 'কী ভাবছেন এত?'

'কিছু না। চুপ করে একা বসেছিলাম–তাই ভালো লাগছিল না।'

সুফিয়া আর কিছু বললে না। বেরিয়ে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে। আসেক ওর হাত ধরে টেনে আনল, 'শোন।'

সুফিয়া বসল আসেকের সামনে।

'চল, আজ সিনেমায় যাই। কিছুই ভালো লাগছে না। তাছাড়া সারাদিন বাড়িতে বসে থাকলে তুমি নিজেও যে অসুস্থ হয়ে পড়বে। যে যাচ্ছে তাকে যেতে দাও, তার যাওয়ার সময় হয়েছে। জোর করে তাকে ধরে রাখাই বরং নিষ্ঠুরতা। কিন্তু যার উন্মেষ তাকে নষ্ট করা কেন?'

সুফিয়া বিস্মিত হয়ে আসেকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'একি বলছেন আপনি?'

'যা বলছি তাই সত্যি। যাও তুমি, তাড়াতাড়ি করে কাপড় পরে নাওগে।'

সুফিয়া মন্থর পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

প্রাত্যহিক জীবনে সুফিয়ার আকস্মিক আর্বিভাবে কক্ষবিচ্যুত হয়ে অন্যপথে ঘুরতে লাগল আসেক। গতানুগতিক ব্যবহারের এই ব্যতিক্রম লক্ষ্য করে মোসলেমা। ব্যথিত হল প্রথমে। শেষ পর্যন্ত ব্যথা পরিণত হল ক্রোধে। ক্রমে নিজেকেও হারিয়ে ফেললে সে। স্থানকাল ভুলে নির্মম হয়ে উঠল সে। সুফিয়ার সঙ্গে অনবরত ঝগড়া বাধাতে লাগল। সুফিয়া বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে নীরবে প্রতিদিনের মতো সেবা করে যেতে লাগল।

সন্ধ্যের সময় আসেক কোথা থেকে একগুচ্ছ তাজা চাঁপা ফুল নিয়ে উপস্থিত। সুফিয়া ফুলের অঘ্রাণ নিয়ে আবেগভরে বললে, 'এগুলো কোথায় পেলেন? ভারি সুন্দর তো!'

'কোথায় পেলাম জানি না, তবে একজনকে উপহার দেওয়ার জন্যে এনেছি।'

সুফিয়া উজ্জ্বল চোখে হাসল, 'তাই নাকি?'

আসেক ওর খোঁপার কতকগুলো ফুল গুঁজে দিয়ে বললে, 'যা সুন্দর মানাচ্ছে তোমাকে। ঠিক যেন কল্পলতিকার মতো পেলব আর স্বপ্নাতুর।'

আসেক সুফিয়ার খোঁপা টান দিয়ে খুলে দিল। হাসতে লাগল মৃদু মৃদু।

ওঘর থেকে মোসলেমার চীৎকার শোনা গেল, 'বাড়ীর সব কোথায়? কোথায় গেল? মরেছে নাকি সবাই?'

'যাই আপা!–সুফিয়া তাড়াতাড়ি মোসলেমার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, 'তোমার কী খুব কষ্ট হচ্ছে?'

মোসলেমা তার দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, তোমাকে কে ডেকেছে? বাড়ীতে তুমি ছাড়া কী আর কোনো মানুষ নেই?'

সুফিয়ার দৃষ্টি আহত হয়ে ফিরে এসে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে প্রতিহত হল, 'ওরা সবাই এখন কাজ করছে। আমি তোমার ডাক শুনে–'

মোসলেমা মুখ ভেংচে বললে, 'ছুটে এসেছি। বড় ভালো কাজ করেছ। আলাপ করগে–ছাদে বসে গল্প করগে তার সঙ্গে। চাঁদ উঠেছে আকাশে। এখানে কি? রোগীর ঘরে কী চাঁপা ফুল মানাবে।'

সুফিয়া কোনো কথা না বলে বের হয়ে গিয়ে বারান্দার এক কোণে রেলিঙের উপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কান্না থামিয়ে চোখ মুছে খোঁপা থেকে ফুলগুলো একে একে খুলে ছিঁড়ে লুটিয়ে দিল মেঝের ওপর।

আসেক মোসলেমার কাছে গিয়ে কঠিন স্বরে প্রশ্ন করল, 'এর মানে?'

মোসলেমা গায়ের ব্যাপারখানা ঊর্ধ্বে টেনে বললে, 'সব জিনিসে মানে থাকে না। মানুষ না বুঝেও অনেক সময় অনেক কাজ করে। এও সেই রকম।'

'রাগ তোমার বাজে কথা। একজনকে বাড়ীতে ডেকে এমনভাবে অপমান করার কোনো মানে হয় না। ও যদি তোমার আপন বোন হ'ত, পারতে এ-সবকরতে?'

মোসলেমা তিক্ত কণ্ঠে বললে, 'ও:। তার হ'য়ে বড় যে ঝগড়া করতে এসেছো। বড় বেশী ভালোবাসা!'

আসেক ঘুরে দাঁড়াল। স্পর্ধিত অহঙ্কারে ব্যঙ্গের সঙ্গে বললে, 'তোমাকে আজ স্পষ্ট করেই বলে দিতে চাই, সুফিয়াকে আমি ভালোবাসি। তোমার মনে যে সন্দেহ জেগেছে তা মিথ্যা নয়।'

মোসলেমা গায়ের র‍্যাপার এক পাশে ঠেলে রেখে কেঁদে উঠলো, 'আমার মুখের ওপরে এমন কথা বলতে পারলে তুমি? এমনভাবে আমাকে অপমান করলে?'

'নিজের ভালোবাসাকে সন্দেহ করেছ বলেই তোমার এ-অপমান।'–আসেক আর সেখানে দাঁড়ালো না। খোকাকে কোলে ক'রে সুফিয়ার ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

সুফিয়া নিজের কাপড় গুছিয়ে ছোট ট্রাঙ্কটায় রাখছিল একে একে। আসেকের পদশব্দে পিছনে না তাকিয়ে আপন কাজে মন দিলো আগের মতো।

আসেক তার সামনে এসে বললে, 'সুফিয়া।'

. রোরুধ্যমান অশ্রু সংযত করে সুফিয়া ভাঙা গলায় বললে, 'বলুন।'

'তোমার যাওয়া হবে না।'

'তা হয় না ! আমার আর এখানে থাকা সাজে না। সন্দেহ বাড়িয়ে কাজ নেই।'

আসেক সুফিয়ার দু'হাত চেপে ধরে কাতর কণ্ঠে বললে, 'এবারকার মতো ওকে ক্ষমা কর।'

'আমি কোনদিনই আপার ওপর রাগ করিনি। এখানে থাকা আমার উচিত নয়।'

'সুফিয়া!'

সুফিয়া আসেকের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কাঁদতে লাগলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। আসেক খোকাকে তার সামনে রেখে বললে, 'আমার নিজের জন্যে বলছি নে, এর জন্যে।

সুফিয়া আর নিজেকে সামলাতে পারলো না। খোকাকে কোলে তুলে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মোসলেমার শরীর ক্রমেই খারাপের দিকে চলেছে। পর পর তিন দিন অজ্ঞান হয়ে রইলো। পরের দিন সকালে চোখ মেলে চারদিকে চেয়েই আবার চোখ বন্ধ করলো। আসেক ভয় পেয়ে ডাক্তারের দিকে তাকাল। তিনি গম্ভীরভাবে ঘাড় দোলালেন। বাইরে গিয়ে অনুচ্চস্বরে বললেন, 'শেষ অবস্থা প্রায়।'

আসেক মোসলেমার পাশে বসে রইলো বিনিদ্র চোখে সারাদিন। মোসলেমার ভীরু দুর্বল বুকে হাত রেখে পরিমাণ করলো অনবরত ক্ষীণ স্পন্দন ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সামান্য সময়ের ব্যবধানে হয়তো এটুকু আশ্বাসও আর থাকবে না। সীমাহীন অন্ধকারে নিজেকেও সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলবে সে। মোসলেমার মুখের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল। অনাহার আর অবহেলার প্রক্ষেপে সৌরভময় একগুচ্ছ রজনীগন্ধা যেন বিমলিন উপহাস করছে তার দিকে তাকিয়ে। আসেক মোসলেমার একখানা হাত আপন মুখের উপর চেপে ধরে হাঁপাতে লাগলো। নিরুত্তাপ একখানি অতি-সরু ফর্সা হাত। সাপের মতো লিক্‌লিক্ করছে। আহত হয়ে হাতখানা সে নামিয়ে রেখে সরে এলো একদিকে। নীল আলোর বিচ্ছুরণ ছোট ঘরের মধ্যে ভৌতিকতার পরিবেশ ছড়িয়ে দিয়েছে, অতি সন্তর্পণে অবসর মুহূর্তের ফাঁকে ফাঁকে।

নীচের বাগানের লতানো ফুলগাছ দেওয়ালের গা ঘেঁষে প্রায় জানালার ওপর উঠে এসেছে। ছোট প্রস্ফুটিত ফুল শোভা পাচ্ছে তার চূড়ায়। আসেক লতা নিয়ে খানিকক্ষণ পীড়ন ক'রে দুটো শব্দ বাজলো গম্ভীরভাবে।

পাশের ঘরে সুফিয়া ঘুমুচ্ছে। আসেক দরজা ঠেলতেই শিথিল দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে এক মুহূর্তের জন্য সামনের দিকে তাকাল সে। খোকাকে কোলের কাছে একান্তে নিয়ে ঘুমিয়ে আছে সুফিয়া। পাশে 'মহুয়া' কাব্য খোলা।

শিথিল কবরী এলিয়ে পড়েছে নীচে আঁচলের সঙ্গে সমান্তরালভাবে। এগিয়ে গিয়ে সেখানে দাঁড়ালো আসেক। সুফিয়ার বইখানা নিয়ে টেবিলের উপর রাখতেই শিথিল হাত থেকে পড়ে গেল নীচে।

সুফিয়া আচম্বিতে জেগে উঠে বসল বিছানার ওপর, 'কে?'

আসেক ফিরে দাঁড়াল।

সুফিয়া শিথিল বস্ত্র ঠিক করে নেমে এলো, 'আপনি! এত রাতে?'

আসেক হঠাৎ উন্মত্তের মতো ওকে কাছে টেনে নিল, 'হ্যাঁ। আমিই কিন্তু তুমি কি নিজেকে এতটুকু বিশ্বাস করতে পার না সুফিয়া।' দু'হাত দিয়ে সুফিয়ার মুখ তুলে ধরে দেয়। নিজের কথা বলার এই তো উপযুক্ত সময়। তুমি কী ভয় পেয়েছ?

সুফিয়া কম্পিত গলায় বললে 'না. চমকে উঠেছিলাম মাত্র।'

আসেক ওর দু'কাঁধ আস্তে আস্তে ছেড়ে দিল।

পরদিন ডাক্তার মোসলেমাকে দেখতে এসে অবাক হয়ে আসেকের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, 'ব্যাপার কী বলুন তো?'

কিছু বুঝতে না পেরে আসেক বিড়বিড় ক'রে বললে, 'কী?'

'এক রাতের মধ্যে রোগীর এতো পরিবর্তন হওয়ার তো কথা নয়। অথচ আশ্চর্য রূপান্তর। ভয়ের লক্ষণ সম্পূর্ণ কেটে গেছে। উনি বাঁচবেন।'

'ও বাঁচবে।–মন্ত্রোচ্চারিতের মতো কথাগুলো ভীতভাবে বলল আসেক।

ডাক্তার আনন্দিত হয়ে বললেন, 'এতে বিস্ময়ের কী আছে, বলুন! ডাক্তারী-শাস্ত্রে এমন অনেক অদ্ভুত ঘটনার স্বাক্ষর রয়ে গেছে।'

আসেক উঠে গেল সেখান থেকে। বিড়বিড় ক'রে উচ্চারণ করলে 'ও সারবে, ও সারবে, ও সারবে আবার।'

এক সপ্তাহের মধ্যে মোসলেমা গায়ের চাদর বিছানায় রেখে উঠে বসল বিছানার ওপর। রোগপাণ্ডুর মুখে স্বচ্ছ হাসির স্রোত খেলে গেল ঐতিহাসিক ক্ষণে।

সুফিয়া বললে, 'এখনই এত নড়াচড়া তোমার কী ভালো হ'বে আপা? শরীর এখনো সম্পূর্ণ সারেনি। আগে ভালো হয়ে নাও, তারপর লাফিও খুব।'

মোসলেমা শাণিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললে, 'নিজের ভালোমন্দ অপরের চেয়ে অনেক ভালো বুঝি। অনধিকার চর্চা সবসময় ভালো নয়, সুফিয়া।'

সুফিয়া কোনো কথা না বলে ঘর থেকে মুখ নীচু ক'রে বেরিয়ে গেল।

দুপুরে আসেককে ডেকে মোসলেমা বললে, 'তোমার কী সাত রাজার ধন আছে নাকি? না কোনো গুপ্ত ধনের সন্ধান পেয়েছ?'

আসেক তার দিকে তাকিয়ে বললে, 'কেন বলত?'

'অযথা টাকা পয়সা নষ্ট করার কোনো মানে হয়? তাছাড়া আমরা বড় লোক

নই। তারও বুঝা উচিত ছিল। কিন্তু যতক্ষণ তার কানের কাছে মুখ লাগিয়ে না বলবে ততক্ষণ কী কিছু ঢুকবে?'

আসেক মুখে বিরক্তি মাখিয়ে বললে, 'তুমি সুস্থ হলেই সুফিয়া চলে যাবে। অযথা যা'তা বল কেন? আত্মসম্মান বলে কী তোমার কিছু নেই?'

'আগে ছিল এখন নেই।'

আসেক আর কোনো কথা বললো না।

শেষ পর্যন্ত মোসলেমা সুফিয়াকেই সবকথা খুলে বললে, তোমার এখন যাওয়া উচিত সুফিয়া। অনেকদিন এসেছ, বাড়ীর সবাই বা কী ভাবেন? তাছাড়া যে জন্যে তুমি এসেছিলে এখন থাকার কোনো কারণই দেখতে পাচ্ছিনে। নিজেও বোঝ সে-কথা।'

'বেশ। কালকের ট্রেনেই যাব তা হলে।'

'সেই ভালো। অনর্থক দেরী ক'রে লাভ কী, বল?'

সুফিয়া কোনো কথা বলতে পারলো না।

ওপর থেকে সামনের ঘোড়ার গাড়ীখানা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মাথার ওপর সুফিয়ার ট্রাঙ্কটা আর বেডিংখানা।

সুফিয়া আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে পা দু'টার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। সর্পাহতের মতো মোসলেমা পেছনে সরে গিয়ে বললে, 'থাক থাক, ও সবের কোনো দরকার নেই।'

খোকাকে কোলে নিয়ে আদর ক'রে আগের মতোই ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সুফিয়া। গাড়ীর কাছে আসেক রজনীগন্ধার গোছাটা প্রসারিত ক'রে বললে, তোমার হাতের লাগান গাছের ফুল। তুমি প্রথম ফুল নেবে বলেছিলে। এই নাও।'

সুফিয়া কাপড়ে মুখ ঢেকে কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে বললে, 'আর অপমান করবেন না আমাকে। আমার কোনো দরকার নেই ফুলের। ওটা যাকে মানায় তাকেই দিন।'

আসেক বিহ্বল দৃষ্টিতেই চেয়ে রইল।

আকাশের নীল বুক চিরে কালো একখানা মেঘ ছুটে এলো পূর্ব দিকে। নীল মেঘের অতলে এখনই হয়তো হারিয়ে যাবে। তবু প্রত্যাশার সৌন্দর্যময় দীপ্তি। সেদিকে খোলা জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল মোসলেমা।■